নব ভারত স্রষ্টা



# সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সুনীল কুমার বসু



নব ভারত স্রষ্টা



# সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়



সুনীল কুমার বসু



প্রকাশন বিভাগ
তথ্য ও বেতার মন্ত্রক
ভারত সরকার

এপ্রিল, ১৯৭৪ ( April, 1974 )
চৈত্র-বৈশাখ, ১৮৯৬ ( Chaitra-Vaisakha, 1896 )



SURENDRANATH BANERJEA (Bengali)

[ বাংলা অনুবাদ : হিমানীশ গোস্বামী ]

মূল্য : ৫.০০ টাকা
Price : Rs. 5.00

ডিরেক্টর, প্রকাশন বিভাগ, পাতিয়ালা হাউস, নতুন দিল্লী-১ কর্তৃক
প্রকাশিত ও কৃপাল প্রিন্টিং প্রেস, শক্তি নগর, দিল্লী-১১০০০৭
দ্বারা মুদ্রিত।

কলিকাতায় প্রাপ্তিস্থান : ৮, এস্‌প্ল্যানেড ইষ্ট (একতলা), কলিকাতা-১

# সূচী পত্র

## প্রথম অধ্যায়

## পটভূমিকা

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন এবং কর্ম ভারতের জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। জনসাধারণের অধিকার এবং স্বাধীনতা বৃদ্ধির জন্য তাঁর অগ্রগণ্য এবং অক্লান্ত প্রচেষ্টার দরুন তাঁকে আমাদের দেশবাসী চিরকাল ভালবাসা এবং কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করবেন। এক সময়ে তিনি ইতিহাস সৃষ্টি করে গেছেন। তাঁর নাম ছিল যাদুমন্ত্রের মত। তাঁর বাগ্মিতা ছিল মন্ত্রমুগ্ধকর, তাঁর নেতৃত্ব দিত প্রেরণা। প্রথম দিকের দেশপ্রেমিকেরা যাঁরা তাঁদের ব্যক্তিত্বের চিহ্ন রেখে গেছেন অমলিন ভাবে তিনি ছিলেন তাঁদের অন্যতম। তবে, ইতিহাস স্থির নয়, এর গতি আছে। তাঁর প্রচুর ঘটনা-সমৃদ্ধ জীবনের শেষ দিকে জাতীয় জীবনের অনুভূতি এবং ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর অগ্রগতি থেকে তিনি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর নাম আর শেষ পর্যন্ত মানুষের মনে ঐন্দ্রজালিক প্রভাব বিস্তার করত না, তাঁর মহান বাগ্মিতা নিবিড়-বেদনায় নীরব হয়ে গিয়েছিল তাঁর বাধ্যতামূলকভাবে রাজনৈতিক জীবন থেকে অবসর নেবার পর। কিন্তু ভারতের জাতীয়তার জন্ম, আমাদের প্রথম দিককার স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য যে উদ্দেশ্যমূলক বিবর্তন—এ সমস্ত ব্যাপারে তাঁর অবদান প্রভূত মূল্যবান এবং আমাদের ইতিহাসে তাঁর স্থান অমর হয়ে থাকবে।

স্বদেশী রাজনৈতিক আন্দোলন ভারতবর্ষের নবজাগরণের অংশ---এর সুরু হয়েছিল উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে। রাজা রামমোহন রায় থেকে এই জাগরণের সুরু—এই জাগরণের অন্তর্নিহিত মর্ম প্রথমে দেশের

সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনে প্রবেশ করে, পরে এটি রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রকাশিত হয়।

নানা দিক থেকে দেখতে গেলে সুরেন্দ্রনাথ ছিলেন রাজা রামমোহনের উত্তরাধিকারী—সুরেন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন, "আজ যে সব সমস্যার মধ্যে আমরা রয়েছি সেসব সমস্যার উদ্ভব হবে তা রাজা রামমোহন আগেই বুঝতে পেরেছিলেন।" যদিও রাজা রামমোহন নিজেকে সামাজিক এবং ধর্মীয় সমস্যায় নিয়োজিত করেছিলেন, তবুও ভারতবর্ষের বিধান সম্পর্কীয় আন্দোলনের স্বষ্টিকর্তা হিসেবেও তাঁকে স্বীকার করে নেওয়া হয়। তিনি যে কেবল মুদ্রণযন্ত্রের স্বাধীনতা রক্ষা করেছিলেন তা নয়, তিনি জনগণের অধিকার এবং সুবিধেগুলি সম্পর্কে জাতির হয়ে সরকারের কাছে প্রথমে আবেদন করেছিলেন যাতে সরকার তাঁর কর্তব্য এবং দায়িত্ব সম্বন্ধে অবহিত হন। রাজা রামমোহন যে উপায়ে সংবিধান-সঙ্গতভাবে আন্দোলন করেছিলেন, ঠিক সেই উপায়ই গ্রহণ করেছিলেন কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতাগণ এবং সুরেন্দ্রনাথ।

যে বাংলাদেশের বিশেষ পরিবেশে সুরেন্দ্রনাথ বড় হন সে সম্বন্ধে বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন। বাংলাদেশে সেই সময়ে বহু পুরনো কঠোর গোঁড়ামির বিরুদ্ধে ইয়ং বেঙ্গল-এর আমূল পরিবর্তনবাদের রেশ তখনো সম্পূর্ণভাবে মিলিয়ে যায়নি। সুরেন্দ্রনাথের পিতা নিজেও ইয়ং বেঙ্গল-এর বিদ্রোহী গোঁড়ামি বিরোধিতাকে গ্রহণ করেছিলেন। যদিও তরুণ বয়স্কেরা বেপরোয়াভাবে বাড়াবাড়ি করেছিল অনেক, এই আমূল পরিবর্তনবাদীরা কিন্তু একটা ভাল কাজও করেছিলেন। তাঁরা বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর মধ্যে রাজনৈতিক চিন্তানুভূতি আনাতে সাহায্য করেছিলেন।

ইয়ং বেঙ্গলের অতি-বিপ্লবী বাড়াবাড়ির বিরোধিতা করে প্রতি-আন্দোলন তখন সুরু হয়েছে। প্যারীচরণ সরকার ছিলেন ধর্মযাজকের মত অতি উৎসাহী একজন শিক্ষক। তিনি মদ্যপান বিরোধী একটি

আন্দোলন সুরু করেন—এই আন্দোলনের সমর্থক হিসেবে পান কেশবচন্দ্র সেন ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে। এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল তখনকার দিনের পশ্চিমী সভ্যতার অনুকরণে মদ্যপানের খেপামি যা প্রচণ্ডভাবে পরিব্যাপ্ত হয়েছিল প্রায় সর্বত্র, তার প্রতিরোধ করা। রামমোহন রায় যে সমাজ সংস্কারের ধারা গ্রহণ করেছিলেন, তাঁর পর সেই ধারাকে গ্রহণ করেন বিদ্যাসাগর এবং তাঁর মত চিন্তা করতেন এমন মধ্যপন্থীরা। বিদ্যাসাগরের পাণ্ডিত্য, মানবিকতাবোধ এবং উঁচু নৈতিক চরিত্রকে বাংলাদেশের সামাজিক ক্ষেত্রে একটি শক্তি হিসেবে স্বীকার করে নিতেই হত। তিনি ছিলেন সুরেন্দ্রনাথের পিতৃবন্ধু। যখন ইংল্যাণ্ড থেকে ফেরবার পর সুরেন্দ্রনাথকে সামাজিক একঘরে হতে হচ্ছিল তখন অন্যান্যদের মধ্যে বিদ্যাসাগর তাঁকে সমাজে সাদরে অভ্যর্থনা করে নিয়ে আসেন।

সেই সময় ব্রাহ্ম সমাজের পূর্ণ বিকাশ ঘটেছিল কেশবচন্দ্র সেনের নেতৃত্বে। ব্রাহ্ম আবেদন যে কেবল খুঁড়িয়ে-চলা নানা বর্ণে বিভক্ত সমাজের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়েছিল তা নয়, এটি সামাজিক সুবিচার এবং ব্যক্তিগত মোক্ষেরও বাণী শুনিয়েছিল। আবার ইয়ং বেঙ্গলের আমূল সংস্কারকামী মতবাদ থেকে উৎসারিত রাজনৈতিক অনুভূতি নতুন করে তরুণ ব্রাহ্ম দলের মনে দেখা দিল, যেমন আনন্দ মোহন বসু, ইনি সুরেন্দ্রনাথের রাজনৈতিক কাজে নিবিড়ভাবে সহযোগিতা করলেন। তাঁদের পত্রিকা, ব্রাহ্ম পলিটিক্যাল ওপিনিয়নেও রাজনীতি যতটুকু থাকার তা থেকেছিল।

১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ এবং ১৮৫৮ সালের রাণীর ঘোষণা—তাঁর প্রজাদের প্রতি সমান ব্যবহারের সম্মতি এ দুটিই স্মরণীয় ঘটনা। এর শেষের ব্যাপারটি ভারতীয় মনে আগেকার কম্পানী কুশাসনের হাত থেকে অব্যাহতি পাবার এবং সাম্রাজ্যের মধ্যে অবস্থান করেও সমান সুবিচার এবং সুযোগ পাবার আশা জাগিয়েছিল। পরবর্তী বছরগুলোতে দেখা গেল নেতারা এই অমোঘ ঘোষণার উপর ভিত্তি করেই জনগণের

অধিকার এবং সুযোগ সুবিধেগুলি কি হবে তা স্থির করছেন। রাণী কর্তৃক শাসনভার গ্রহণ করার ফলে সমস্ত ভারতবর্ষ সমানভাবে সম্রাজ্ঞীর নিয়ন্ত্রণে চলে এল।

তবে ঘোষণায় যা বলা হয়েছিল তা আর কখনো কার্যকর হয়নি। বৃটিশদের সমতার ফাঁপা চরিত্রটি খুব তাড়াতাড়িই ধরা পড়ে গেল। বুদ্ধিজীবীদের আশা ধূলিসাৎ হতে বেশি দেরি হল না। এর একটা কারণ এই যে ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের পর ভারতীয় এবং ইউরোপীয়দের মধ্যে জাতিগতভাবে একটা মন কষাকষি সুরু হল। আগে বৃটিশ সমাজ যে ভারতীয় ভাবধারা গ্রহণ করেছিল তার বদলে দেখা দিল তাদের একা থাকবার বৈরীমূলক মনোভাব। আর একটা ব্যাপার এই হল যে, প্রত্যক্ষ শাসনের ফলে আমলাতান্ত্রিক ক্ষমতা অনেকখানি বেড়ে গিয়েছিল। আমলাতন্ত্র ছিল নিষ্প্রাণ কাঠের মত এবং দায়িত্বহীন। কৃষকদের অর্থ নৈতিক শোষণ, দুর্ভিক্ষ এবং অন্যান্য সামাজিক-অর্থ নৈতিক অন্যায় বেড়েই চলল। ইংল্যাণ্ড তার দুটি স্বার্থ বুঝত, শাসন এবং বাণিজ্য—এছাড়া আর কোনো কিছু সম্পর্কে কোন বিশেষ চিন্তা ছিল না। এমনকি উপযুক্ত ভারতীয়দের বড় বড় শাসন পদে বা স্থানীয় শাসনেও কোনরকম স্থান হত না। জনসাধারণের মধ্যে স্বভাবতই অসন্তোষ দেখা দিল, বিশেষ করে উঠতি মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী দলের মধ্যে এটা আরো প্রকট হল।

সুরেন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের এই রাজনৈতিক পটভূমিকায় আবির্ভূত হয়েছিলেন। নবীন ও প্রবীণের মধ্যে এই সময় যুদ্ধের ঝড় বয়ে চলছিল। সময়টাতে নানা বিপরীত ব্যাপার ঘটছিল—সময়টা ছিল আশার, এবং হতাশার আর সুরেন্দ্রনাথ এই দুই বিপরীতের থেকেই সংগ্রহ করেছিলেন তাঁর শক্তি।

## দ্বিতীয় অধ্যায়

### উঠ্‌তি নায়ক

কোলকাতার তালতলা অঞ্চলে সুরেন্দ্রনাথ ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের ১০ই নভেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। সুরেন্দ্রনাথের পিতামহ গোলকচন্দ্র, যিনি সল্‌ট বোর্ডে কাজ করতেন, তিনি তাঁর আদিবাড়ি ব্যারাকপুরের নিকটবর্তী একটি গ্রামে বসবাস সুরু করার পর কোলকাতায় বাস করতে থাকেন। রক্ষণশীল কুলীন ব্রাহ্মণ পরিবার, এঁদের ছিল ঐতিহ্যের আর শুচিতার গর্ব। গোলকচন্দ্র ছিলেন দয়ালু এবং সমবেদনশীল, কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি ছিলেন পুরনো হিন্দু প্রথার সঙ্গে দৃঢ়ভাবে বদ্ধ। সুরেন্দ্রনাথের পিতা দুর্গাচরণের জন্ম হয় ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে। এতকাল পরে দেখতে গেলে ব্যাপারটা অদ্ভুত মনে হয়, পুরনো ছোঁয়াচ-বাঁচানো পৃথিবীর মানুষ হলেও গোলকচন্দ্র নতুন চিন্তাধারার স্পর্শ থেকে মুক্ত ছিলেন না। তিনি তাঁর পুত্র দুর্গাচরণকে ইংরিজী শিক্ষা দিতে ইতস্তত করেননি—যে জায়গাটি ছিল শিক্ষার নব জাগরণের কেন্দ্রস্বরূপ—সেই হিন্দু স্কুলে পড়ার ফলে তাঁর হাবভাব দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণভাবে পশ্চিমী হয়ে দাঁড়িয়েছিল। দুর্গাচরণ বিদ্রোহী হয়ে পড়েছিলেন ইয়ং বেঙ্গল দলের মত, এবং তাঁর বিখ্যাত পুত্রকে এই বিদ্রোহের ভাবধারার কিছুটা দিয়ে গিয়েছিলেন।

কথিত আছে যে দুর্গাচরণ জীবনের প্রথম দিকে সল্ট বোর্ডে এ কাজ নিতে বাধ্য হন। অন্য রকম আর একটি গল্প আছে যে ভারতবাসীদের মহান বন্ধু ডেভিড হেয়ার তাঁকে একটা শিক্ষকতার কাজ দেন। তিনি তৎকালীন প্রচলিত রীতি অনুসারে কম বয়সে বিবাহ করেন, কিন্তু অতি শীঘ্রই তাঁর যুবতী স্ত্রীর কলেরার আক্রমণে মৃত্যু হয়।[১] এরফলে তিনি আরোগ্য-বিদ্যা ডাক্তারী পড়বার সঙ্কল্প করেন। ডেভিড হেয়ারের মত লোকেদের

১। দেশনায়ক সুরেন্দ্রনাথ—পি. কে. রায় প্রণীত দ্রষ্টব্য

সাহায্যে তাঁর এই বিরাট মানবিক উচ্চাকাঙ্খা পূর্ণ হয়, কেননা পরে তিনি কোলকাতায় একজন নামকরা চিকিৎসক হিসেবে পরিগণিত হন। তিনি এমনি মানব দরদী ছিলেন যে দিনে দু ঘণ্টা রোগীদের বিনা ফী-তে পরীক্ষা করতেন। সুরেন্দ্রনাথ ছিলেন দুর্গাচরণের দ্বিতীয় স্ত্রী জগদম্বা দেবীর দ্বিতীয় পুত্র।

তাই দেখা যায় এই পরিবারের ভেতরের পটভূমিকা ছিল প্রাচীন শক্তির সঙ্গে নতুন উঠ্‌তি শক্তির দ্বন্দ্ব। দুর্গাচরণ ইউরোপীয় সংস্কৃতির মত্ততাকারক সুরা গভীরভাবে পান করেছিলেন, কিন্তু তাঁর পিতা কঠোরভাবে হিন্দু ঐতিহ্য এবং গোঁড়ামিকে আঁকড়ে ধরে ছিলেন। একটা কথা প্রচলিত আছে যে একবার দুর্গাচরণের পিতা তাঁর প্রতি এতই অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন যে দুর্গাচরণকে বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হয়।

সুরেন্দ্রনাথের আত্মজীবনী 'এ নেশন ইন মেকিং' যেটি এই বিভাগে ধ্রুপদী সাহিত্য হিসেবে পরিগণিত, তাতে তাঁর পারিবারিক জীবন সম্পর্কে সুন্দর ও ঘনিষ্ঠ বর্ণনা আছে। সুরেন্দ্রনাথ নিজেই বলছেন, "আমাদের বাড়িতে সেই সময়কার প্রচলিত সংগ্রামরত দুটি বিভিন্ন ধারার সমন্বয় ঘটেছিল...।[২] আর এই ব্যাপারটি সেই সময়কার প্রতীচ্য গোঁড়ামীর এবং পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সংগ্রামের প্রতীক হিসেবে ধরা যায় কেননা তখন এই সংগ্রাম সমস্ত আধুনিক শিক্ষিত পরিবারে চলেছিল। তিনি বলেন এই সংগ্রামের ফলে তাঁর পারিবারিক শান্তি বিঘ্নিত হয়নি, বরং এটা ছিল দুটি বিভিন্ন মতবাদের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের ক্ষেত্র। এ রকম আবহাওয়ায় মানুষ হয়ে সুরেন্দ্রনাথের মধ্যে দুটি সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবধারা—হিন্দু গোঁড়ামি এবং ইউরোপীয় মোহান্ধতার মাঝামাঝি অত্যন্ত সুন্দর একটি সমন্বয় ঘটেছিল। এখানেই তাঁর ঘটনা বহুল জীবনের দর্শন এবং কর্মের মূলসূত্র খুঁজে পাওয়া যায়। তাঁর পিতার অতি উৎসাহী বৈপ্লবিক চিন্তাধারা তাঁর পিতামহের বুনিয়াদী

২। এ নেশন ইন মেকিং—সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী দ্রষ্টব্য

ঐতিহ্য প্রীতির দ্বারা সংযত হয়ে তাঁর ভেতরে সংহত হয়েছিল। ফলে তিনি দেশপ্রেমিক হলেও লড়াইবাজ ছিলেন না, তিনি সংস্কারক হয়েও ধর্মান্ধ ছিলেন না, তিনি পরিবর্তনে উৎসাহী ছিলেন কিন্তু সুসংহত এবং সাংবিধানিক উপায়েই তা করতে চেয়েছিলেন।

সুরেন্দ্রনাথের প্রথম জীবন এবং শিক্ষা ব্যাপারে কোনোরকম অসাধারণত্ব ছিল না। তিনি পাঠশালাতে প্রাথমিক শিক্ষালাভ করবার পর পেরেণ্টাল অ্যাকাডেমিক ইন্সটিটিউশন নামের একটি ইঙ্গ ভারতীয় বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে ইংরিজী ভাষা এমনভাবে আয়ত্ত করেন যে পরে ইংরেজরাও তাঁর এই ক্ষমতার হিংসা করতেন। এই বিদ্যালয়ে তাঁর শিক্ষা, এবং পরে ডোভটন কলেজে তাঁর শিক্ষা মোটামুটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ছিল—তিনি প্রতি বছরেই পুরস্কার পেয়েছেন, যদিও তালিকার প্রথমে তাঁর নাম থাকত না।

দুর্গাচরণ তাঁর সন্তানদের শিক্ষার ব্যাপারেই যে কেবল মনোযোগ দিয়েছিলেন তা নয়, তাদের স্বাস্থ্যের ব্যাপারেও তাঁর মনোযোগ ছিল। তিনি তাঁর বাড়িতে একটা ব্যায়ামাগার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, এবং একজন ব্যায়ামবিদকে ভারতীয় পদ্ধতিতে ছেলেদের ব্যায়াম শিক্ষা দেবার জন্য নিযুক্ত করেছিলেন। এইভাবে নিয়মানুবর্তিতার মধ্যে থাকার ফলে সুরেন্দ্রনাথের স্বাস্থ্য হল চমৎকার। তাঁর ৭৭ বছরের সুস্থ দীর্ঘ জীবন ইংরেজদের পর্য্যন্ত আশ্চর্য করে দিয়েছিল। এই অসাধারণ স্বাস্থ্যের কারণস্বরূপ সুরেন্দ্রনাথ বলেন যে, এহল তাঁদের বাড়িতে বাল্য বিবাহ প্রথা প্রচলিত না থাকার ফল। লর্ড হার্ডিঞ্জের সঙ্গে দেখা করার সময় তিনি তাঁর ঐ বয়সে ঐ রকম স্বাস্থ্য দেখে অবাক হয়ে যাওয়াতে সুরেন্দ্রনাথ বলেছিলেন যে, তাঁদের স্বাস্থ্য দেখে বাল্য বিবাহ না করার শিক্ষা নেওয়া উচিত।

যুবক সুরেন্দ্রনাথ বিদ্রোহ এবং সংস্কার এই দুই রকম আবহাওয়াতেই মানুষ হচ্ছিলেন। তাঁর অনুভূতিপ্রবণ চরিত্র সমসাময়িক ঘটনা প্রবাহের প্রতিক্রিয়ায় আস্তে আস্তে উদ্ঘাটিত হচ্ছিল। কেশবচন্দ্র সেনের

ব্যক্তিত্ব বিশেষভাবে তাঁর মনে ছাপ রেখে যায়। তিনি কেশবচন্দ্রের সভাতে প্রায়ই যেতেন। হয়ত এই ব্রাহ্ম নেতার অসাধারণ বাগ্মিতা তাঁকে পরবর্তী জীবনে বাগ্মী হতে পরোক্ষভাবে সাহায্য করেছিল। তিনি বলেন: "কেশবচন্দ্র সেনের বক্তৃতাগুলো তরুণ মনের উপর পাকাভাবে দাগ কেটে বসত। সভাগুলিতে বেশ জন সমাগম হত। স্পষ্টতই তখন একটা ধর্ম জাগরণ ঘটেছিল।"[৩] কেশবচন্দ্রের পরেই সুরেন্দ্রনাথের মন যাঁকে নাড়া দিয়েছিল তিনি হলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তাঁর বিধবা বিবাহ আন্দোলন সুরেন্দ্রনাথের হৃদয়ে সমবেদনার প্রতিধ্বনি তুলেছিল। তাঁর আত্মজীবনীতে তিনি বলেন কেমন করে তাঁর প্রতিবেশিনী একজন ব্রাহ্মণ বালিকা তার স্বামীকে হারায় এবং বালক বয়সেই তিনি কেমন করে তাকে দ্বিতীয়বার বিবাহ দেবার ইচ্ছা মনে মনে কামনা করেছিলেন। বিদ্যাসাগর সম্পর্কে তাঁর শ্রদ্ধার্ঘ এই রকম: "তাঁর নাম বাংলাদেশে সম্মানিত এবং আমার মনে হয় রাজা রামমোহন রায়ের পরেই তাঁর স্থান আমাদের ইতিহাসে গর্বের সঙ্গে লেখা থাকবে।"[৪] আর শেষে বলা হলেও এটা মোটেই কম করে বলা হচ্ছে না যে প্যারীচরণ সরকারের মদ্যপান বর্জন আন্দোলন তরুণ সুরেন্দ্রনাথের কল্পনাকে প্রভাবিত করেছিল। তিনি বলেছেন: "মদ্যপান বর্জন আন্দোলন বিরাট সাফল্য লাভ করেছিল। আমরা সবাই এটাতে যোগ দিয়েছিলাম। আমরা এতে খুব উৎসাহ বোধ করেছিলাম, অনেক সভা করেছিলাম আর বক্তৃতা দিয়েছিলাম।"[৫] এগুলোর সমস্তই সমাজ-সংস্কার আন্দোলন। তখনও রাজনৈতিক আন্দোলন সুরু হতে দেরি আছে, আর সেই আন্দোলন সুরু করবার ভার যিনি শেষে নিয়েছিলেন তিনি হলেন তরুণ সুরেন্দ্রনাথ। তিনি সহজেই প্রভাবিত হতেন আর, তাঁর মন ছিল অনুসন্ধিৎসু।

---

৩। এ নেশন ইন মেকিং—সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী দ্রষ্টব্য
৪। ঐ
৫। ঐ

## তৃতীয় অধ্যায়

### "অদ্ভুত সব পরিবর্তন"

সুরেন্দ্রনাথ তাঁর "কঠোর জীবনযাত্রা এবং অদ্ভুত সব ভাগ্য পরিবর্তনের" কথা বলেছেন। প্রচণ্ড কঠিন জীবন পথের কাছে অবদমিত না হয়ে এগিয়ে চলার এবার সুরু হল।

সুরেন্দ্রনাথ ইংল্যাণ্ডে গিয়ে ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় প্রতিযোগিতা করবেন এ প্রস্তাব করেছিলেন তাঁর অধ্যক্ষ, জন সাইম। সুরেন্দ্রনাথের পিতা সর্বদাই তাঁর অন্তরে এই ধারণা অতি যত্নের সঙ্গে পোষণ করতেন যে তাঁর পুত্র ইংল্যাণ্ডে গিয়ে পড়াশুনা করবে। বাস্তবিক তিনি তাঁর পুত্রের মঙ্গলকামনা এতখানি করতেন যে তিনি তাঁর উইলে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে সে যেন তার শিক্ষা সমাপ্ত করবার জন্য ইংল্যাণ্ডে যায়। তাই পিতা অধ্যক্ষের প্রস্তাবে তৎক্ষণাৎ সম্মতি দিলেন। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের ৩রা মার্চ তারিখে সুরেন্দ্রনাথ, তাঁর দুই বন্ধু, রমেশচন্দ্র দত্ত এবং বিহারীলাল গুপ্তের সঙ্গে জাহাজে ইংল্যাণ্ডে যাত্রা করলেন।

সে সময়ে একজন ভারতীয়ের পক্ষে ইংল্যাণ্ড ভ্রমণ মনস্তাত্ত্বিক, সামাজিক বা আর্থিক—কোন দিক থেকেই খুব সুবিধের ছিল না। একজন সাধারণ ভারতীয়ের কাছে সমুদ্রযাত্রা পাপ বলে পরিগণিত হত, আর এর ফলে যে গোঁড়ামির প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হত তা মোটেই বন্ধু ভাবাপন্ন নয়। ইংল্যাণ্ড থেকে ফিরে আসা লোকের একঘরে হবার ভয়াবহ একটা সম্ভাবনা থেকেই যেত। একজন সাধারণ ভারতীয়ের কাছে একটা লম্বা সমুদ্র যাত্রা করে অজানা দেশে উপস্থিত হওয়া একটা ভীতিপ্রদ ব্যাপার ছিল। এই সমস্ত কুসংস্কার এবং বাধাকে অতিক্রম করতে হয়েছিল। সুরেন্দ্রনাথের পিতা এ ব্যাপারে নিশ্চিত

ভাবে সাহায্য করলেও ভ্রমণের সমস্ত আয়োজন গোপনে করতে হয়েছিল এবং যাত্রার প্রায় পূর্ব মুহূর্তে সুরেন্দ্রনাথের মাতাকে একথা জানানো হলে তিনি তৎক্ষণাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়েন। যাত্রার পূর্বরাত্রে ঐ তিনজন যুবক তখন সদ্য ইংল্যাণ্ড প্রত্যাগত মনোমোহন ঘোষের বাড়ীতে আশ্রয় নিয়েছিলেন, তিনি বেশী সংখ্যক লোকের ইংল্যাণ্ডে যাওয়াকে প্রবলভাবে সমর্থন করতেন। ভোরবেলা তাঁরা চাঁদপাল ঘাট থেকে ষ্টীমারে ওঠেন, এখানে দুর্গাচরণ এসেছিলেন সজল নয়নে সুরেন্দ্রনাথকে বিদায় দিতে, সেই দেখাই যে তাঁর এবং তাঁর পুত্রের মধ্যে শেষ দেখা তা কে জানত!

সুরেন্দ্রনাথ ইংল্যাণ্ডে পাঁচ সপ্তাহে পৌঁছে যান, আর সেখানে ডব্লিউ. সি. ব্যানার্জি তাঁকে অভ্যর্থনা করেন। ক্রমশ তিনি তাঁর কাজে মনোনিবেশ করেন, প্রচুর পরিশ্রম করেন এবং ১৮৬৯ সালে সর্ব সাধারণের জন্য প্রতিযোগিতামূলক ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় কৃতকার্য হন। তিনি তখন লণ্ডন ইউনিভার্সিটি কলেজিয়েট স্কুলের ল্যাটিন শিক্ষক মিষ্টার এলির পরিবারে গৃহ ছাত্র হিসেবে বাস করছিলেন। এটি ছিল কলঙ্কমুক্ত, সুখী, যথাযথ ইংরিজী আবহাওয়ার বাড়ী—এখানে সহৃদয়তার সঙ্গে তাঁকে গ্রহণ করা হয়েছিল।

এবার সুরু হল সেই সময়টা, যাকে সুরেন্দ্রনাথ বলেছেন "অদ্ভুত সব পরিবর্তন"। সত্যি, একজন সাধারণ মানুষের জীবনে এতগুলি ঘটনা পরপর ঘটে যাওয়ার নজির বেশি নেই। বলা হয় বিরোধিতার ফলে সত্যিকারের মানব শক্তির বিকাশ হয়। এই বিরোধিতাগুলোই সুরেন্দ্রনাথকে বীরোচিত যোদ্ধায় পরিণত করে। জীবনের প্রথম দিকে তাঁকে প্রচণ্ড হতাশা, কঠোর পরিশ্রম ইত্যাদির মুখোমুখি হতে হয়েছিল। এরফলে তাঁর দৃঢ় নির্ভীক চরিত্র ইস্পাতের মত কঠিন হয়ে উঠেছিল। আর তিনি প্রতিরোধক্ষমতা এবং বীরোচিত আত্মবঞ্চনার অধিকারী হয়েছিলেন।

প্রথম এবং সবচেয়ে বড় আশাভঙ্গ হল সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার

ফল বেরুল যখন। সিভিল সার্ভিস কমিশনারদের কাছে একটি ঘটনা জানানো হল আর তা হল সুরেন্দ্রনাথের বয়সের গোলমাল। ব্যাপারটা হল এই যে তখনকার নিয়ম অনুসারে পরীক্ষার্থীর বয়স অবশ্যই উনিশ বছরের বেশী এবং একুশ বছরের কম থাকতে হত। দুর্ভাগ্যক্রমে, ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার নিদর্শন পত্রে তিনি নিজের বয়স ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বরে লিখেছিলেন ষোলো– তখনকার আমলের কোনো কোনো ভারতীয় প্রথা অনুযায়ী এটা করা হয়েছিল— অর্থাৎ, যেদিন থেকে সন্তান মাতৃগর্ভে আসে বয়সের হিসাব সেই দিন থেকেই করা হয়, কিন্তু ইংরেজরা যেভাবে বয়স ঠিক করেন সে হিসেবে তখন তাঁর বয়স ১৫। যদি তাঁর ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার সময়কার বয়স সত্যি ১৬ হয় তাহলে ১৮৬৯ সালের প্রতিযোগিতার পক্ষে তাঁর বয়স বেশী হয়ে পড়ে, কিন্তু ইংরেজী কায়দায় দেখতে গেলে এবং প্রকৃত বয়স দেখতে গেলেও তাঁর পরীক্ষা দেবার পূর্ণ যোগ্যতা ছিল।

তিনি এটাকে কৈফিয়ত হিসেবে দাখিল করলে সিভিল সার্ভিস কমিশন তা নাকচ করে দেন, আর তাঁর নাম এবং এইসঙ্গে একই কারণ দেখিয়ে তাঁরই এক সতীর্থ এস. বি. ঠাকুরেরও নাম কৃতী ছাত্রদের তালিকা থেকে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়। এরকম সিদ্ধান্তে সারা ভারতবর্ষে প্রতিবাদ এবং ক্ষোভ দেখা দেয়। ভারতবর্ষের মহান নেতাগণ, যেমন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজা রাজেন্দ্র লাল মিত্র, কৃষ্টদাস পাল ভারতবর্ষের প্রচলিত ধারা অনুযায়ী বয়স নির্ধারণের ব্যাপারে প্রমাণ দাখিল করেন।

একজন তরুণ, যিনি আশা করে এত হাজার মাইল অতিক্রম করে বিদেশে গিয়েছিলেন বিজয়মাল্য অর্জন করতে তাঁর পক্ষে এই আঘাতটা প্রচণ্ডভাবে এসে লাগল। অন্য কারুর এরকম ধাক্কায় স্নায়ু ভেঙ্গে পড়ত, কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ ছিলেন শক্ত ধাতুতে গড়া। যখন এরকম আঘাতে বিহ্বল এবং বিভ্রান্ত হবার কথা তখন তিনি প্রচণ্ড সাহসের সঙ্গে কুইন্স বেঞ্চ থেকে সিভিল সার্ভিস কমিশনারদের প্রতি আদেশ দেওয়ার ব্যবস্থা করলেন। সুরেন্দ্রনাথ দু'জন খুব যোগ্য লোককে

উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ করেছিলেন—তাঁরা হলেন মিষ্টার মেলিশ এবং মিষ্টার জন বেল। ইংল্যাণ্ডের লর্ড চীফ জাষ্টিসের সভাপতিত্বে সম্ভ্রান্ত সভ্যদের দ্বারা গঠিত বেঞ্চে আবেদনের শুনানী হয়। আইনটা মঞ্জুর হয়, কিন্তু এই স্মরণীয় আইনযুদ্ধ শেষ হবার আগেই সিভিল সার্ভিস কমিশনারেরা তাঁদের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে নেন—তাঁরা তাঁদের ভুল বুঝতে পারেন এবং সুরেন্দ্রনাথের নাম 'সিভিল সার্ভিসে মনোনীত নামের তালিকায় যুক্ত হয়।

এই সময়টি সুরেন্দ্রনাথের কাছে সবচেয়ে বড় বিজয়ের মুহূর্ত--তিনি অসাধারণ সাহস, ধৈর্য এবং সহ্যশক্তির প্রমাণ দিয়েছিলেন। এই একটি ঘটনায় বোঝা গিয়েছিল যে তিনি কোন অন্যায় নীরবে মেনে নিতে পারতেন না, তাঁর আপাত অমায়িকতার আড়ালে ছিল তাঁর প্রচণ্ড যুদ্ধ করবার মত মনোবৃত্তি—যিনি ভবিষ্যতে বহু আমলাতান্ত্রিক ভুলভ্রান্তির বিরুদ্ধে প্রতিরোধের আন্দোলনের সামনে ছিলেন।

সুরেন্দ্রনাথের ভাগ্য দেবতা এমন নিষ্ঠুর ছিলেন যে এই প্রচণ্ড বিজয়-আনন্দের মুহূর্ত হঠাৎ গভীর বিষাদে পরিণত হল। যিনি তাঁর এই বিজয়ে সবচেয়ে বেশী আনন্দ পেতে পারতেন, তাঁর পিতা ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে পরলোক গমন করেন। এই সংবাদ বিলম্বে মার্চ মাসের মাঝামাঝি তাঁর কাছে পৌঁছায়, এবং সম্পূর্ণভাবে তাঁকে কাবু করে ফেলে। তিনি তাঁর আত্মজীবনীতে এই শোক সম্পর্কে আশ্চর্য সংযমের সঙ্গে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু ঐ কয়েকটি কথাতেই গভীরভাবে অনুরক্ত পুত্রের এবং কর্তব্যপরায়ণ পিতার সঙ্গেকার আশ্চর্য বন্ধন এবং আবেগ অদ্ভুতভাবে ফুটে উঠেছে।

তিনি তাঁর আত্মজীবনীতে ইংল্যাণ্ডে তাঁর সমসাময়িক ছাত্রদের সম্পর্কে অদ্ভুত ভাল বর্ণনা দিয়েছেন—সেগুলি অসাধারণ চিত্তাকর্ষক কেননা সেই সময় খুব কম সংখ্যক ভারতীয় ছাত্রই ইংল্যাণ্ডে শিক্ষালাভ করবার মত খরচ জোটাতে এবং সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিতে পারত। তাঁর দু'জন বন্ধু আর. সি. দত্ত এবং বি. এল. গুপ্ত সম্পর্কে সুরেন্দ্রনাথ

খুব প্রশংসা করেছেন—এঁদের দু'জনেই সিভিল সারভ্যাণ্ট হিসেবে খুবই উন্নতি করেছিলেন। আর. সি. দত্ত কেবল যে একজন সিভিলিয়ান ছিলেন তা নয়, তিনি একজন সাহিত্যিক এবং অর্থনীতিবিদও ছিলেন—তিনি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের একজন সভাপতি হয়েছিলেন। কোলকাতার প্রধান প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে বিহারীলাল গুপ্ত, সরকারকে বিচারের ক্ষেত্রে জাতি হিসাবে বিচারের রকমফের—যেটি অত্যন্ত অপমানজনক অনিয়ম—অবহিত করেছিলেন। পরে লর্ড রিপন বিতর্কমূলক ইলবার্ট বিল এর সাহায্যে এই অনিয়ম দূর করবার চেষ্টা করেছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ, এস. বি. ঠাকুর, যিনি বোম্বাই-এর জেলা জজ হয়েছিলেন এবং আসামের আনন্দরাম বড়ুয়ার বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা করেন।

যে সমস্ত অধ্যাপকের কাছে সুরেন্দ্রনাথ লেখাপড়া শিখবার সুযোগ পেয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ডক্টর গোল্ডস্টাকার এবং হেনরি মরলি-র কথা তিনি অত্যন্ত আবেগ মিশ্রিত প্রশংসার সঙ্গে বারংবার উল্লেখ করেন। প্রথমোক্ত জন ছিলেন সংস্কৃতের শিক্ষক, ঠিক একজন কঠোর ভারতীয় গুরুর মত ছিলেন, আর শেষোক্ত জন ছিলেন শান্ত সমাহিত মিষ্টি স্বভাবের। ইনি সুরেন্দ্রনাথের বয়সের ব্যাপারে চার্লস ডিকেন্সকে বুঝিয়ে তাঁর কাগজ 'গুডওয়ার্ডস্'-এ একটি খুব জোরালো প্রবন্ধ লেখান।

ভারতীয় হওয়া সত্ত্বেও, তাঁর ইংল্যাণ্ড অবস্থানকালে ইংরেজদের কাছ থেকে সর্বদাই সৌজন্যপূর্ণ এবং সহৃদয় ব্যবহার পেয়েছেন—এবং সেজন্য বৃটেনের উদার মনোভাব এব সাংবিধানিক স্বাধীনতা—যা কেবল ইংল্যাণ্ডেরই বিশেষত্ব, তারজন্য তিনি সমস্ত জীবন ধরে শ্রদ্ধা দেখিয়ে এসেছেন। প্রচণ্ড চরমপন্থীদের সমালোচনা সত্ত্বেও, জীবনের শেষভাগে জনপ্রিয়তা হারিয়ে এবং রাজনৈতিক অসুবিধাকে অগ্রাহ্য করেও তিনি বৃটিশ গণতান্ত্রিক ধ্যান ধারণার প্রতি ভক্তি যা তাঁর আত্মার গভীরে প্রবেশ করিছিল, তা বজায় রেখেছিলেন। "আমরা প্রেরণা এবং পথ নির্দেশের জন্য ইংল্যাণ্ডের দিকে চেয়ে থাকি···আমরা ইংরেজী সাংবিধানিক স্বাধীনতার সতেজ খাদ্যের স্বাদ গ্রহণ করেছি। ইংরেজী রাজনৈতিক দর্শনের মহান গুরুদের বাকপটুতা এবং প্রতিভাকে ভক্তি

করতে আমাদের শেখানো হয়েছে।"[৬] ছোটবেলাকার উদারনৈতিক বৃটিশ চিন্তাবিদদের কাছে বসে শিক্ষার ফলে তাঁর রাজনৈতিক দর্শন এমনভাবে গড়ে উঠেছিল যা সাময়িক ঝড় বাতাসে কোনো পরিবর্তন আনেনি।

ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের জন্ম সম্পর্কে কিছু বলাটা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। এই একটি ব্যাপারের মধ্যেই ভারতীয় রাজনৈতিক উচ্চাশা কেন্দ্রীভূত হয়েছিল। তখনকার আমলের রাজনৈতিক নেতাদের এই বিশ্বাস দৃঢ় ছিল যে স্বরাজের পথে যাবার প্রথম পদক্ষেপ হল শাসন বিভাগে, বিশেষ করে উচ্চতম পদে ক্রমবর্ধমানভাবে ভারতীয়দের নিয়োগ। এই ব্যাপার নিয়ে দীর্ঘস্থায়ী এবং তিক্ত দ্বন্দ্ব চলেছিল শিক্ষিত ভারতীয় সম্প্রদায় এবং বৃটিশ আমলাতন্ত্রের মধ্যে। সুরেন্দ্রনাথের কাছে এটা একটা বেদনাদায়ক ব্যক্তিগত ব্যাপার—যেটা শেষ পর্যন্ত রাজনীতির ব্যাপারে দাঁড়িয়ে যায় এবং তাঁর প্রথম জীবনের রাজনৈতিক কাজকর্মের কাঠামো হিসেবে কাজ করে।

ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস, পরে যার নাম হয় কভেনান্টেড সিভিল সার্ভিস, আগেকার কম্পানীর স্বেচ্ছাচারিতা এবং কুশাসনের পর পীড়াদায়ক নানারকম প্যাঁচ এবং কৌশলে অতি মন্থর গতিতে গড়ে উঠেছিল। লর্ড কর্ণওয়ালিস এমনভাবে সরকারী উচ্চপদস্থ করণিকদের স্থান ইউরোপীয়দের দিয়ে ভরে ফেলেছিলেন যে রামমোহন রায়ের মত অতিকায় বুদ্ধিমান লোকও একজন কলেকটরের দেওয়ান-এর চাইতে উঁচুতে উঠতে পারেননি। ১৮০৬ সাল থেকে সুরু করে পঞ্চাশ বছর হেইলিবেরি কলেজের পাসকরা লোকদের দিয়েই ভারতবর্ষের সিভিল সার্ভিস চালানো হত। এই কলেজে পাঠানো হত কম্পানির পরিচালকবর্গ, বোর্ড অব কণ্ট্রোল মনোনীত ব্যক্তিদের এইটেই ছিল প্রচলিত রীতি। অন্য কথায় বলতে গেলে রীতিটি স্বজনপোষণ, প্রিয়পোষণ এবং পৃষ্ঠপোষকতার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল।

৬। স্পিচেজ অ্যাণ্ড রাইটিংস্—সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী দ্রষ্টব্য

ষোল বছর বয়স হলে মনোনয়ন দেওয়া হত, তারপর দু'বছর কলেজে পড়াশুনা করতে হত। এখানে ভারতীয়দের গ্রহণ করবার কোনো প্রশ্নই ছিল না। যখন রাজা রামমোহনের পোষ্য পুত্র রাজারামকে মনোনয়নের প্রস্তাব করা হল তখন পরিচালকবর্গ তা নাকচ করে দেন যদিও তার আর সমস্ত যোগ্যতাই ছিল। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের সনদে সীমিত প্রতিযোগিতার নীতি গৃহীত হয় কিন্তু কাজকর্মে তার প্রয়োগ কখনই হয়নি। অবশেষে ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দের সনদ আইন অনুসারে কম্পানির মনোনয়ন ঘটিত কায়েমী স্বার্থের অবসান হয় যখন সিভিল সার্ভিসে রাণীর রাজত্বে জন্ম সবাইকারই যোগ দেবার অধিকার দেওয়া হয়। রাণীর ঘোষণায় এই নীতিকে সমর্থন করা হয়। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা নেওয়া হয় আর ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে সিভিল সার্ভিস কমিশনারগণ এর ভার গ্রহণ করেন।

এইসঙ্গে মেকলের খোলাখুলি প্রতিযোগিতা, এবং কম্পানির পরিচালকবর্গের জাতিগত একচেটিয়াত্ব নীতি বাতিল করবার জন্য ওকালতির কথা অবশ্যই স্মরণীয়। যদিও ভারতবর্ষের ইতিহাসে মেকলের নাম প্রতীচ্য সংস্কৃতি নিন্দাকারী হিসেবে স্থান পেয়েছে কিন্তু তবু তাঁর প্রচণ্ড উদারতা সিভিল সার্ভিস সংস্কারে বহু স্থানে কার্য্যকরভাবে সাহায্য করেছে। মেকলে কমিটি, খোলাখুলি প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে বয়সের উচ্চসীমা ২৩ বছরে এবং নিম্নসীমা ১৮ বছরে করবার জন্য প্রস্তাব করেছিলেন। কিন্তু এই প্রস্তাবের আসল উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করবার জন্য নানা অজুহাত খুঁজে বার করা হতে লাগল। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে বয়সের উচ্চসীমা ২২ বছর বেঁধে দেওয়া হল যাতে পরীক্ষার্থীরা ইংল্যাণ্ডে শিক্ষানবিস হিসাবে এক বছর থাকতে পারেন, এবং পরে শিক্ষানবিসী সময় আরো এক বছর বাড়িয়ে দেওয়া হলে বয়সের উচ্চসীমা ঐ পরিমাণে কমিয়ে দেওয়া হয়। যখন সুরেন্দ্রনাথ পরীক্ষায় বসেন তখন বয়সের উচ্চসীমা ছিল ২১ বছর। ভারতবর্ষের লোকেদের পক্ষে ইংল্যাণ্ডে গিয়ে এই বয়সের সীমার মধ্যে পরীক্ষা দেওয়া যে কঠিন হবে সে তো না বললেও চলে। এরফলে ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত যে ষোলো জন

এই পরীক্ষা দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে মাত্র একজন এস. এন. ঠাকুর সাফল্যলাভ করেছিলেন।

এরফলে যেন ক্রমবর্ধমান ভারতীয় উচ্চাশাকে অঙ্কুরেই বিনাশ করা তেমন সুবিধে হচ্ছেনা সেজন্য রাষ্ট্রসচিব, লর্ড সলস্‌বেরির মাথায় ঢুকল যে বয়সের উচ্চসীমা ২১ বড়ই বেশী, তাই ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে তিনি এটাকে আরো কমিয়ে ১৯ করে দিলেন। এটা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে তিনি এটা প্রচুর বিরোধিতার মুখে করেন, এমন কি বৃটিশ আমলাতান্ত্রিকরাও এর বিরোধিতা করেছিলেন। এই ব্যাপারের স্মারকলিপি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে ১০১ জন করণিকের মধ্যে ৫ জন বয়ঃসীমা সম্বন্ধে কোনো মন্তব্য করেননি, কেবল ২৭ জন বয়স কমানোর পক্ষপাতি ছিলেন, ৩৬ জনের মত ছিল বর্তমান বয়ঃসীমাকে অক্ষুণ্ণ রাখা আর ৩৩ জন বয়ঃসীমা ২১ এরও বেশী করবার সপক্ষে মতামত প্রকাশ করেছিলেন।[৭] অতএব দেখা যাচ্ছে উচ্চ বয়ঃসীমা কমানোর কোনোরকম যুক্তিই ছিল না। এটা লর্ড সলস্‌বেরি অত্যন্ত খামখেয়ালিভাবে প্রশাসনিক আদেশের বলে করেছিলেন, ফলে ভারতীয়দের এই লোভনীয় কর্মে প্রবেশ করার যৎটুকু আশা ছিল, তাও ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল।

ভারতীয়দের এইরকম বিক্ষুব্ধ অনুভূতিকে শান্ত করবার জন্য ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের গভর্ণমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট-এ ভারতীয়দের উচ্চপদে গ্রহণ করার ব্যবস্থা করা হল। এর সংশ্লিষ্ট আইন পাস হতে ন'বছর কেটে গেল, তারপর স্ট্যাটুটরি সার্ভিসের জন্ম হল, কিন্তু এই অপয়া শিশুর অচিরেই মৃত্যু হল।

জনমত কেবল যে একটা ন্যায্য বয়ঃসীমা বেঁধে দেবার দাবি জানাল তা নয়—সেইসঙ্গে ইংল্যাণ্ডে এবং ভারতবর্ষে একই সঙ্গে পরীক্ষা নেবার দাবিও করা হল যাতে ভারতীয়দের সরকারী কাজে যোগদান করা সহজ হয়। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের প্রথম কংগ্রেসের প্রস্তাবে এই দাবি করা

৭। দি সিভিল সার্ভিস ইন ইণ্ডিয়া—এন. সি. রায়

হয়। দ্বিতীয় বারের কংগ্রেসে দাদাভাই নওরোজিকে চেয়ারম্যান করে এবং সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে এই প্রশ্নের গভীরে প্রবেশ করবার জন্য সভ্য করে একটা কমিটি গঠন করা হল। তাঁরা যে রিপোর্ট দিলেন তাতে একই সময়ে পরীক্ষা গ্রহণ, স্ট্যাটিউটরি সিভিল সার্ভিস তুলে দেওয়া, এবং বয়সের উর্ধ এবং নিম্নসীমা যথাক্রমে ২৩ এবং ১৯ করার দাবি কংগ্রেস কর্তৃক গৃহীত হল। এইচিসন কমিটি একসঙ্গে পরীক্ষা দেবার দাবি নাকচ করে দিলেন, তবে বয়সের সীমা বাড়িয়ে ২৩ এবং ১৯ করা মেনে নিলেন! এই রিপোর্ট স্ট্যাটিউটরি সিভিল সার্ভিসকে অবলুপ্তি করার সপক্ষে মত প্রকাশ করলেন।

সুরেন্দ্রনাথের কর্মজীবনের প্রথম দিকের সমস্ত সময় ধরেই সরকারী কাজকর্মে ভারতীয় নিয়োগ ব্যাপারে প্রবল সংগ্রাম করেন। তাঁর জনসভার বক্তৃতাগুলিতে এই বিষয়টি বারংবার উল্লেখিত হত—পুনা এবং আহ্‌মেদাবাদে সভাপতির স্মরণীয় অভিভাষণ দুটিতেও তিনি এবিষয়ে বলেন। কিন্তু এই সংগ্রাম দীর্ঘস্থায়ী এবং কষ্টকর হয়েছিল, আর মণ্টফোর্ড-এর সংস্কার-এর আগে এই দাবীর বড় অংশটি আদায় করা যায়নি, এবং ধাঁচ বদলও হয়নি। এখন ভারতীয়রা দাবি করতে লাগলেন যে, সরকারী কাজকর্মে আর ইংরেজ নিয়োগ করা চলবে না, কেননা তার কোনো প্রয়োজন নেই। এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে এই ভারতীয়করণের ব্যাপারে আমলাতন্ত্র এবং কায়েমী স্বার্থ বিরোধিতা করেছিল। আগেই বলা হয়েছে সংগ্রাম দীর্ঘ এবং প্রচণ্ড হয়েছিল। মণ্টফোর্ডের আমল থেকে বহু জরুরী রাজনৈতিক ব্যাপার এই প্রশ্নের উপরে স্থান পেয়েছিল। এই ঘটনাবলীর শেষ রূপ নেয় স্বাধীনতা প্রাপ্তিতে।

এবারে আসল বক্তব্যে ফিরে যাওয়া যাক। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর সুরেন্দ্রনাথ সেই বছরের আগষ্ট মাসে তাঁর দুজন বন্ধু আর. সি. দত্ত এবং বি. এল. গুপ্তের সঙ্গে ইউরোপের দেশগুলি ঘুরে ভারতবর্ষের দিকে রওনা দেন। বোম্বাই থেকে তিনি কোলকাতায় আসেন—পথে এলাহাবাদে তিনি যাত্রা ভঙ্গ করেন এবং একটি জন

অভ্যর্থনা সভায় তিনি একটি বক্তৃতা দেন। কোলকাতার বাড়ীতে ফিরে আসার পর যখন তাঁর বিধবা মায়ের সঙ্গে দেখা হয়—যিনি জীবনসঙ্গী হারা অবস্থায় তাঁর প্রিয় পুত্রের আগমনের জন্য দীর্ঘ ও নিঃসঙ্গ প্রতীক্ষা করছিলেন—তখন এক করুণ দৃশ্যের অবতারণা হয়।

পরিবারের পক্ষে সুরেন্দ্রনাথের কোলকাতায় ফিরে আসাটা একটা সামাজিক সমস্যায় দাঁড়িয়ে গেল। তখন সমুদ্রযাত্রাকে লোকে নিষিদ্ধ মনে করায়, গোঁড়া হিন্দু সমাজ, বিশেষ করে ব্রাহ্মণ বর্ণের লোকেরা তাঁর পরিবারকে একঘরে করে।

কিন্তু কোলকাতার প্রগতিশীল লোকেরা তাঁর আগমনকে অভ্যর্থনা জানান। একই সংগে সুরেন্দ্রনাথ এবং তাঁর দুই বন্ধুর সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া একটা বিরাট বিজয় হিসেবে পরিগণিত হয়েছিল। কয়েক বছর আগে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাফল্যের পর এঁরাই হলেন দ্বিতীয় সফল দল। বেশ উৎসাহের সংগে তাঁদের সম্মানের সংগে অভ্যর্থনার বন্দোবস্ত করা হল। যাঁরা এই অভ্যর্থনা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে বড় বড় লোকের মধ্যে ছিলেন কেশবচন্দ্র সেন এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। ঘটনাটিতে কেবল যে বাংলাদেশেই লোকে আনন্দ করেছিল তা নয়, সমস্ত ভারতবর্ষে আনন্দের স্রোত বয়ে গিয়েছিল। বাস্তবিকই সমস্ত ভারতবর্ষ এই সাফল্যে শিহরণ অনুভব করেছিল। শাসক জাতির অত্যন্ত কড়া পাহারা বসানো জায়গা ইতিহাসে দুবার সাফল্যের সংগে আক্রমণ করা হল এবং জয় করা হল।

তখন শ্রীহট্ট ছিল বাংলাদেশের অংশ, পরে তা আসামের সংগে সন্নিবিষ্ট হয়। এখানে সুরেন্দ্রনাথ একজন ইঙ্গ ভারতীয় ম্যাজিস্ট্রেট এইচ. সি. সাদারল্যাণ্ড-এর অধীন সহকারী ম্যাজিস্ট্রেট পদে বহাল হন। কিছুদিন বেশ ভালয় ভালয় কাটল। তারপর তাঁর অদৃষ্টের সবচেয়ে প্রচণ্ড হতবুদ্ধিকর আঘাত এসে লাগল। একজন খাঁটি ইংরেজ—পস্ফোর্ড, আর একজন সহকারী ম্যাজিস্ট্রেট, ইনি সুরেন্দ্রনাথের চাইতে দু বছর

বেশি কাজ করছেন, বিভাগীয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেননি, কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ এরকম রমণীয় চাকুরেদের মধ্যে একজন হয়ে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। এই নিয়ে স্থানীয় নানারকম কানাঘুষা সুরু হল এবং অফিসে হিংসের ঝড় বয়ে গেল। সাদারল্যাণ্ড এটা অত্যন্ত কলঙ্ককর মনে করলেন যে একজন ভারতীয় উত্তীর্ণ হলেন কিন্তু একজন ইংরেজ হলেন না। ইউরোপীয় ম্যাজিস্ট্রেটতন্ত্রের সংগে সুরেন্দ্রনাথের এক ঠাণ্ডা-যুদ্ধ চলতে লাগল। সাদারল্যাণ্ডের সুরেন্দ্রনাথের উপর রাগও ছিল এই কারণে যে সুরেন্দ্রনাথের সংগে যুগ্ম-ম্যাজিস্ট্রেট অ্যাণ্ডারসন-এর ছিল বন্ধুভাব, কিন্তু সাদারল্যাণ্ডের সংগে অ্যাণ্ডারসনের বনিবনা ছিল না।

সুরেন্দ্রনাথকে যেখানে নিয়োগ করা হয়েছিল সে জায়গায় বিপিনচন্দ্র পালের জন্ম—তাঁর স্মৃতিকথায় আছে সুরেন্দ্রনাথ তাঁদের বিদ্যালয়ে গিয়েছিলেন, এবং কেমন করে শ্রীমতী বন্দোপাধ্যায় স্কার্ট আন্দোলিত করে ঘোড়াতে চড়েছিলেন।[৮] বিপিনচন্দ্র পালের স্মৃতিতে সাদারল্যাণ্ড-এর চেহারা ছিল, "জ্ঞানী এবং ভারিক্কী" যিনি প্রথমে সুরেন্দ্রনাথকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করলেও ইউরোপীয়ান সমাজে তাঁকে সমভাবে গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। সুরেন্দ্রনাথ অবশ্য এই জাতিগত ঔদ্ধত্যের কাছে নতিস্বীকার না করে তাঁর স্বভাবগত স্বাধীনতার সংগে চলাফেরা করতে থাকেন। শোনা যায়, সুরেন্দ্রনাথের স্ত্রী রেসের মাঠে একবার ইউরোপীয়দের স্ত্রীদের সংরক্ষিত জায়গায় বসবার দাবি জানান।[৯] শেষোক্তগণ সুরেন্দ্রনাথের উপর খুব বিশ্রী রকমের হিংসে করতেন। এমনকি এও মনে করা হত যে সাদারল্যাণ্ড সুরেন্দ্রনাথ সম্পর্কে খবরাখবর করার জন্য গোয়েন্দার সাহায্য নিতেন।

ভাগ্যগুণে জাতিগত হিংসার ব্যাপারে তাদের বিশেষ সুযোগ এসে

---

৮। মাই লাইফ অ্যাণ্ড টাইম্‌স্, ( ১৮৫৭-১৮৮৪ )

৯। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ—মণি বাগচী

গেল। যুধিষ্টির নামের একজনকে চুরির অপরাধে সুরেন্দ্রনাথের আদালতে বিচারের জন্য হাজির করা হয় কিন্তু কাজ অনেক বেশি থাকায় বিচার করা সম্ভব হয় না। একটা আদেশ জারি করা হয়—সুরেন্দ্রনাথের তাতে সই ছিল, তাতে এই ব্যক্তিকে ফেরারি হিসেবে ঘোষণা করা হয়—অথচ সত্যি সত্যি সে তা ছিল না। এই প্রয়োগগত ত্রুটির জন্য সুরেন্দ্রনাথের দায়িত্ব খুব বেশি ছিল না। মামলার নিষ্পত্তি হতে দেরি হচ্ছে কেন তার কারণ হিসেবে পেশ্‌কার তাঁকে দিয়ে এই আদেশ জারি করিয়ে নিয়েছিল, কেননা ছোটখাট অফিসারদের পেশকারদের উপর নির্ভর করতেই হয়। তবে এটা স্পষ্ট যে সুরেন্দ্রনাথ কিছু না জেনেই আদেশ জারি করেছিলেন, এর গুরুত্ব কতখানি তা তিনি বুঝতে পারেন নি।

ম্যাজিস্ট্রেট সাদারল্যাণ্ড এবার সুযোগ পেয়ে গেলেন। সাধারণত এরকম ক্ষেত্রে দোষী কোনো তরুণ অফিসারকে হয়ত একটা 'ওয়ার্নিং' দিয়েই ছেড়ে দেওয়া হত। কিন্তু এক্ষেত্রে সুরেন্দ্রনাথের কাছ থেকে কৈফিয়ত চাওয়া হল, এবং তাঁর কৈফিয়ত গ্রাহ্য করা হল না। জেলা জজের মাধ্যমে ব্যাপারটা হাই কোর্টে পৌঁছুল, এবং অবশেষে সরকার একটা সম্পূর্ণ ইউরোপীয় তদন্ত কমিশন বসালেন। কমিশনারেরা সুরেন্দ্রনাথকে অসাধু এবং মিথ্যা কৈফিয়ত দেবার অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করলেন। শেষ পর্যন্ত এরফলে তাঁকে চাকুরী থেকে বরখাস্ত করে চরম শাস্তি দেওয়া হয় আর দয়াবশত মাসে পঞ্চাশ টাকা করে ভাতা দেবার ব্যবস্থা করা হয়। এতদিন পরে এই ঘটনা অদ্ভুত মনে হতে পারে কিন্তু সুরেন্দ্রনাথের জীবনে ঘটনাটি সত্যি সত্যি এরকমই ঘটেছিল। বহু বছর পর কিছু স্বার্থহীন ইউরোপীয় অফিসার—এঁদের মধ্যে দুজন ছিলেন বাংলার লেফ্‌টেন্যান্ট গভর্ণর—এটাকে শয়তানী বিচার বলে এবং সুরেন্দ্রনাথের প্রতি প্রচণ্ড অন্যায় হয়েছিল বলে স্বীকার করেছিলেন। ব্যাপারটা আরো স্পষ্ট হয় তখন যখন সিভিল সার্ভিস থেকে বরখাস্ত করার আট বছর পর

তাঁকে সেই একই সরকার অবৈতনিক প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে এবং জাস্টিস অফ দি পীস্ হিসেবে নিযুক্ত করেন।

সুরেন্দ্রনাথের তেজী মনোভাব ছিল তাই তিনি অসহায়ভাবে এসব মেনে নিলেন না—তিনি ইংল্যাণ্ডে গিয়ে ইণ্ডিয়া অফিসে তাঁর বক্তব্য পেশ করেন। সেখানে তিনি দেখলেন কর্তৃপক্ষ কোনোরকম উৎসাহই দেখালেন না। কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই তাঁকে সরকারীভাবে ভারতীয় সিভিল সার্ভিস থেকে বরখাস্ত করার কথা ঘোষণা করা হয়। তাঁর জীবনের একটা অধ্যায় এই রকম আপাতঃ অসম্মানের মধ্যে শেষ হয়। সুরেন্দ্রনাথ এক বছর ধরে কঠিন সংগ্রাম করে পরাজিত হন। তিনি তাঁর বরখাস্তের আদেশ, যা তাঁর কাছে অচিন্তনীয় ছিল না, পেয়ে বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতার হাত থেকে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। এবারে তিনি জানলেন তাঁর স্থান কোথায়। তাঁর চরিত্রে হতাশা বলে কোনো বস্তু ছিল না। বাধা তিনি অনেক পেয়েছেন জীবনে, এবং পরে আরো বাধা তাঁর জন্য সঞ্চিত ছিল। কিন্তু পর পর এই সমস্ত বাধার ফলে মানুষের অপরাজয়ের তেজ উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। আবার তিনি জীবনের কঠিন যুদ্ধে যোগ দেবার জন্য বদ্ধপরিকর হলেন। এরকম ঘটনা ঘটতে পারে কল্পনা করে তিনি মিডল টেম্পলে আইন পরীক্ষা দেবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। কিন্তু ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে যখন তাঁর ব্যারিস্টার হবার সময় হল, তখন আদালতের লোকেরা তাঁকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন এই অজুহাতে যে তাঁকে এর আগে সিভিল সার্ভিস থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে। তিনি সিভিল সার্ভিস এবং বার এই দুই স্থানেই প্রবেশাধিকার পেলেন না। এভাবে তাঁর "সমস্ত রকম সম্মানজনক উচ্চাশার পথ" বন্ধ হয়ে গেল।

এই ঘন অন্ধকারাচ্ছন্ন বিপদের দিনে—যখন তাঁর সকল বন্ধুবান্ধব তাঁকে পরাজিত মনে করে সমস্ত আশা বিসর্জন দিয়েছিলেন, তখন হঠাৎ তাঁর জীবনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে তিনি অবহিত হলেন। এটা যে

কেবল একটি ব্যক্তিগত সঙ্কল্প ছিল তা নয়, এটা তাঁর দেশের ইতিহাসের পক্ষে একটা বিশেষ ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। এই সিদ্ধান্ত তাঁর কাছ থেকে শুনলেই সবচেয়ে ভাল হয় :

"ধ্বংসের লৌহকঠিন মুষ্টির মধ্যে থেকেও আমি ধারণা করতে পেরেছিলাম জীবনের পথে আমাকে কি কাজ করতে হবে। আমি অনুভব করেছিলাম যে আমার এই দুর্দশার কারণ আমি ভারতীয়—আমি এমন একটি সমাজের লোক যে সমাজ বিশৃঙ্খল, এর কোনো জনমত নেই, এবং তাদের সরকারে কোনো বক্তব্যই নেই। আমি আমার যুবক বয়সের সমস্ত আবেগ এবং উত্তাপ দিয়ে অনুভব করেছিলাম যে আমাদেরই দেশে আমরা ক্রীতদাস, আমাদের কাজ কাঠ কাটা এবং জল তোলা। ব্যক্তিগতভাবে আমার প্রতি যে অন্যায় করা হল তাতেই আমাদের দেশের লোকের ক্লীবত্বের, অসহায়ত্বের একটা প্রমাণ পাওয়া গেল। আমি অতীতে যেমন দুঃখ পেয়েছি, অন্য লোকেরা ভবিষ্যতে তেমনি দুঃখ পাবে নাকি? আমি নিজের মনে ভেবেছিলাম—নিশ্চয়ই পাবে যদি আমরা সমাজ হিসেবে এবং ব্যক্তি হিসেবে নিজেদের প্রতি অন্যায়কে দূর না করি, আমাদের সামাজিক বা ব্যক্তিগত অধিকারকে রক্ষা না করি। ধ্বংস এবং অন্ধকারের দরজায় দাঁড়িয়ে, দুর্ভাগ্যের ভ্রুকুটির সামনে, আমি দৃঢ়ভাবে প্রতিজ্ঞা করলাম যে এই ব্যাপারে আমাদের দেশের অসহায় লোকদের আমি সাহায্য করব।"[১০]

এই উদ্দেশ্যে, তিনি ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল থেকে সুরু করে ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল পর্যন্ত তাঁর ইংলণ্ডে অবস্থানের অধিকাংশ সময়ই ইংরেজী সাহিত্যের বড় বড় লেখকের লেখা তার সঙ্গে ইতিহাস এবং অন্যান্য যে সমস্ত লেখা এই বিরাট কাজ করবার ব্যাপারে প্রেরণা দিতে পারে বা যোগ্য করে তুলতে পারে, তা অতি যত্নের সংগে পড়াশুনা করলেন।

১০। এ নেশন ইন মেকিং—সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী

তাঁর জীবনের এই সময় সম্পর্কে তিনি এইরকম অনুভব করেছিলেন :

"এটা ছিল প্রস্তুতির কঠিন শিক্ষানবিসীর বছর ( ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল থেকে ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল পর্যন্ত ) আমার জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান সময়—যখন এই সময়কার কথা ভাবি তখন অসীম আনন্দে আমার মন ভরে যায়। আমার চারিদিকের হতাশা এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর ফলে কেটে গেল। এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গী হল আমার এই পতিত দেশের জন্য সেবা, নিঃস্বার্থভাবে তার পূজা করা এবং জীবনকে উৎসর্গ করা এই সময়টা ক্রমাগত কাজের মধ্যে এবং অদৃশ্য প্রেরণার মধ্যে কাটছিল। আমি আমার পুরনো হাল্কা ভাবটা ফিরে পেলাম—আমার ভেতরে নতুন আশা এবং আনন্দ জাগল, আর আমি শিহরিত হলাম—বুঝতে পারলাম সমস্ত আশা এখনো ধূলিসাৎ হয়নি, হয়ত আগের চাইতে আরো বড় ক্ষেত্রে এখনো আমার অনেক কাজ করবার আছে। মৃত্যু থেকেই জীবনের উৎপত্তি হয়, আরো বড় জীবন আরো মহান পুনর্জন্ম।"[১০]

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে সুরেন্দ্রনাথ যখন বাড়িতে ফিরলেন তখন তাঁর স্ত্রী খুব উৎসাহের সংগে তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন। এই মহান মহিলা, চণ্ডীদেবী সম্পর্কে একটা কথা বলা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। যদিও প্রচলিত সংজ্ঞা অনুযায়ী তিনি শিক্ষা লাভ করেননি, তাঁর মধ্যে একটা অসাধারণ প্রেম, সমবেদনা ও সাহসের প্রাচুর্য ছিল। এমনকি খুব সঙ্কটের মধ্যেও কাবু না হয়ে অবিচলিত বিশ্বাসের সংগে তিনি তাঁর পাশে এসে দাঁড়াতেন।

কর্ম থেকে সুরেন্দ্রনাথের বরখাস্ত জাতির জীবনে একটা ঐতিহাসিক মোড় নিল। ডক্টর সীতারামাইয়ার কথায় বলতে গেলে এটা ছিল একটা "সৌভাগ্যজনক ঘটনা"। দেশ একজন ভাল সিভিলিয়ানকে হারালো, কিন্তু

১০। এ নেশন ইন মেকিং—সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী

একটা মহান নেতাকে লাভ করল। এই সমস্ত ঘটনার মূলে যে অসাম্যতা রয়েছে তা শিক্ষিত ভারতীয়দের বৃটিশ উদারনৈতিক ভাবধারার বিরুদ্ধে বিশ্বাসে প্রচণ্ড আঘাত দিল আর সমস্ত দেশে অসন্তুষ্টির ঝড় বয়ে গেল। কিন্তু সেই সময় এই আঘাত সম্ভবত দেশের পক্ষে প্রয়োজন ছিল। বরখাস্ত হবার পর জনসাধারণের কাছাকাছি আসার পক্ষে এবং দেশের আধুনিক ইতিহাসের স্রষ্টিকর্তা হিসেবে কাজ করার পক্ষে সুরেন্দ্রনাথের আর কোনো বাধাই রইল না। তাঁর ফিরে আসবার কিছুকাল পরেই ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে তিনি কোলকাতায় মদ্যপান নিবারণী একটি বড় সভায় জনসাধারণের কাছে প্রথম বক্তৃতা করেন—সঙ্গে সঙ্গে তিনি জনসাধারণের বক্তা হিসেবে স্বীকৃতি পান, এবং তাঁর মহান ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কারুর সন্দেহ থাকে না।

# চতুর্থ অধ্যায়

## শিক্ষকতা ও তরুণদের মধ্যে কাজকর্ম

শীঘ্রই পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সুরেন্দ্রনাথের কাছে মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশনে ইংরেজী ভাষার অধ্যাপক পদ গ্রহণের এক প্রস্তাব করেন এবং সুরেন্দ্রনাথ তা গ্রহণ করেন। মাসে ২০০ টাকা মাইনে তাঁর পক্ষে কোনো হিসেবেই বেশি ছিল না, তবে তিনি কিছু করবার এবং তরুণদের সংস্পর্শে আসবার সুযোগ পেয়ে খুসি হয়েছিলেন। "আমি আমার শক্তি অনুযায়ী সমস্ত রকম উপায়ে তরুণদের মধ্যে জনচেতনা এবং দেশপ্রেমের আবেগ জাগিয়ে তুলতে চেষ্টা করতাম—যারফলে তাদের নিজেরও মঙ্গল এবং মাতৃভূমিরও মঙ্গল হয়।[১১]

এভাবে তাঁর জীবনের আর এক অধ্যায় সুরু হল: শিক্ষকতা। তাঁর জীবনকে তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়—শিক্ষকতা, সাংবাদিকতা এবং রাজনীতি। তাঁর রাজনৈতিক নেতার ভূমিকা আমাদের কাছে তাঁর শিক্ষকতার ভূমিকাকে যেন ম্লান না করে। শিক্ষকতাকে তিনি খুব উঁচুতে এমনকি রাজনীতির চাইতেও উঁচুতে স্থান দিতেন। বিদ্যাসাগরের মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশনে কাজ করার সময় সুরেন্দ্রনাথ সিটি স্কুলের (পরে সিটি কলেজ) শিক্ষক হিসাবেও যোগদান করেন। সিটি কলেজ ছিল সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠান—এঁদের মধ্যে অনেক সভ্যের সঙ্গে ছিল তাঁর নিবিড় সাহচর্য। জনসাধারণের মধ্যে কাজ করবার জন্য তাঁর মনে এমন উদগ্র বাসনা ছিল, এবং শিক্ষকতা তাতে এমন অসীম সাহায্য করত যে ত্রিপুর

---

১১। এ নেশন ইন মেকিং

রাজ যখন মাসে ৭০০ টাকা মাইনেতে তাঁকে ইংরেজী সেক্রেটারী নিয়োগ করতে চাইলেন তখন তিনি সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। তখন তাঁর মাইনে ছিল সর্বসাকুল্যে ৩০০ টাকা—এরচেয়ে ঢের বেশী টাকা 'মাইনে বাড়বার কোনো সম্ভাবনাই ছিল না। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে সুরেন্দ্রনাথ মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশন ছেড়ে এক মাস পর ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক হিসেবে ফ্রী চার্চ কলেজে ( বর্তমানে স্কটিশ চার্চ কলেজ ) যোগ দেন।

আরও পরে, ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে প্রেসিডেন্সী ইনস্টিটিউশনে ম্যাট্রিকুলেশন মান পর্যন্ত পড়াবার ভার নিলেন এবং সেটিকে প্রায় পিতার মত যত্নে লালন পালন করতে লাগলেন। এই শিক্ষালয়টি প্রথম শ্রেণীর ডিগ্রী কলেজে পরিণত হয় –এখানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি.এ., বি.এস.-সি. এবং বি.এল. মান পর্যন্ত পড়ানো হত। এর সঙ্গে একটা বিদ্যালয়ও যুক্ত থাকে। এর নাম হয় রিপন কলেজ—এখন এর মহান প্রতিষ্ঠাতার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য এর নাম রাখা হয়েছে সুরেন্দ্রনাথ কলেজ। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে সুরেন্দ্রনাথ ফ্রী চার্চ কলেজ থেকে ইস্তফা দেন, কেননা তাঁর নিজের স্থাপিত প্রতিষ্ঠানের কাজে তাঁর সময় এবং মনযোগ উত্তরোত্তর বেশি দিতে হচ্ছিল।

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দ থেকে সুরু করে ১৯১২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এই সাঁইত্রিশ বছর সুরেন্দ্রনাথ সক্রিয়ভাবে শিক্ষকতার কাজ করেছিলেন, এই সময়ের মধ্যে তিনি ছাত্রদের বংশ পরম্পরা তাঁর আশ্চর্য সুন্দর বিদ্যা এবং বাগ্মিতার সাহায্যে প্রেরণা দিয়েছিলেন, এবং বাংলার ছাত্র জীবনের মধ্যে জাতীয় উদ্দেশ্য গভীরভাবে সঞ্চারিত করেছিলেন। ছাত্রদের প্রতি তাঁর ভালবাসা ছিল অসীম। তাঁর নীতিবাণী ছিল ঃ "আমি ছাত্রদের ভালবাসি।" তিনি ছিলেন সর্বতোভাবে একজন শিক্ষক, আর তিনি প্রায় একজন ধর্ম প্রচারকের মত উৎসাহ নিয়ে শিক্ষা দিতেন। তিনি অনুভব করতেন রাজনৈতিক কাজকর্ম হল সাময়িক,

কিন্তু শিক্ষার কাজের মধ্যে একটা কিছু দেওয়া যায় যা চিরকাল কাজে লাগবে। ছাত্রেরা তাঁর বাক-পটুত্ব এবং নব আদর্শ থেকে প্রচণ্ড উৎসাহের আগুনে জ্বলে উঠত। যতদিন তিনি রিপন কলেজে ছিলেন, ততদিন এই শিক্ষালয়ে বার্ক এবং মেকলে সম্পর্কে তাঁর অসাধারণ বক্তৃতা শুনবার জন্য ক্ষুধার্তের মত ছাত্রেরা ছুটে আসত। এখানেই হয়ে উঠেছিল জাতীয়তাবাদের প্রথম নতুন প্রেরণা প্রদানের কেন্দ্র। এখানে বিখ্যাত ষ্টুডেণ্টস্ অ্যাসোসিয়েশন সম্পর্কে একটা কথা বলতেই হবে—এটি স্থাপন করেছিলেন সুরেন্দ্রনাথের চাইতে বয়সে এক বছর বড়, আনন্দমোহন বসু। ইনি ছিলেন কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন দীপ্তিমান ছাত্র, তিনি কেমব্রিজের প্রথম ভারতীয় র‍্যাংলার, আর কোলকাতার হাইকোর্টে তিনি তখন ক্রমশ উন্নতি করছেন। তিনি সেই সময়কার জন-আন্দোলনের সংগে নিজের হৃদয় এবং আত্মা যুক্ত করেছিলেন। ষ্টুডেণ্টস্ অ্যাসোসিয়েশনকে গড়ে তুলবার জন্য সুরেন্দ্রনাথ যোগ দেন। আনন্দমোহনের আদর্শবাদ আর সুরেন্দ্রনাথের বাস্তববাদের সংমিশ্রণে বাংলাদেশে একটা প্রগতিশীল নেতৃত্ব গড়ে ওঠে।

আজকালকার ছাত্র বিক্ষোভের দিনে রাজনীতি ও ছাত্র সম্পর্কে সুরেন্দ্রনাথের মতামত কি ছিল সে সম্পর্কে কৌতূহল হতে পারে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে নিঃসন্দেহে যত জন ছাত্রদের রাজনৈতিক চেতনা আনতে সাহায্য করেছিলেন তাঁদের মধ্যে সুরেন্দ্রনাথ ছিলেন অন্যতম। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে, "দেশের রাজনৈতিক প্রগতি আমাদের তরুণদের জাতীয় ক্রিয়াকর্মে খাঁটি, সংযম এবং যুক্তিপূর্ণ মনোভাব গ্রহণ করার উপর নির্ভর করে।"[১২] এইসঙ্গে তিনি ছাত্রদের চরম পন্থা সম্পর্কে অনমনীয় মনোভাব রাখাকে অপছন্দ করতেন। তিনি মনে করতেন এতে বিপদ হতে পারে। তৎকালে যুবক মনকে স্থাণুত্ব থেকে চঞ্চল করে তুলেছিলেন কেশবচন্দ্র সেন তাঁর সামাজিক

১২। এ নেশন ইন মেকিং

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে স্বাধীনতা এবং সাম্যের নীতি দিয়ে, কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ এসেছিলেন নতুন বাণী, নতুন আবেদন নিয়ে—আর তা হল রাজনৈতিক। যখন রাজনীতি ছিল কেবলমাত্র বুদ্ধিজীবীদের সময় কাটানর জিনিস তখন তিনি তাঁদের মনে গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। ইউরোপের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস খুব ভাল ভাবে অনুধাবন করার ফলে সুরেন্দ্রনাথ জানতেন এরকম আন্দোলনে ছাত্ররা কি রকম ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। মাৎসিনী এবং ইতালীয় আন্দোলনের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি ছাত্রদের মনে গভীর দেশ প্রেমের উৎসাহ জাগিয়ে তুলেছিলেন। বাস্তবিক, তিনি চেয়েছিলেন উঠতি যুবকদের ভেতর থেকেই আবির্ভাব হবে মাৎসিনি আর গারিবল্ডির দল—যারা ঐক্য এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতা আনবে। একবার যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের সাহায্যে তিনি মাৎসিনি এবং গারিবল্ডির জীবনী বাংলা ভাষায় অনুবাদের ব্যবস্থা করেন।

তিনি বক্তৃতায় যেসব কথা প্রায়ই বলতেন তা হল : ভারতীয় ঐক্য, শিখেদের ইতিহাস, মাৎসিনির জীবনী, চৈতন্যের জীবনী, ইতিহাস শিক্ষা ইত্যাদি। তিনি শিখদের বীরত্বের কথা, তাদের স্বাধীনতার যুদ্ধ, তাদের উদ্দেশ্যের প্রতি মৃত্যুহীন ভক্তি—যেসব কথা বৃটিশ ঐতিহাসিকগণ বইতে লেখেননি, সেই সব কথা শোনাতেন। তিনি চৈতন্যকে সমাজ-ধর্ম বিশ্বাসের একজন সত্যদ্রষ্টা ঋষি হিসেবে নতুন করে বিচার করেছিলেন, এবং বৈষ্ণব-ধর্মকে তখন যে সমস্ত দোষারোপ করা হত সেই দোষ স্খালন করেছিলেন। ভারতের ঐক্য সম্পর্কে একটি বক্তৃতায় তিনি আবেগের সঙ্গে প্রচার করেন যে সুইজারল্যাণ্ড, ইটালি এবং অন্যদেশের মত ভাষাগত বা অন্য পার্থক্য যা আছে তা ভারতের ঐক্যের প্রতিবন্ধক হবেনা। তাঁর মনে হয়েছিল যে ইংরিজীকে সমস্ত ভারতবর্ষের সাধারণ ভাষা হিসেবে চালু করে এবং শক্তিশালী দেশী সংবাদপত্র চালু করে ভারতবর্ষের ঐক্যের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছে। তিনি বলেছিলেন : "আসুন, আমরা আমাদের দেশের প্রগতির ধ্বজা

উচ্চে ওড়াই। আসুন, সেখানে আমরা ঐক্য এই কথাটি উজ্জ্বল সোনা দিয়ে লিখে রাখি…। আমাদের মধ্যে ধর্মীয় ব্যবধান থাকতে পারে, সামাজিক ব্যবধান থাকতে পারে—কিন্তু তা সত্ত্বেও আমাদের মধ্যে সাধারণ কতকগুলি ব্যাপারে মিলন হতে পারে—এই ব্যাপারগুলি হল দেশের মঙ্গল…। আমরা আমাদের ভগবানের কাছে উচ্চকণ্ঠে ভক্তি জানাতে পারি—যে ভগবান আমাদের দেশের ভাগ্য নিয়ন্তা। তাহলে আসুন, "সবার পরশে পবিত্র করা" এই দেশের নামে আমরা প্রত্যেক হিন্দু, মুসলমান, পার্সী, মহান ভারতীয় সমাজের সভ্য, আগেকার হিংসাদ্বেষ ভুলে যাই…আর আমাদের এই প্রিয় পিতৃভূমির মঙ্গলের জন্য বেঁচে থাকি, কাজ করি…। আসুন আমরা সুযোগ্য, সম্মানীয়, দেশপ্রেমপূর্ণ জীবনযাপ-. করি—যাতে ভারতবর্ষ মহান হয়।"[১৩] প্রচণ্ড হতবুদ্ধিকর বিভিন্ন জাত, ধর্ম, সংস্কৃতি ইত্যাদিকে একীভূত করে, ধর্ম নিরপেক্ষ ভারত; যেখানে ঐক্য এবং সাম্যের পথে ধর্ম বাধা হয়ে দাঁড়াবেনা সেই ভারতের রূপ কংগ্রেস যখন দেবার চেষ্টা করেছিল তার অনেক আগেই, আঠারশো খৃষ্টাব্দের সত্তর দশকে তাঁর মনে এসেছিল। তিনি যে "সাধারণ ভগবান" এর কথা উপরোক্ত একটি বক্তৃতায় বলেছিলেন, তা রবীন্দ্রনাথের "ভারত ভাগ্য বিধাতা" রূপে আমাদের জাতীয় সঙ্গীতে অমরত্ব লাভ করেছে।

১৩। স্পীচেজ—আর. সি. পালিত

# পঞ্চম অধ্যায়

## ভারতীয় ঐক্য

শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের ভেতরে যে চেতনার সঞ্চার হয়েছিল তাকে ঠিক পথে পরিচালনা করে যাতে কাজের কাজ হয় এমন একটা কিছু করার সময় তখন স্পষ্টভাবে এসে উপস্থিত হয়েছিল। সমস্ত বৃটিশ ভারতের অধিবাসীদের মঙ্গলের জন্য সম্ভবত প্রথম রাজনৈতিক সমিতি স্থাপিত হয়েছিল ১৮৪৩ সালে, বেঙ্গল বৃটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি নামে। পরে ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দের কোম্পানীর সনদ সংস্কারের প্রাক্কালে বৃটিশ ইণ্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশন স্থাপিত হয়। এই সমিতি ভারতবাসীদের দাবিদাওয়া নিয়ে একটা সাধারণ আবেদন করতে চান, জেগে-উঠেছে-এমন জাতির সম্ভবত এটাই প্রথম রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্খা। পঞ্চাশের দশকে সমিতি খুবই কর্মচঞ্চল ছিল। কিন্তু ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের পর অবস্থার অতি দ্রুত পরিবর্তন হয়, আর তখন নতুন ধরনের এবং নতুন কৌশলের রাজনৈতিক আন্দোলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত হল।

দি বৃটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন হল "মহান কৃষ্টদাস পাল যিনি এর সেক্রেটারী ছিলেন, তাঁর নেতৃত্বে জনসাধারণের স্বার্থে প্রয়োজন হলেই রক্ষা করবার জন্য সচেষ্ট হত; তবে প্রকৃতপক্ষে, কাজকর্মে ছিল এটি জমিদারদের সমিতি। সক্রিয়ভাবে রাজনৈতিক আন্দোলন বা সোজাসুজি জনসাধারণের কাছে আবেদন করে জনমত সৃষ্টি করা এর কর্মসূচীর অন্তর্ভূক্ত ছিল না। অতএব তখন আরও বেশী গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত একটি রাজনৈতিক সমিতির স্পষ্ট প্রয়োজন উপস্থিত হয়েছিল, এবং বৃটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের নেতারাও এই ব্যাপারটিকে স্বীকার করে নিয়েছিলেন।"

সুরেন্দ্রনাথ নিবিড়ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন যে সমিতির উৎপত্তির সঙ্গে, সেই ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন এ প্রসঙ্গে একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক শিশির কুমার ঘোষের ইণ্ডিয়ান লীগ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন সৃষ্টির কিছু পূর্বে গঠিত হয় এবং ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন মঞ্চের পুরোভাগে আসবার আগে পর্যন্ত প্রয়োজনীয় কাজকর্ম করে। সুরেন্দ্রনাথ ছিলেন "নতুন দেহের চঞ্চল প্রাণ।"[১৫] এই নূতন প্রচেষ্টায় আনন্দমোহন বসু এবং দ্বারকানাথ গাঙ্গুলি ছিলেন সুরেন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সহযোগী। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের ২৬শে জুলাই ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন স্থাপিত হয়। সরকারী চাকুরী থেকে বরখাস্ত হওয়ার জন্য সুরেন্দ্রনাথ নিজেকে পশ্চাদ্‌পটে রাখেন এবং কোনরকম কার্যভার গ্রহণ করেননা। এই সমিতির নামকরণটাই একটা অসাধারণ অর্থপূর্ণ। এটিকে একটা প্রাদেশিক ছাপ না মেরে এর কর্মকর্তাগণ এটিকে 'ভারতীয়' নামে অভিহিত করেন, যাতে এটি সর্ব ভারতীয় স্বার্থকে তুলে ধরতে এবং সর্বভারতীয় ঐক্যকে গড়ে তুলতে পারে। যে সময় বিভিন্ন প্রদেশে জনজীবন মোটামুটি সংকীর্ণ জ্ঞানের সীমাবদ্ধতায় ভরা ছিল তখন এটা ছিল একটা সাহসপূর্ণ পদক্ষেপ, আর সুরেন্দ্রনাথের জ্ঞান সমৃদ্ধ চিন্তাধারা নির্ভুলভাবে ছিল এর পেছনে। সুরেন্দ্রনাথ নিজেই তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছিলেন কেমন করে, মাৎসিনির দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে "সংযুক্ত ভারতের কল্পনা" বাংলাদেশের মনে সুদৃঢ়ভাবে স্থান করে নিয়েছিল। এই সমিতির উদ্বোধনের সময়ে সুরেন্দ্রনাথ প্রচণ্ড ব্যক্তিগত শোকের মধ্যেও উপস্থিত ছিলেন; সেদিন সকালেই তাঁর পুত্র বিয়োগ হয়েছিল। কিন্তু যেখানে জনসাধারণের ব্যাপার সেখানে ব্যক্তিগত দুঃখকে তিনি স্থান দিতেন না। আর এবারই তিনি যে প্রথম জনসাধারণের কর্মকে ব্যক্তিগত ব্যাপারের অনেক উঁচুতে রাখলেন তাও নয়—এরকম তিনি আরও করেছেন।

এখানে একটা ব্যাপার কৌতূহলের উদ্রেক করতে পারে সেটা হল, ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন স্থাপিত হবার কিছু আগে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র

১৫। হিস্টরি অফ দি কংগ্রেস, ১৮৮৫-১৯৩৫, ডঃ সীতারামাইয়া

বিদ্যাসাগর এবং জাস্টিস দ্বারকানাথ মিত্র—তখনও তিনি উকিল সভার সদস্য—এঁরা দুজন, মধ্যবিত্তদের মধ্যে কাজ করবার জন্য বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশন নামে একটি সভা গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। তখন কথাটায় খুব বেশী সমর্থন পাওয়া যায়নি তাই কল্পনাটার বাস্তব রূপ দেওয়া সম্ভব হয়না।

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন পরিচালনার ব্যাপারে সুরেন্দ্রনাথ কতকগুলি আদর্শ স্থির করে নিয়েছিলেন, সেগু'ল হল :— (১) তীব্র জনমত গঠন করা ; (২) ভারতের নানাজাতি ও লোকজনদের সাধারণ কতকগুলি রাজনৈতিক স্বার্থ এবং আশার ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ করা ; (৩) হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সম্প্রীতির জন্য চেষ্টা করা ; এবং (৪) জন আন্দোলনের মধ্যে জনসাধারণকে নিয়ে আসা।

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের জন্মের কিছু পরেই এটাকে বিরাট একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতার সামনে দাঁড়াতে হয়। তৎকালীন ভারত সচিব লর্ড সলস্‌বেরি তখন সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার উর্ধ্ব বয়স সীমা ২১ বছর থেকে কমিয়ে ১৯ করেছিলেন, ফলে ভারতীয়দের প্রতিযোগিতায় যোগ দেওয়ার যেটুকু সম্ভাবনা ছিল তাও নিশ্চিহ্ন হল। এই রকম স্বেচ্ছাচারমূলক কর্ম যা কিনা ভারতীয় আশা আকাঙ্খার উপরে বেশ মতলব করে আঘাত হানা হয়েছিল, তা এদেশে খুব ব্যাপক অসন্তোষ সৃষ্টি করেছিল। এই সভা এই কাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আহ্বান করে—এরকম করাটা অবশ্যই প্রত্যাশিত ছিল। ১৮৭৭ সালের ২৪শে মার্চ কলকাতার একটি জনসভায় সমস্ত ভারতবর্ষের কাছে আবেদন করা, এবং সিভিল সার্ভিসের ব্যাপারে বিভিন্ন প্রদেশকে একটি সাধারণ রাজনৈতিক কর্মপন্থায় মিলিত করার আহ্বান জানানো হয়—এরকম প্রচেষ্টা এর আগে আর হয়নি। দাবিগুলি ছিল এই : বয়সের সর্বোচ্চ সীমা বাড়ানো এবং ভারতবর্ষে এবং ইংল্যাণ্ডে একই সঙ্গে পরীক্ষা গ্রহণ। ঠিক এই দাবীগুলিই আট বছর পরে প্রথম ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস করে। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে তাই সিভিল সার্ভিস সংক্রান্ত প্রশ্নটি একটি প্রথম বড় অংশরূপে দেখা দিয়েছিল। তৎকালীন অন্যান্য

নেতাদের মত সুরেন্দ্রনাথও বিশ্বাস করতেন যে সিভিল সার্ভিস ব্যাপারটি উত্তরোত্তর স্বয়ং শাসনে যাবার পথের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

ইণ্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশন কর্তৃক আহূত কোলকাতার একটি সভায় সুরেন্দ্রনাথকে বিশেষ প্রতিনিধি হিসেবে উত্তর ভারতে ঘুরে ঘুরে সিভিল সার্ভিস সংক্রান্ত দাবিগুলি সম্পর্কে জনমত গঠনের উদ্দেশ্যে নিয়োগ করা হয় এবং একটি স্মারকলিপিতে তা বিধিবদ্ধ করা হয়। যখন যাতায়াত ব্যবস্থা মোটেই সহজ এবং ভ্রমণ আরামদায়ক ছিল না তখন দেশের বিভিন্ন স্থানে গিয়ে ব্যক্তিগতভাবে সংযোগ করে তাদের সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত করার কল্পনা সুরেন্দ্রনাথের এবং তাঁর সহযোগীদের মনে উদয় হয়। ব্রাহ্ম নেতা কেশবচন্দ্র সেন এর দশ বছর আগে উত্তর এবং দক্ষিণ ভারত পরিক্রমণ করে ভারতবর্ষের আত্মার ঐক্যের বাণী প্রচার করেন—এই উজ্জ্বল পূর্বতন নজীর অবশ্য ছিল, এবারে সুরেন্দ্রনাথের কাজ হল রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ধর্ম নিরপেক্ষ ঐক্যের বাণী প্রচার। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের মে মাসে নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় নামক সভার একজন বড় সদস্যকে সঙ্গে নিয়ে প্রচণ্ড গরমকে অগ্রাহ্য করে তিনি উত্তর ভারত এবং পাঞ্জাব ভ্রমণে যাত্রা করেন। ভারতের জাগ্রত জাতীয়তাবোধকে একজোট করানোর ব্যাপারে এটি খুব বিরাট সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল। তিনি বহু স্থান পরিভ্রমণ করেছিলেন তার মধ্যে ছিল লাহোর, অমৃতসর, কানপুর, আলিগড় এবং আগ্রা। তাঁর ভ্রমণের সময় ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের ভাবধারায় এর মধ্যে কয়েকটি স্থানে সভা গড়ে ওঠে। এর অনেকগুলি সিভিল সার্ভিস বিষয়ক কোলকাতার স্মারকলিপি গ্রহণ করে। সুরেন্দ্রনাথের ভ্রমণের ফলে একটা বিরাট জাগ্রতভাব সৃষ্টি হয়। পাঞ্জাবে তাঁর সঙ্গে সর্দার দয়াল সিং মাজীথিয়ার খুব হৃদ্যতা জন্মে এবং তিনি 'দি ট্রিবিউন' নামক বিখ্যাত সংবাদপত্র প্রকাশ সুরু করতে সাহায্য করেন। তিনি উত্তর ভারতের নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, যেমন পণ্ডিত অযোধ্যানাথ, পণ্ডিত বিশ্বম্ভরনাথ, বাবু হরিশ চন্দ্র, স্যার সৈয়দ আহমেদ এবং আরো অনেকে। তাঁর সঙ্গে স্যার সৈয়দ আহমেদের বন্ধুত্ব খুবই হৃদ্যতাপুর্ণ হয়—আলিগড়ে তিনি সিভিল সার্ভিস বিষয়ক সভার সভাপতি হন। পরে কংগ্রেসের সঙ্গে স্যার সৈয়দ আহমেদের

মত পার্থক্য হয়। এতদ সত্ত্বেও তাঁর আত্মজীবনীতে সুরেন্দ্রনাথ তাঁকে বেশ বড় সম্মান দেন এবং বলেন যে হিন্দু এবং মুসলমান সকলেরই এই সম্মানিত ব্যক্তির স্মৃতির প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা কর্তব্য। সুরেন্দ্রনাথের উত্তর ভারত ভ্রমণ বিরাট সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল। তিনি যেখানেই গিয়েছেন সেখানেই তিনি পরম সমাদরে অভ্যথিত হয়েছিলেন, আর তিনি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে লক্ষ্য করেছিলেন, একটা রাজনৈতিক চেতনা ক্রমশ গড়ে উঠছে আর একটা সিভিল সার্ভিস সম্পর্কের আবেদনে উষ্ণ সহানুভূতির সঙ্গে সাড়া দিচ্ছে। ভারতীয় ভাষার সংবাদপত্রগুলি এটিকে বেশ ফলাও করে প্রচার করেছিল, আর কোলকাতার স্মারকলিপি যা সমস্ত জায়গাতেই সমর্থন লাভ করেছিল, উর্দু ভাষায় অনুদিত হয়েছিল। সুরেন্দ্রনাথ সিভিল সার্ভিস ব্যাপারটি "জাতীয় সমস্যা" হিসেবে তুলে ধরেন এবং জাতীয় চেতনাকে এর চারিদিকে জমায়েত করতে চেষ্টা করেন। উত্তর ভারতে তিনি দেখেছিলেন "গভীর কিন্তু লুক্কায়িত রাজনৈতিক চেতনার অন্তঃপ্রবাহ" এটি ঠিক পথে পরিচালিত হবার জন্য অপেক্ষা করছিল। জন জীবনে তিনি মিলনের শক্তি এনে দিতে চেয়েছিলেন, যাতে বিশৃঙ্খল প্রদেশগুলি এক হয়, আর ভারতবর্ষে নতুন প্রাণ এসে দেখা দেয়। আলোক প্রাপ্ত মুসলমানেরা তাঁর সভায় দলে দলে যোগ দেন এবং তাঁর কর্মে সহানুভূতি দেখান।

উত্তর ভারত ভ্রমণে আশ্চর্য রকম সফল হওয়ায় তাঁর সহকর্মীগণ একই ধরনের উদ্দেশ্যে তাঁকে পশ্চিম ও দক্ষিণে পাঠাতে উৎসাহিত বোধ করেন। ( এই ভ্রমণের দুইটি তারিখ জানা যায়। যোগেশ চন্দ্র বাগলের লিপি অনুসারে তিনি ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের শীতকালে ভ্রমণ করেন।[১৬] কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ লেখেন ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের শীতকালে ভ্রমণ করার কথা। ) বোম্বাইতে তিনি চিন্তা জগতের নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন যেমন ভি. মাণ্ডলিক, কে. টি. টেলাঙ্গ এবং ফিরোজ শা মেটা। একটি জনসভায় সিভিল সার্ভিস বিষয়ক প্রতিজ্ঞা এবং স্মারকলিপির সার ভাগ গৃহীত হয়। সুরাট এবং আমেদাবাদ ভ্রমণের পর তিনি পুনাতে গিয়ে পৌছন, এখানে

১৬। হিস্টরি অফ দি ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন

তিনি রানাডের অতিথি হন। তিনি মাদ্রাজে ডক্টর ধনকাটু রাজু, চেন্তসাল রাও এবং হুমায়ুন জা বাহাদুরের সঙ্গে দেখা করেন, কিন্তু মাদ্রাজের তখনও রাজনৈতিক চেতনা হয়নি। এখানে অন্য সমস্ত স্থানের মত জনসভায় সিভিল সার্ভিস সংক্রান্ত প্রতিজ্ঞা গৃহীত হয়নি, হয়েছিল নেতাদের সভায়।

সম্ভবত সুরেন্দ্রনাথের সর্বভারত ভ্রমণ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য জ্ঞাতসারে প্রথম সর্বভারতীয় চেষ্টা—এবং সিভিল সার্ভিস প্রশ্নটি সেই সময়ে ঐক্যবদ্ধ হবার পক্ষে চমৎকার হয়েছিল। এই ভ্রমণগুলি খুবই সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল, সমস্ত জায়গাতেই তিনি বেশ জোর সাড়া পেয়েছিলেন ; তিনি দেখেছিলেন রাজনৈতিক চেতনা বাড়াবার সঙ্গে সঙ্গে তা ভাষা এবং প্রকাশ খুঁজে বেড়াচ্ছে। তিনি বলেন : "বৃটিশ শাসনে এই প্রথম ভারতবর্ষ তার এত প্রচুর জাতি এবং ধর্মকে নিয়ে সাধারণ যুক্ত প্রচেষ্টার জন্য একই মঞ্চে এসে দাঁড়িয়েছিল। এইভাবে তখন প্রমাণ হয়ে গিয়েছিল……যে আমাদের জাতি বা ভাষা হিসেবে বা সামাজিক এবং ধর্মীয় ব্যাপারে যত পার্থক্য থাকুক না কেন, ভারতবর্ষের লোক সবাই মিলে এক হয়ে তাদের সাধারণ রাজনৈতিক লক্ষ্যে পৌঁছুতে পারে।…এইভাবে বিরাট জাতীয় আন্দোলনের এবং ঐক্যের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছিল ( কংগ্রেসী আন্দোলন )।"[১৭] সার হেনরি কটন মন্তব্য করেছিলেন যে "সুরেন্দ্রনাথের নাম আজ ঢাকা বা মূলতানের তরুণদের মধ্যে একই রকমভাবে উৎসাহ ও উদ্দীপনা এনে দেয়।"[১৮] কথাটা ঠিকই বলা হয় যে পরে যে কংগ্রেস সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছিল তার বীজ সুরেন্দ্রনাথ এই ভ্রমণের সময় বপন করেছিলেন। এই আন্দোলন "পরের স্বরাজ আন্দোলনের সুরু বলে ধরা যেতে পারে।"[১৯] এরপর প্রাদেশিক নেতাদের মধ্যে ক্রমাগত বেশি ভাবের আদান প্রদান থেকে সাধারণ বন্ধুভাব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এর প্রমাণ

---

১৭। এ নেশন ইন মেকিং

১৮। নিউ ইণ্ডিয়া

১৯। রেনাসেন্ট ইণ্ডিয়া—জ্যাকেরিয়াস্

স্বরূপ বলা যায় পুনা সার্বজনিক সভার নেতারা ১৮৭৮ সালে পাল্টা ভ্রমণে আসেন। সর্দার দয়াল সিং মাজীথিয়াও সেই রকম আসেন।

ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের পরবর্তী পদক্ষেপ হিসেবে লালমোহন ঘোষ নামক একজন কোলকাতার ব্যারিষ্টারকে সর্বভারতীয় সিভিল সার্ভিস স্মারকলিপি নিয়ে পার্লামেণ্টে পেশ করবার জন্য নিয়োগ করেছিল। প্রথমে সুরেন্দ্রনাথকেই মনোনীত করা হয়েছিল কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ ইচ্ছে করেই লালমোহনকে পথ ছেড়ে দিয়েছিলেন এই কারণে যে তিনি ভেবেছিলেন তাঁর দুঃখজনক সিভিল সার্ভিস ঘটনা হয়ত উদ্দেশ্যকে খারাপ ভাবে প্রভাবান্বিত করতে পারে। সুরেন্দ্রনাথ লালমোহনকে বিদেশে পাঠানোর জন্য চাঁদা তোলার কাজে খুব বড় অংশ গ্রহণ করলেন। লাল-মোহনের আশ্চর্য বক্তৃতা ইংল্যাণ্ডের জনমতকে স্পন্দিত করল। জন ব্রাইটের সভাপতিত্বে তিনি একটি শক্তিশালী এবং নিপুণ বক্তৃতা করেন। যা আশা করা গিয়েছিল এতে সেই ফল হল। সাত বছর ধরে যা হয়নি, সেই ষ্ট্যাটুটরি সিভিল সার্ভিস-এর নিয়মগুলি অবশেষে হাউস অব কমন্সে আইন করবার জন্য পাঠানো হল। যদিও এই ষ্ট্যাটুটরি সিভিল সার্ভিস ভারতীয় আশানুরূপ হল না, তা সত্ত্বেও অনেকখানিই পাওয়া গেল। যাই হোক না কেন, সরকারকে তো নড়ানো সম্ভব হয়েছে। এই অভিজ্ঞতার ফলে এ যাবৎ যা অচিন্তনীয় ছিল সেই ইংল্যাণ্ডে গিয়ে ভারতের পক্ষে আন্দোলন করার দরজা খুলে গেল। এর দরুণ নিয়মতান্ত্রিক ভাবে আন্দোলনের ফলেও যে সুফল পাওয়া যায় তা বোঝা গেল এবং ভবিষ্যতেও পাওয়া যাবে বলে আশার সঞ্চার হল। এটা মনে রাখতে হবে যে ইংল্যাণ্ডে সিভিল সার্ভিস প্রশ্নটি নিয়ে একটি দলকে পাঠাবার কল্পনা সুরেন্দ্রনাথের হয়েছিল তাঁর সর্বভারতীয় ভ্রমণের সময়ে এবং তিনি ব্যাপারটায় ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনকে প্রভাবান্বিত করেছিলেন। ইতিমধ্যেই ভারতবর্ষ থেকে ইংল্যাণ্ডে দুজন বেসরকারী সংস্কৃতি-দূত, রামমোহন রায় এবং কেশব চন্দ্র সেন—বিভিন্ন উদ্দেশ্যে গিয়েছিলেন এবং বৃটিশ জনসাধারণের মনে ভারত সম্পর্কে উচ্চ ধারণা করাতে সমর্থ হয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে দাদাভাই

নওরোজি বৃটিশ জনসাধারণের কাছে ভারতবর্ষের সত্যিকারের অবস্থা জানিয়ে বৃটেনের বুদ্ধিমানদের ভারতবর্ষ সম্পর্কে আগ্রহী করছিলেন এবং ইংল্যাণ্ডের মাটিতে দাঁড়িয়ে ভারতবর্ষের হয়ে সংগ্রাম করছিলেন, তা একান্তভাবে স্মরণীয়। দাদাভাই এর মত সুরেন্দ্রনাথও বিশ্বাস করতেন যে যদি ভারতবর্ষ সম্পর্কে বৃটিশ অজ্ঞানতা দূর করা সম্ভব হয় এবং ভুল বোঝাবুঝির মাকড়সা-জাল পরিষ্কার করা যায় তাহলে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক লাভ হবেই।

# ষষ্ঠ অধ্যায়

## ক্রমবর্ধমান বিক্ষোভ

ইংল্যাণ্ডের রক্ষণশীল সরকার ভারতবর্ষে লর্ড লিটনকে (১৮৭৬-৮০) পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু নানা বিষয়ে অত্যন্ত অসাধারণ হওয়া সত্ত্বেও তিনি একজন অপ্রিয় বড়লাট হিসেবে পরিচিত হন এবং তাঁর কার্যকাল নানারকম প্রতিক্রিয়াশীলতায় ভরা থাকে। জ্যাকেরিয়াস্ এর কথায়, লর্ড সলস্‌বেরি যে দুজন বড়লাট ভারতে পাঠিয়েছিলেন তা "দুঃখজনকভাবে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ"[২০] কারণ তাঁরা ভারতবর্ষ এবং ইংল্যাণ্ড উভয়েরই ক্ষতি করেছিলেন —এঁরা হলেন লর্ড লিটন এবং লর্ড কার্জন। অত্যন্ত অবিবেচকের মত আফগানিস্তানে যুদ্ধ চালনার জন্য ইতিহাসের পাতায় চিরকালের মত কুখ্যাত হয়ে রইলেন লর্ড লিটন ; দেশী সংবাদপত্র আইন এবং অস্ত্র আইনের জন্য তিনি যথাযথভাবে নিন্দিত হন। তবে একদিক দিয়ে দেখতে গেলে লর্ড লিটনের কুশাসন আসলে হয়েছিল শাপে বর। কারণ এর ফলে লোকের অসন্তুষ্টির উত্তাপ প্রচণ্ড হয়েছিল এবং সবে তখন সর্বত্র জাতীয়তাবাদ দানা বাঁধছে এমনি সময়ে জাতায়তাবাদের চেতনাকে আরো তীক্ষ্ণ করে তুলল। সুরেন্দ্রনাথ এভাবে ব্যাপারটিকে বলেছেন, "রাজনৈতিক প্রগতির বিবর্তনে কুশাসকেরা অনেক সময়েই ছদ্মবেশী আশীর্বাদ হিসেবে দেখা দেয়...। লর্ড লিটন যদিও তা চাননি তবুও তিনি উপকারই করেছিলেন, এবং আরো সাম্প্রতিক কালে লর্ড কার্জন সেই ভাবেই কিম্বা আরো ব্যাপকভাবে আমাদের উপকার করেছেন।[২১]

---

২০। রেনাসেণ্ট ইণ্ডিয়া

২১। এ নেশন ইন মেকিং

লর্ড লিটনের সবচেয়ে অজনপ্রিয় কাজ হয়েছিল ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে রাণী ভিক্টোরিয়ার ভারতের মহারাণী হিসাবে আনুষ্ঠানিক ঘোষণার ব্যাপারে দিল্লীর মহা দরবার। বহু খরচ করে এই ধূমধাম হচ্ছিল যখন তখন দেশের একটি বড় অংশ দারুণ দুর্ভিক্ষের কবলে। একটা নতুন ব্যাপার এতে ছিল, তা হল এই দরবারে সংবাদ পত্রের প্রতিনিধিদের আমন্ত্রণ করা হয়েছিল। পূর্বে, ১৮৭৪-৭৫ এ সুরেন্দ্রনাথ হিন্দু প্যাট্রিয়ট কাগজের লণ্ডনস্থ সংবাদদাতা হিসেবে কাজ করেছেন—সে সময়ে ঐটি ছিল সবচেয়ে প্রভাবশালী কাগজের অন্যতম। ঐ কাগজের প্রতিনিধি হয়ে তিনি দিল্লীর দরবারে উপস্থিত ছিলেন, ঐ সময়ে সুরেন্দ্রনাথ ভারতীয় সংবাদপত্রগুলির প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি সংবাদপত্র সমিতি গঠন করেন এবং এই সমিতির প্রতিনিধি হয়ে ভাইসরয় লর্ড লিটনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তাঁর প্রতি একটি আবেদনে তিনি সংবাদপত্রের উপর নানারকম বিধিনিষেধ বলবৎ করা হচ্ছে তা জানালেন এবং অনুরোধ করলেন, সংবাদপত্রগুলি যে সমস্ত স্বাধীনতা ভোগ করে আসছে সেগুলি যেন প্রত্যাহার না করা হয়। কিন্তু ভাইসরয়ের প্রতি এই আবেদনে কোন ফল হয়নি, কিন্তু অন্য দিক থেকে এর ফ'ল লাভই হয়েছিল। ভারতের সংগ্রামের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ভারতীয় সংবাদপত্রগুলির সংহতির প্রমাণ সন্দেহাতীতভাবে প্রদর্শিত হল। দ্বিতীয়তঃ ঐ দরবারের জন্য যতই অর্থের অপব্যয় হোক না কেন, তা যতই কুৎসিৎ হোক না কেন, তার ফলে সমগ্র ভারতবর্ষের বড় বড় লোক একতাবদ্ধ হতে পেরেছিলেন। এর ফলে নিয়মতান্ত্রিক সম্মিলিত আন্দোলনের একটি ক্ষেত্র প্রস্তুত করার কথা মনে হয়। সেই হিসেবে, ভারতীয় জাতীয়তা এবং সাধারণ সংগ্রামের ধারণার বিবর্তনের পক্ষে এটা একটা প্রধান পদক্ষেপ। "সংযুক্ত ভারতের কল্পনা দরবারেরই একটা অচেতনতা প্রসূত উপজাত হিসেবে উপস্থিত হয়।"[২২] তবে সম্ভবত এর সমস্তটাই অচেতনতা প্রসূত নয়। ডক্টর সীতারামাইয়ার বিশ্বাস যা তিনি লিখেছেন তা হল, বিরাট একটা রাজনৈতিক সম্মেলন করবার কথা সুরেন্দ্রনাথের মনে এসেছিল দিল্লীর

২২। রাইজ অ্যাণ্ড গ্রোথ্ অফ ইণ্ডিয়ান লিবারেলিজম—এম. এ. বাক্

দরবারের রাজা, মহারাজা এবং লোকজনদের দেখে।[২৩]

অস্ত্র আইন এবং দেশীয় ছাপাখানা আইন প্রচণ্ডভাবে জন আন্দোলন সৃষ্টি করে—আর এতে সুরেন্দ্রনাথ একটা বড় অংশ গ্রহণ করেন। অস্ত্র আইন যে কেবল অপ্রয়োজনীয় ছিল তা নয় এটার অন্য একটা কুফল হয়েছিল, এই যে এর ফলে ভারতীয়দের হীনজাতীয় বলে মনে করা হয়েছিল এবং ভারতীয় এবং ইউরোপীয়দের মধ্যে অসন্তোষ উদ্রেককারী পার্থক্য ধরে নেওয়া হয়েছিল। সবচেয়ে খারাপ ব্যাপার, ভারতীয়দের নপুংসক করে তোলাই ছিল এর উদ্দেশ্যে। এই আইনের উদ্দেশ্যমূলক অবিশ্বাস সম্পর্কে বিপিন চন্দ্র পাল বলেছিলেন : "একজন হটেনটট্ বা জুলু কোলকাতার বা বোম্বাইয়ের রাস্তায় অস্ত্র নিয়ে চলাফেরা করতে পারে কিন্তু দেশের ভারতীয়রা বৃটিশ সরকারের প্রজা হয়ে তা করতে পারে না।[২৪]

সেইরকম দেশীয় সংবাদপত্র আইনও ঐ একই সময়ে ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের প্রথম দিকে ইম্পিরিয়াল লেজিস্‌লেটিভ কাউন্‌সিলে গৃহীত হয়, ঐ আইনেরও অবিশ্বাস থেকে জন্ম এবং ঘৃণার সঙ্গে তার প্রয়োগ হয়েছিল। মাদ্রাজ ছাড়া ভারতের সর্বত্র সংবাদপত্রগুলির কণ্ঠরোধ করে দেওয়া হয়েছিল। শাসকেরা এই আইনের সাহায্যে সংবাদ পত্রের কণ্ঠরোধ করবার বিরাট স্বেচ্ছাচারমূলক ক্ষমতা পেয়েছিল। এটা একটা কঠোর আইন ছিল। এটার ফলে অবশ্য বোঝা গিয়েছিল দেশীয় সংবাদপত্রে, বিশেষত বাংলাদেশে শাসন সম্পর্কে ক্রমবর্ধমান সমালোচনা তাঁরা সহ্য করতে পারছিলেন না, ভয় পাচ্ছিলেন। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে প্রায় ৪৭৫টি সংবাদপত্র ছিল, এর অধিকাংশই দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত হত। সুখের কথা এই যে দেশের লোক এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা বিনা প্রতিবাদে মেনে নেয়নি। যে আন্দোলন এর পর সুরু হল তা বিরাট। ইণ্ডিয়ান অ্যাসো-

২৩। দি হিস্টরি অফ দি কংগ্রেস

২৪। মেময়ার্স অফ মাই লাইফ অ্যাণ্ড টাইম, ১৮৫৭-১৮৮৪

সিয়েশনের তত্ত্বাবধানে কোলকাতার একটি বিরাট জন সভায় দেশীয় সংবাদপত্র আইনের বিরুদ্ধে প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই সভা পার্লামেন্টে একটি স্মারকলিপি পাঠানোর সিদ্ধান্ত করে। এই সভার আয়োজন কারীদের পক্ষ থেকে সভা আহ্বানের পূর্বে সমস্ত দেশব্যাপী নেতাদের এবং রাজনৈতিক সমিতি সমূহের মতামত জানতে চাওয়া হয়। তৎকালীন বিরোধী দলের নেতা মিঃ গ্ল্যাডষ্টোন ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে হাউস অব কমন্সে স্মারকলিপিটি এবং তিনি ঐ আইন সম্পর্কে একটি প্রস্তাব পেশ করেন। বিরোধী দল থেকে প্রতিক্রিয়াশীল আইনটির বিরুদ্ধে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করা হয়। যদিও প্রস্তাবটি গৃহীত হয় না তবু এর ফলে বৃটেনের জনসাধারণের পক্ষে ভারতবর্ষে প্রতিক্রিয়াশীল শাসন সম্পর্কে পরিচিত হওয়ার সুযোগ হল। পরে যে দেশীয় সংবাদপত্র সংক্রান্ত আইনটিকে বাতিল করা হয় প্রকৃতপক্ষে এটি সেই পথকেই সহজতর করল। আসলে এই পরাজয়ের ফলে জয়ই হয়েছিল—সে বিজয় কেবল ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষেই যে হয়েছিল তা নয়, ব্যক্তিগতভাবে সুরেন্দ্রনাথও তার অধিকারী হয়েছিলেন।

১৮৮০ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ পার্লামেণ্ট ভেঙ্গে দেবার পর যে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল তাতে ভারতবর্ষের প্রশ্নটি বেশ বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন লালমোহন ঘোষকে ইংল্যাণ্ডে গিয়ে বৃটেনের ভোটদাতাদের ভারতবর্ষের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করতে পাঠান। নির্বাচন যুদ্ধে যেখানে গ্ল্যাডষ্টোন এবং ব্রাইটের মত লোক অংশ গ্রহণ করেছিলেন ভারতবর্ষ সেখানে একটা বড় বিতর্কের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল, আর রক্ষণশীলদের পরাজয়ের কারণ হিসেবে ভারতবর্ষ সম্পর্কে তাদের অন্যায় সর্দারি বেশ বড়ই ছিল। উদারপন্থী প্রধানমন্ত্রী গ্ল্যাডষ্টোন ভারতবর্ষে লর্ড রিপনকে ( ১৮৮০-১৮৮৪ ) ভাইসরয় করে পাঠান, তাতে ভারতবর্ষের লোকেরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। ইংল্যাণ্ডে উদারপন্থীদের জয়ের সঙ্গে লর্ড রিপনের কতকগুলি ভাল ব্যবস্থা নেওয়ার ফলে যা তখনও

একেবারে অদৃশ্য হয়নি এমন বৃটিশ সুবিচারের এবং নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রতি ভারতীয়দের আস্থা বাড়ল। অতি অল্প সময়ের জন্য হলেও একটা সম্ভাবনাপূর্ণ যুগ সুরু হল বলে মনে হল আর ভারতবর্ষে উদার-নৈতিকবাদকে সাহায্য করা হল। রমেশ চন্দ্র দত্ত দেখাতে চেয়েছেন যে "… …ইংল্যাণ্ডে এবং ভারতে প্রগতির ইতিহাস দুই সমান্তরালে স্রোত বয়ে চলেছিল।"[২৫]

লর্ড রিপন প্রথমে যা করলেন তা হল ভারতবর্ষের গা থেকে সংবাদ পত্র আইনের কাঁটাটি তুলে নিলেন। ব্যাপকভাবে এটি প্রশংসিত হল। ভারতবাসীদের মতামত প্রকাশের স্বাধীনতার অধিকারের উপর লর্ড লিটনের অযথা সর্দারি এভাবে দূর হল এবং ভারতবাসীদের ক্ষিপ্ত মনোভাব কিছুটা শান্ত হল। লর্ড রিপন এমন কথা বলেছেন বলেও প্রমাণ পাওয়া যায় যে "ভারতবর্ষে আমলারা খবরের কাগজকে অন্যায় মনে করে, হয়ত এর প্রয়োজন আছে তবে এর সীমা যত ছোট রাখা যায় ততই ভাল।"[২৬] এর পরই এল সেই স্বায়ত্ত শাসন সম্পর্কে বিখ্যাত প্রতিজ্ঞাটি—সুরেন্দ্রনাথের অতি প্রিয় আর একটি আন্দোলনের বিষয়। দাদাভাইয়ের মত সুরেন্দ্রনাথও বিশ্বাস করতেন যে স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন থেকে জাতীয় স্বায়ত্ত শাসন একটি পদক্ষেপ মাত্র। এই ব্যাপারে সুরেন্দ্রনাথ বাংলাদেশের মিউনিসিপ্যালিটি গুলোকে যাতে নির্বাচনের মাধ্যমে নতুন ভাবে গড়ে তোলা যায় সেজন্য গ্রামাঞ্চলে ঘুরে ঘুরে জনমত সংগ্রহ করবার ভার নিয়েছিলেন। মোটামুটি জনসাধারণের বড় অংশের মত সংগ্রহ করে তিনি এবং তাঁর সহকর্মীগণ একটি জনসভা ডাকেন যেখানে তিনি স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন সম্পর্কে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে একথাও বলেন যে নির্বাচনের সাহায্যেই স্থানীয় শাসন-সভা এবং তার চেয়ারম্যান স্থিরীকৃত হওয়া উচিত। পরে ভারত সরকারের সম্পর্কে সভায় যে সিদ্ধান্ত

২৫। ইণ্ডিয়া অ্যাণ্ড ইংল্যাণ্ড
২৬। বৃটিশ রুল ইন ইণ্ডিয়া অ্যাণ্ড আফটার—ভি. ডি. মহাজন

নেওয়া হয় এটা তারই মূলনীতি হিসেবে গৃহীত হয়।

ব্যাপারটি গুরুত্বপূর্ণ তাই স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনই যথেষ্ট ছিল না। বাংলার নেতাগণ ইতিমধ্যেই প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার গঠনের কথা ভাবছেন। পশ্চিম ভারতে দাদাভাই নওরোজির মত লোক আর পূর্ব ভারতে ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের নেতাগণ কর্তৃক সুরু করা আন্দোলন আরো বিস্তার লাভ করছে। একটা অদ্ভুত এবং অভূতপূর্ব জাগরণ স্পন্দিত হয়ে উঠছে, সে কেবল বাংলাদেশে নয়, সমস্ত ভারতবর্ষে। লর্ড রিপন ছিলেন সত্যিকারের উদারচেতা, ইনি দৃঢ়ভাবে নিজের বিশ্বাস মত কাজ করতেন, এবং তিনি সত্যিসত্যিই শান্তি এবং স্বায়ত্ত শাসন চাইতেন। ভারতের আশা ভরসা সম্পর্কে তাঁর ছিল সমবেদনা, তিনি চেয়েছিলেন ভারতীয়রা গণতন্ত্র সম্পর্কে প্রথম শিক্ষা গ্রহণ করুক। ভারতবর্ষে বৃটিশ রাজত্বের ইতিহাসে অন্যতম স্মরণীয় হল তাঁর রাজত্বকাল।

এরপর ভারতীয় জাতীয় প্রগতিতে যে ঘটনায় বেগ সঞ্চারিত হল তা হল ইলবার্ট বিল নিয়ে ভারতে ইউরোপীয়দের কুৎসিৎ এবং হৈ চৈ পূর্ণ আন্দোলন, এটি লর্ড রিপনের আর একটি ভাল ব্যবস্থা, কেন না তিনি এই বিলের সাহায্যে বিচারকার্যে জাতি পক্ষপাতিত্ব দূর করতে চেয়েছিলেন। তৎকালীন প্রচলিত নিয়ম অনুসারে ভারতীয় সিভিলিয়ানরা প্রেসিডেন্সী টাউন ছাড়া আর কোথাও অপরাধে অভিযুক্ত ইউরোপীয়দের বিচার করতে পারতেন না—এই মানহানিকর বিষয়টি নিয়ে প্রথম সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন সুরেন্দ্রনাথের বন্ধু এবং কোলকাতার তৎকালীন চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট, বিহারী লাল গুপ্ত। লর্ড রিপনের বিরুদ্ধে ইউরোপীয় এবং ইঙ্গ ভারতীয়গণ শাসন ব্যবস্থা থেকে ন্যায় বিচারের কলঙ্ক মোচন করবার বিরুদ্ধে একজোট হয়ে দাঁড়ালেন। কোলকাতায় তাঁরা একটি বড় সভা করলেন, দেশের নানা স্থানে নানা শাখা সমেত একটা আত্মরক্ষা সমিতি তাঁরা গঠন করলেন, আত্মরক্ষা করবার জন্য দেড় লাখ টাকার একটা তহবিলও খোলা হল। খোলাখুলিভাবে লর্ড রিপনকে অপমান এবং

গালাগালি করা হল, এমনকি তাঁকে ফেরৎ পাঠানোরও ষড়যন্ত্র চলতে লাগল। ইংলিশম্যান কাগজে একজন সংবাদদাতা লিখলেন, "ভারতে যদি কারুর কোনো অধিকার থেকে থাকে তাহলে তা বৃটিশের। তথাকথিত ভারতীয়দের এখানে কোনো রকম অধিকারই নাই।"[২৭] ইউরোপীয় এবং ইঙ্গ-ভারতীয় আন্দোলন ভারতীয়দের চোখে লর্ড রিপনকে ছোট করতে পারল না, আসলে তাদের বেপরোয়া কাণ্ড কারখানার ফলে তিনি আরো শ্রদ্ধেয় হয়ে পড়লেন। ভারতীয়রা প্রায় তাঁকে দেবতা বানিয়ে ফেলল। এই সঙ্গে ইলবার্ট বিল আন্দোলনের ফলে ভারতীয় আন্দোলন বিরাটভাবে প্রভাবান্বিত হল। ভারতীয়দের জাতীয় গর্ব এবং সম্মানের পক্ষে এটা ছিল অপমানকর। "কোনো শিক্ষিত ভারতীয়ই ইলবার্ট বিলের শিক্ষা ভুলে যায় নি।"[২৮] এরফলে ভারতীয়দের ঐক্য সংঘবদ্ধ করায় সাহায্য হয় এবং তারা ইউরোপীয় এবং ইঙ্গ-ভারতীয়দের সম্মিলিত বিরোধ দেখে তার শক্তি এবং কার্যকারিতা বুঝতে পারে। পশ্চিম ভারতে দাদাভাই নওরোজি ইলবার্ট বিলের সমর্থনে একটি সভা করেন। কোলকাতায় ইউরোপীয়রা যে সভা করেন তার বিরোধিতা করে বোম্বাইতে আরো একটা সভা হয়।

রাজনৈতিক কারণে তহবিল সৃষ্টি করার ফলেও ভারতীয়দের উপর প্রভাব পড়ে। ভারতবর্ষে এবং ইংল্যাণ্ডে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের জন্য জাতীয় তহবিল খুলতে এটি সাহস যোগায়। এটা বলা অনাবশ্যক যে এই কাজে সুরেন্দ্রনাথ একটি প্রধান ভূমিকা নেবেন। জ্যাকেরিয়াস্ বলেন, "এই ইলবার্ট বিল একটা চূড়ান্ত আইন ছিল, এরই ফলে জাতীয় বরফের ধ্বস্ নামে এবং ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে সুরেন্দ্রনাথ জাতীয় তহবিল সৃষ্টির জন্য একটি সর্ব ভারতীয় প্রতি আন্দোলন সুরু করেন।"[২৯]

২৭। বৃটিশ রুল ইন ইণ্ডিয়া অ্যাণ্ড আফটার— ভি. ডি. মহাজন
২৮। রাইজ অ্যাণ্ড ফুলফিলমেণ্ট অফ বৃটিশ রুল ইন ইণ্ডিয়া—টম্পসন অ্যাণ্ড গ্যারাট
২৯। রেনাসেণ্ট ইণ্ডিয়া

## সপ্তম অধ্যায়

## কলম হাতে দেশপ্রেমী

সুরেন্দ্রনাথের বহুমুখী প্রতিভার প্রমাণ পাওয়া যায় এই থেকে যে তিনি ছিলেন একাধারে শিক্ষক, রাজনৈতিক নেতা এবং সাংবাদিক। মূলতঃ তিনি একজন শিক্ষক এবং সংস্কারক তাই তিনি জনমতকে তাঁর নিজের মত করতে চেয়েছিলেন। এটা তিনি তাঁর ক্ষমতার অন্তর্গত বিভিন্ন মাধ্যমের সাহায্যে করতে চেয়েছিলেন— তাঁর ক্লাসরুম, জনসভার মঞ্চ এবং তাঁর শক্তিশালী কলম।

জনমতের অগ্রগতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ভারতবর্ষে সাংবাদিকতা গড়ে ওঠে, ফলে এটা স্বাধীনতা আন্দোলনের একটা অঙ্গ হয়ে দাঁড়ায়। যতই জনমত সোচ্চার হয়ে উঠতে লাগল ততই তা প্রকাশের মাধ্যম খুঁজতে লাগল। ভারতবর্ষে সংবাদপত্রের জন্মক্ষণ থেকে, শাসকদের সঙ্গে সংবাদ-পত্রের ঘন ঘন যুদ্ধ চলতে থাকে, কখনো সে যুদ্ধ তীব্র হয়ে ওঠে। সংবাদপত্রকে সময়ে সময়ে নানারকম বিধিনিষেধের ভেতর দিয়ে সংগ্রাম করে এগুতে হয়েছিল। এর সুরু হয়েছিল ওয়ারেন হেস্টিংসের আমল থেকে, এঁর সঙ্গে ক্যালকাটা গেজেট এর প্রতিষ্ঠাতা হিকী-র বিবাদ বিখ্যাত হয়ে আছে। প্রথম দিকে সরকারী ক্রোধের ঝাপটা এসে লেগেছিল ইংরেজ মালিকদের সংবাদপত্রের উপর। কিন্তু পরে এই ঈর্ষাহীন সম্মানের অধিকারী হন ভারতীয় মালিকানার সংবাদপত্রগুলি। এঁরা দেশের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নিজেদের শক্তিশালী ও প্রতিষ্ঠিত করেন।

সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে সুরেন্দ্রনাথ প্রথমে প্রবেশ করলেন 'বেঙ্গলী' সংবাদপত্র এবং ছাপাখানা কিনে নেবার পর। যেহেতু ইণ্ডিয়ান অ্যাসো-সিয়েশনের পক্ষে এ কাগজ ক্ষতি দিয়ে চালানো সম্ভব হল না সেই কারণে

সুরেন্দ্রনাথ ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী এই কাগজের মালিক থেকে সম্পাদক হয়ে বসলেন। তাঁর কোন ব্যবসা করার মতলব ছিল না, এই কাগজটি নিজের হাতে নেওয়ার মূলে ছিল তিনি যে আদর্শকে নিজের বলে গ্রহণ করেছিলেন সেই আদর্শকে প্রচার করা। এক ইণ্ডিয়ান মিরর নামক একটি সাপ্তাহিক কাগজ ছাড়া এটি অন্যান্য সংবাদপত্রের মতই প্রতি শনিবারে প্রকাশিত হত। দৈনিক সংবাদপত্র প্রকাশ মোটামুটি আধুনিক ব্যাপার বলা চলে। যে সংবাদ ক্ষুধা কেবলমাত্র দৈনিক কাগজেই মেটে সেরকম কাগজ তখনো বার হয়নি। সুরেন্দ্রনাথ একজন শিক্ষিত এবং সংস্কৃতি সম্পন্ন প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে এই বিষয়ে একটি চিত্তাকর্ষক আলোচনার বিবরণ দিয়েছেন। এই প্রধান শিক্ষক তাঁকে বলেছিলেন তাঁর সাপ্তাহিক 'বেঙ্গলী' পড়তেই এক সপ্তাহ লেগে যায়, দৈনিক কাগজ বেরুলে তিনি কি করবেন তা ভেবে পান না।

বেঙ্গলীর আবির্ভাব একটি বিরাট ঘটনা। এর মাধ্যমে সুরেন্দ্রনাথ স্বাধীন সাংবাদিকতার একটি নতুন ধারার সৃষ্টি করেন। ১৯০০ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি তাঁর কাগজটিকে দৈনিকে রূপান্তরিত করেন এবং ১৯২১ সালে তাঁর মন্ত্রী হবার আগে পর্যন্ত এই কাগজটি বেশ তেজের সঙ্গে চলে, তারপর তিনি সম্পাদক পদ থেকে ইস্তফা দেন। বেঙ্গলী একটা ব্যাপারে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ছিল—এই পত্রিকাটি দৈনিক হবার পর এটিই প্রথম রয়টারের কাছ থেকে সংবাদ কিনতে সুরু করে। কাগজটি জাতীয়তার পরিপ্রেক্ষিতে চালানো হয় এবং জনসাধারণের স্বাধীনতার উপর সরকারী হামলার বিরুদ্ধে বিরামহীন সংগ্রাম করে। ডক্টর সচ্চিদানন্দ সিংহ বলেন : "একজন সাংবাদিক হিসাবে সুরেন্দ্রনাথ বেঙ্গলী কাগজকে চল্লিশ বছরেরও বেশী সময় ধরে সম্পাদনা করেন—এই সময়ের মধ্যে ভারতীয় রাজনীতিতে বিভিন্নমুখী নানা দল মিলে একটি আঁটসাট জাতীয় দলে পরিণত হয়। সম্পাদক হিসেবে তিনি তাঁর বৃত্তি, পদ এবং সম্মানকে অনেক উঁচুতে তুলে ধরেন। তাঁর বিরুদ্ধ মতাবলম্বীদের প্রতি তাঁর আচরণ ছিল প্রচণ্ডভাবে নিরপেক্ষ, আর তিনি কখনো ক্ষুদ্র প্রাদেশিকতা নিয়ে মেতে উঠতেন

না।"[৩০] বেঙ্গলীর পরবর্তী ভূমিকা সম্পর্কে মার্গারিটা বার্নস বলেন : "বেঙ্গলীর কলমে ভারতীয় মতামত ভাষা পেয়েছিল, এটি সম্পাদনা করেন প্রতিভাবান সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, যাঁকে অন্য অনেক কীর্তির মধ্যে বঙ্গভঙ্গ বিরোধিতার জন্য স্মরণ করা হয়।"[৩১] বাস্তবিক, বেঙ্গলী ভারতের জাতীয় মতামত প্রকাশের যন্ত্র হয়ে পড়েছিল বলা যায়।

সাংবাদিক হিসেবে সুরেন্দ্রনাথের জীবনের অন্যতম স্মরণীয় ঘটনা, যেটা প্রসঙ্গত বলা যায় ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক চেতনার উপর প্রচণ্ডপ্রভাব বিস্তার করেছিল, সেটা হল ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে তাঁর বিরুদ্ধে আনা কুখ্যাত মানহানির মামলা এবং তাঁর পরবর্তী কারাবাস। ব্যাপারটা হয়েছিল এই যে কোনো একটি মামলায় কলকাতা হাইকোর্টের বিচারক নরিস কোন একটা হিন্দু দেবমূর্তি শালগ্রাম শিলা আদালতে উপস্থিত করতে বলেন, যার ফলে একটা রায় জারি করবার সুবিধে হবার কথা। বিচারকের পক্ষে এরকম একটা আদেশের আগেকার কোনো নজীর ছিল না, কেননা একটা দেবমূর্তি এতই পবিত্র যে তাকে আদালতে এনে প্রদর্শন করবার প্রশ্নই ওঠে না। এই ঘটনাটি 'ব্রাহ্ম পাব্লিক ওপিনিয়ন' নামক একটি কাগজে প্রকাশিত হয় এবং ২রা এপ্রিল ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে বেঙ্গলীতে একটি ছোট সম্পাদকীয়তে প্রচণ্ড সমালোচনা করা হয়। এই সম্পাদকীয়তে মিঃ নরিস সম্বন্ধে বলা হয় যে তিনি দেশের সর্বোচ্চ আদালতের বিচারক হবার অযোগ্য। সঙ্গে সঙ্গে সুরেন্দ্রনাথকে আদালত অবমাননার দায়ে সোপর্দ করা হয়। ডব্লু. সি. ব্যানার্জির পরামর্শক্রমে সুরেন্দ্রনাথ ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং মিঃ নরিস সম্পর্কে হঠাৎ চটে গিয়ে এবং ঘৃণা মিশ্রিত ক্রোধের সঙ্গে যে মন্তব্য করেছিলেন তা প্রত্যাহার করে নেন। কিন্তু তাতেও তাঁর রেহাই মিলল না। পাঁচজন বিচারপতির একটা ফুল বেঞ্চ বিচার করে তাঁকে দু মাস সাধারণ কারাবাসের আদেশ দিলেন। জাস্টিস রমেশচন্দ্র মিত্র অধিকাংশ বিচারকের রায়ের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করলেন এবং তিনি

৩০। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন জুবিলি সুভেনির

৩১। ইণ্ডিয়ান প্রেস —মার্গারিটা বার্ণস্

কেবলমাত্র জরিমানা করতে পরামর্শ দিলেন। কথিত আছে যে প্রধান বিচারক তাঁকে অন্য সকলের সঙ্গে একমত হবার জন্য প্রচুর বুঝিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি তা মানতে রাজি হন নি। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় লর্ড রিপন মিঃ মিত্রকে অস্থায়ী প্রধান বিচারক করাতে ইউরোপীয় মহল তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছিল। আদালত কক্ষে লোক গমগম করছে, প্রচণ্ড উত্তেজনা বিরাজ করছে, রায় ঘোষণা করবার পর বিক্ষোভ ও উত্তেজনার ফলে বেশ উচ্ছৃঙ্খলা দেখা দিল। প্রেসিডেন্সী জেলে সুরেন্দ্রনাথকে ৫ই মে থেকে ৪ঠা জুলাই ১৮৮৩ পর্যন্ত বন্দী থাকতে হল।

ক্ষমা প্রার্থনা করা সত্ত্বেও একজন জনপ্রিয় নেতাকে এমনভাবে কারারুদ্ধ করার ফলে জনমতের উপর অপরিসীম আঘাত লাগল। এর ফলে সমস্ত ভারতবর্ষে প্রচণ্ড আন্দোলন সুরু হল—বিশেষ করে বাংলা-দেশে, যেখানে, একজন লেখকের বর্ণনা অনুযায়ী, "আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে একটি যুগ সৃষ্টিকারী ঘটনা।[৩২] লাহোর, অমৃতসর, আগ্রা, পুনা ইত্যাদি নানাস্থানে প্রতিবাদ সভা হতে লাগল। সমস্ত ভারতবর্ষে সুরেন্দ্রনাথের নাম লোকে ভালবাসার সঙ্গে ইতিমধ্যেই স্মরণ করত, এখন তিনি হয়ে পড়লেন একজন বীর, একজন শহীদ। এই ঘটনাটি ঐক্য সৃষ্টিতে সাহায্য করে। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের তৎকালীন সেক্রেটারি আনন্দমোহন বসু এই ঘটনা সম্পর্কে লেখেন: "বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের অন্তত একটা সান্ত্বনা ছিল, তাঁর দুর্ভাগ্য বিভিন্ন ভারতীয় জাতির মধ্যে ঐক্যভাব, যার জন্য তিনি কাজ করে যাচ্ছিলেন তা বেশ উল্লেখযোগ্যভাবে জাগরিত করল, এবং তা বৃথা হল না।[৩৩] কোলকাতায় স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে হরতাল পালিত হল, ছাত্ররা শোক প্রকাশ করল, আর তৎকালীন মান অনুসারে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হল। এমনকি বৃটিশ মালিকানায় প্রকাশিত ষ্টেটস্‌ম্যানে এই শাস্তির বিরুদ্ধে লেখা হল। বলা হয়, তৎকালীন ষ্টেটস্‌ম্যানের সম্পাদক রবার্ট নাইট সুরেন্দ্রনাথের স্ত্রী যখন কারাগারে স্বামীর সঙ্গে দেখা করতে যেতেন তখন তাঁর পার্শ্বচর

৩২। হিস্টরি অফ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন— যোগেশ চন্দ্র বাগল
৩৩। ঐ

হিসেবে থাকতেন। নাইটের এই কাজ সাহস এবং সততার এক প্রশংসনীয় দৃষ্টান্ত। তাঁর আমলে জনসাধারণের কাজে যে দুজন কারাগারে গিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে সুরেন্দ্রনাথ ছিলেন একজন। অন্যজন ছিলেন টিলক--তাঁকে ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে কারাগারে পাঠান হয়।

সুরেন্দ্রনাথকে প্রথম শ্রেণীর বন্দী হিসেবে গণ্য করা হয় এবং কারাগারে নানারকম সুখ সুবিধের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। এমন কি তিনি বেঙ্গলীর জন্য সেখান থেকে লিখতেও থাবেন। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয় এবং তিনি গর্বের সঙ্গে তাঁর আত্ম জীবনীতে লিখেছেন এই দিনটি ছিল অ্যামেরিকার স্বাধীনতা দিবস। তাঁর মুক্তির দিন যতই কাছে এগিয়ে আসতে লাগল, সরকারী মহলে দুশ্চিন্তা ততই বেড়ে গেল। তারা ভয় পেল এই ভেবে যে বিরাট লোকজন তাঁকে কারাগারের বাইরে বিজয় সম্বর্ধনা জানাবে সে সময় আইন ও শৃঙ্খলা যেন ভেঙ্গে না পড়ে। একটা খুব চালাকি করে ভোর চারটের সময় তাঁকে ঘুম থেকে তুলে একটা ঘোড়ার গাড়িতে করে সকাল হবার আগেই বেঙ্গলী অফিসে পৌঁছে দেওয়া হয়। এই সময়টা ছিল বিরাট উত্তেজনা ও আশার সময়। সিভিল সার্ভিস সংক্রান্ত আন্দোলন সমস্ত ভারতের উদ্দেশ্য ও আশা ভরসাকে একটা ঐক্যবদ্ধ রূপ দিয়েছিল। জাতীয় ঐক্য ও সংহতির জন্য একটি উদগ্র বাসনা দৃঢ় এবং সন্দেহাতীত ভাবে দেখা দিয়েছিল। সে বাসনা ইলবার্ট বিল আন্দোলনের ফলে প্রচণ্ড হয়েছিল। ইউরোপীয়দের এই ঘৃণ্য এবং সরব প্রতিরোধ ভারতীয়দের মনে তিক্তভাবে জাতীয় অবমাননা বোধ জাগিয়েছিল, এই সঙ্গে তাদের এই শিক্ষা হয়েছিল যে যুগ্মভাবে আন্দোলন করলে কেমন করে সুফল লাভ করা যায়। সবচেয়ে বড় কথা, সুরেন্দ্রনাথের কারাবাসের ফলে তারা যে আঘাত পেয়েছিল তাতে গভীর জাতীয় ঐক্যের সৃষ্টি হয়েছিল। শিক্ষিত ভারতবর্ষের তখন দ্রুত মানসিক পরিবর্তন ঘটছে। এরপর ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা হল পরবর্তী যুক্তিসঙ্গত পদক্ষেপ।

কারাগার থেকে মুক্ত হবার পর সুরেন্দ্রনাথ ইতিপূর্বে কথিত ইউরোপীয় রক্ষা সমিতির তহবিলের ধারায় একটি জাতীয় তহবিল খুলবার জন্য সমস্ত হৃদয় প্রাণ দিয়ে চেষ্টা করতে লাগলেন। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের ১৭ই জুলাই কোলকাতায় দশ হাজার লোকের একটি জনসভায় এটা স্থির হয় যে ভারতবর্ষে এবং ইংল্যাণ্ডে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন করবার জন্য একটা জাতীয় তহবিল খোলা হোক। সুরেন্দ্রনাথ ঐ তহবিলের একজন অছি নিযুক্ত হন, এবং দরিদ্র ও ধনী নির্বিশেষে সকলের কাছ থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে চাঁদা পেতে থাকেন। কথিত আছে ঐ সময়ে ভারতে ডব্লু. এস. ব্লাণ্ট এবং এস.কী নামে দু'জন ইংরেজ ছিলেন তাঁরা এই তহবিলে চাঁদা দিয়েছিলেন।[৩৪]

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে কোলকাতায় সরকারী তত্ত্বাবধানে আয়োজিত একটি আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী হবার কথা ছিল। কলকাতায় সমস্ত ভারতবর্ষ থেকে লোক সমাগম হবে এই প্রত্যাশায় সুরেন্দ্রনাথ এবং তাঁর সহকর্মীরা প্রথম জাতীয় সভা আহ্বানের সুযোগ গ্রহণ করেছিলেন। ২৮শে থেকে ৩০শে ডিসেম্বর এই সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং কোনো কোনো ঐতিহাসিকের মতে এই সভাই ছিল ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের পূর্বাভাস। বাস্তবিক পক্ষে এর সর্ব ভারতীয় বৈশিষ্ট্য ছিল—উত্তর এবং পশ্চিম ভারত থেকে, বিহার এবং উড়িষ্যা থেকে, হিন্দু এবং মুসলমান নির্বিশেষে জন প্রতিনিধি এই সভায় যোগ দিয়েছিলেন। প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন একজন বিখ্যাত শিক্ষাবিদ্ রামতনু লাহিড়ী। সিভিল সার্ভিস সম্পর্কে অনেকগুলি সংকল্প গ্রহণ করা হয় এবং আরো অনেক, যেমন শাসন বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ পৃথক করা, জনপ্রতিনিধিমূলক সরকার, অস্ত্র আইন ইত্যাদি সঙ্কল্পও গ্রহণ করা হয়। সিভিল সার্ভিস সম্পর্কীত সঙ্কল্পটি সুরেন্দ্রনাথ নিজে উত্থাপন করেন। ঐ সভায় ডব্লু. এস. ব্লাণ্ট উপস্থিত ছিলেন এবং তিনি আনন্দ মোহন এবং সুরেন্দ্রনাথকে বক্তা হিসেবে প্রভূত প্রশংসা করেন এবং

৩৪। হিস্টরি অফ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন—জে. সি. বাগল

সভা সম্পর্কে বলেন, "জাতীয় পার্লামেণ্ট সৃষ্টির পথের প্রথম অধ্যায়।" [৩৫] এই সভা সর্বতোভাবে সফল হয়েছিল।

এই সভার পর সুরেন্দ্রনাথ ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে আবার উত্তর ভারত পরিক্রমণে বের হন। তিনি বাঁকীপুর থেকে রাওয়ালপিণ্ডি বহু শহর ঘোরেন। সিভিল সার্ভিসের ব্যাপারটির তখনো নিষ্পত্তি হয়নি। দাবীর প্রধান প্রধান বিষয়গুলি ছিল ষ্ট্যাটিউটরি সিভিল সার্ভিসের বিরুদ্ধে অসন্তোষ, খোলাখুলি প্রতিযোগিতায় বয়সের সীমা বাড়ানো এবং একই সঙ্গে পরীক্ষা গ্রহণ করা। এ ছাড়াও ছিল জাতীয় তহবিলে চাঁদা আদায় এবং এ সমস্তেরই তলায় তলায় ছিল রাজনৈতিক অধিকারের জন্য আরো ব্যাপক এবং ঐক্যপূর্ণ আন্দোলন। সুরেন্দ্রনাথের পরিক্রমণ. "বিরাট সাফল্য" অর্জন করেছিল।[৩৬] সিভিল সার্ভিসের ব্যাপার নিয়ে রাষ্ট্র সচিবের কাছে স্মারক লিপি পাঠানো হয়েছিল। জাতীয় তহবিলে চাঁদা দেবারও অনেক প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়েছিল।

লর্ড রিপনের পর বড়লাট হিসেবে আসেন লর্ড ডাফরিন, ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের তরফ থেকে সুরেন্দ্রনাথ রচিত একটা অভিভাষণ তাঁর কাছে প্রেরিত হয়। প্রাদেশিক আইন সভাগুলিকে সংশোধন এবং পুনর্গঠনের প্রয়োজনীয়তা বড়লাটকে অবহিত করানো হয়। এটা সুবিদিত যে প্রথম দিকে লর্ড ডাফরিন ভারতের জাতীয় কংগ্রেস গঠনের ব্যাপারে হিউমের ইঙ্গিত অনুযায়ী সমর্থন করেছিলেন এবং উৎসাহও দিয়েছিলেন, কিন্তু পরে তিনি মত পরিবর্তন করেন। তা সত্ত্বেও তিনিই কাউন্সিল পুনর্গঠন করবার পক্ষে সুপারিশ করেন যা কিনা ১৮৯২ খৃষ্টাব্দের পার্লামেণ্টারি ষ্ট্যাটিউটের ভিত্তি হিসাবে গৃহীত হয়। এই ব্যাপারে বড়লাট ভারতীয়দের উচ্চাভিলাষের প্রতি সহানুভুতিশীল সার হেনরী হ্যারিসন এবং মিঃ কটন—এই দু'জনের সঙ্গে পরামর্শ করেছিলেন বলে কথিত আছে।

---

৩৫। ইণ্ডিয়া আণ্ডার রিপন

৩৬। রিপোর্ট অফ দি ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ১৮৮৪

স্বয়ং সুরেন্দ্রনাথকে নিমন্ত্রণ করেন বড়লাট এবং তাঁর সঙ্গে বহুক্ষণ আলোচনা করেন।

এখানে একটি বিষয়ের উল্লেখ করতেই হবে যে হুগলী জেলায় একটি আন্দোলন সুরেন্দ্রনাথ সাফল্যের সঙ্গে পরিচালিত করেন। রাজস্বের খাতিরে তখন আউটস্টিল সিষ্টেম্ চালু করা হয় ফলে দেশী মদের দাম কমে যায় এবং গ্রামবাসীদের মধ্যে মদ্যপান ব্যাপকভাবে চালু হয়—সুরেন্দ্রনাথ ব্যক্তিগতভাবে এর এক অতি করুণ বিবরণ সংগ্রহ করেন। জনসাধারণকে সহজলভ্য মদ্যপান ও তার কুফলের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য সুরেন্দ্রনাথ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হন এবং সমস্ত জেলায় সভা সমিতি করে, আবেদন ইত্যাদি প্রচার করে তিনি তীব্রভাবে এর বিরোধিতা করেন। সুরেন্দ্রনাথের মনে তাঁর যৌবন বয়সের মদ্যপান বিরোধী আন্দোলনের স্মৃতি ছিল। হুগলীর এই আন্দোলন গান্ধীজীর পরবর্তী মদ্যপানরূপী শয়তান বিরোধী আন্দোলনের পথ প্রশস্ত করেছিল। এই আন্দোলন সীমিতভাবে হলেও গণ আন্দোলন হয়েছিল। আত্মজীবনীতে সুরেন্দ্রনাথ তাঁর সঙ্গীদের সম্পর্কে কৃষ্ণ কুমার মিত্র এবং কালীশঙ্কর সুকুল, এঁরা দু'জনেই সাধারণের জন্য কাজে গভীরভাবে লিপ্ত ছিলেন, বিশেষ আবেগের সঙ্গে লিখেছেন। এই আন্দোলনে ফল হয়েছিল। সরকার হাওড়ার ম্যাজিষ্ট্রেটের উপর আউস্টিল সিষ্টেমের ব্যাপারে কাজকর্ম কিভাবে হয় সে সম্পর্কে অনুসন্ধানের ভার দেন এবং অনুসন্ধানের ফল বেরুনোর পর তা বিলোপ করা হয়। আরো একবার আন্দোলনকারী সুরেন্দ্রনাথের জয়লাভ হল। জয়লাভ ছাড়াও এ থেকে তাঁর একটা শিক্ষাও হল। এই প্রথম তাঁর সঙ্গে কৃষিজীবীদের সংযোগ ঘটল এবং তাঁর সমবেদনার সম্প্রসারণ ঘটাতে সাহায্য করল।

# অষ্টম অধ্যায়

## কংগ্রেসের উৎপত্তি

সময়টা তখন জাতীয় কংগ্রেসের উৎপত্তির অনুকূলে এসে দাঁড়িয়েছে। এটা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বলার প্রয়োজন নেই যে এই অসাধারণ গুরুত্বপূ ঘটনাটি পরে ভারতবর্ষের ইতিহাসের গতিকে অতি প্রচণ্ডভাবে প্রভাবিত করেছিল। এটা বললেই যথেষ্ঠ হবে যে, যে সমস্ত ঘটনা ঘটেছিল তারই নির্মোব ফলস্বরূপ হয়েছিল কংগ্রেসের জন্ম। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতবর্ষে জাতীয়তাবাদের বীজ বপনের সময়। এই সময়ের মধ্যে জাতীয় জাগরণ যা প্রথমে ছিল আবছা, অপরিণত তা নির্দ্দিষ্ট রূপ পেল। কলকাতা, মাদ্রাজ, বোম্বাই, পুনা ইত্যাদির স্থানীয় সমিতি সমূহ রাজনৈতিক অগ্রগতির এক সাধারণ ক্ষেত্রে মিলিত হবার জন্য চেষ্টা করছিল—আর সেই সাধারণ ক্ষেত্র হল ভারতের জাতীয় কংগ্রেস। কংগ্রেসের জন্মের পূর্বেকার যে সমস্ত ঘটনা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কংগ্রেসের উৎপত্তির অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্টি করতে সাহায্য করেছিল তার প্রায় প্রতিটির সঙ্গেই সুরেন্দ্রনাথ সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ভারতীয় কংগ্রেসের আসল সৃষ্টিকর্তা কে তা নিয়ে মতভেদ আছে। হিউম-এর দাবী অবশ্যই সন্দেহাতীতভাবে আছে। কিন্তু এটা বলা শক্ত যে কংগ্রেসের পরিকল্পনা একজনের মাথা থেকে বেরিয়েছিল ; কল্পনাটি একই সঙ্গে অনেকের মনেই উদয় হয়েছিল। সেই কারণেই সম্ভবত গান্ধীজী বলেছিলেন যে সুরেন্দ্রনাথ "নিজে সৃষ্টি না করলেও জাতীয় কংগ্রেসের সৃষ্টিকর্তাদের মধ্যে একজন ছিলেন" তিনি আরো বলেছেন, "তাঁর সময়ে সুরেন্দ্রনাথের চাইতে শ্রেষ্ঠ আর কেউ ছিলেন না।"[৩৭] চক্রবর্ত্তী রাজগোপালআচারিও লক্ষ্য করেছেন

৩৭। বেঙ্গলী—৯ই আগষ্ট, ১৯২৫

যে ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কনফারেন্স ছিল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অগ্রদূত এবং সুরেন্দ্রনাথ ছিলেন "জাতীয় কংগ্রেসের সৃষ্টিকর্তা কিংবা সৃষ্টিকর্তাদের মধ্যে একজন।"[৩৮]

জাতীয় সভার প্রথম অধিবেশনে সাফল্য লাভ করায় এর উদ্যোক্তাগণ, এঁদের মধ্যে সুরেন্দ্রনাথও ছিলেন. কলকাতায় দ্বিতীয় জাতীয় সভার অধিবেশন আহ্বান করেন ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের দিল্লীর দরবারে প্রথম একটা জাতীয় অধিবেশন করার কল্পনা করা হয়। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে প্রথম অধিবেশনটি কলকাতায় হয়, নানা আকারের আরো অধিবেশন বিভিন্ন কেন্দ্রেও হয়। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে মাদ্রাজে থিওসফিস্ট্দের যে ঘরোয়া বৈঠক হয় সেটাও স্মরণীয়। তবে সুরেন্দ্রনাথ এবং তাঁর সহযোগীদের পক্ষে এটা সত্যিই প্রশংসনীয় যে তাঁরা মাত্র তিন বছরের ব্যবধানে দুটি জাতীয় অধিবেশন আহ্বান করতে পেরেছিলেন। দ্বিতীয় অধিবেশনটি সর্বতোভাবে জাতীয় ছিল, এই অধিবেশনে উত্তর ভারত থেকে ত্রিশটি রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি যোগ দিয়েছিল, এছাড়া অন্য প্রদেশগুলিও লোক পাঠিয়েছিল—এঁদের মধ্যে হিন্দু এবং মুসলমান এই উভয় রকম লোকই ছিলেন। বোম্বাই থেকে এসেছিলেন ভি. এন. মাণ্ডালিক। বিহারের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন দ্বারভাঙ্গার মহারাজা। এই সময়কার বেঙ্গলী কাগজের প্রধান নিবন্ধগুলিতে পরিচয় পাওয়া যায় তৎকালীন ভারতের জাতীয়তাবাদকে শক্ত ভূমিতে প্রতিষ্ঠা করার জন্য সুরেন্দ্রনাথের প্রচণ্ড উৎসাহ এবং একান্ত প্রেরণায় কাজ করে যাওয়া। অধিবেশন সুরু হবার কিছু আগে, বেঙ্গলী কাগজটি "জাতীয় প্রতিনিধি"দের "জাতীয় সমস্যাবলী" সম্পর্কে আলোচনা করার আবেদন জানান। এতে আরো বলা হয় নানা স্থানে কাজ করে শক্তির অপচয় না করে জনসাধারণের দ্বারা গঠিত সমিতিগুলির পক্ষে একজোট

৩৮। কে. কে. ব্যানার্জীর লেখা, রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ ও পরবর্তী রাষ্ট্রীয় আন্দোলন বইতে উদ্ধৃত আছে

একই লক্ষ্য নিয়ে রাজনৈতিক কাজ করা উচিত। অন্য কথায়, জাতীয় মঞ্চ থেকে কাজ করা উচিত।[৩৯]

প্রথম প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় মন্ত্রীসভাগুলিকে সংস্কার করার ব্যাপারে, এবং প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন সুরেন্দ্রনাথ স্বয়ং। অন্যান্য প্রস্তাবাদি গৃহীত হয় অস্ত্র আইন, সিভিল সার্ভিস এবং অন্যান্য বিষয়ে। ন্যাশানাল কনফারেন্স যা করতে চেয়েছিল পরে জাতীয় কংগ্রেসও তাই করেছিল তার প্রথম প্রমাণ হল যে আবার পরের বছরে অধিবেশন ডাকা হবে এবং বাংলার বাইরের প্রতিনিধিদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত এই হল যে প্রতি বছর সমগ্র দেশের বিভিন্ন স্থানে এই অধিবেশন হবে। এই সভা থেকে আসন্ন বোম্বাই-এর কংগ্রেস অধিবেশনকে সমর্থন করে একটা টেলিগ্রাম পাঠানো হয়।

ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন শুরু হয় বোম্বাইতে ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ২৮শে ডিসেম্বর। ন্যাশানাল কনফারেন্সের দ্বিতীয় অধিবেশন হয় ২৫শে, ২৬শে এবং ২৭শে ডিসেম্বর ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে কলকাতায়। তাঁর আত্মজীবনীতে সুরেন্দ্রনাথ লেখেন: "আন্দোলনগুলি একই সঙ্গে চলেছিল; প্রাথমিক ব্যবস্থাদি দু'দলই করেছিল নিজের ইচ্ছেয় এবং কনফারেন্স ও কংগ্রেসের অধিবেশনের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত একদল জানতেন না অন্য দল কি করতে যাচ্ছেন।"[৪০] এ. সি. মজুমদার বলেন, "একই আন্দোলনের একই সঙ্গে উদ্ভূত দুটি শাখা।[৪১] ডব্লু. সি. ব্যানার্জী সুরেন্দ্রনাথকে কংগ্রেসে যোগদানের জন্য আহ্বান করেছিলেন কিন্তু তখন নিশ্চয়ই দেরি হয়ে গিয়েছিল তাই সুরেন্দ্রনাথ কংগ্রেসে যোগ দিতে

৩৯। বেঙ্গলীতে সম্পাদকীয়: "দি অ্যাপ্রোচিং ন্যাশানাল কনফারেন্স অ্যাট ক্যালকাটা", ডিসেম্বর ১২, ১৮৮৫

৪০। এ নেশন ইন মেকিং

৪১। ইণ্ডিয়ান ন্যাশানাল ইভোলিউশন

পারেন নি, প্রায় সেই সময়েই আবার ন্যাশনাল কনফারেন্সও শুরু হচ্ছিল, তার ব্যবস্থাপনার ভারও অনেকটা সুরেন্দ্রনাথের উপর ন্যস্ত ছিল। এটা মনে হয় যে কে. টি. টেলাঙ্গ, যিনি মাদ্রাজে থিয়োসফিস্‌টদের সভায় উপস্থিত ছিলেন, সুরেন্দ্রনাথের কাছ থেকে প্রথম ন্যাশনাল কনফারেন্সের কিছু সংক্ষিপ্ত মন্তব্য চান। বোম্বাই কংগ্রেসে টেলাঙ্গ ছিলেন একজন সক্রিয় সংগঠনকারী। তা সত্ত্বেও অদ্ভুত ব্যাপার এই যে টেলাঙ্গের কাছ থেকে বোম্বাই কংগ্রেস সম্পর্কে সুরেন্দ্রনাথ কোনো খবরই পাননি।

কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে যে সমস্ত প্রস্তাব গৃহীত হয় তার অনেকগুলি নিয়েই সুরেন্দ্রনাথ প্রথমে ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন এবং পরে ন্যাশনাল কনফারেন্সের মাধ্যমে সংগ্রাম করছিলেন। আসলে দু'দলের নেতারাই একই সাধারণ উদ্দেশ্যে একই রকম কাজ করে চলেছিলেন।

১৯১৭ সালের চরম এবং মধ্যপন্থীদের মধ্যে যখন ভাঙ্গন দেখা দিল তার আগে পর্যন্ত সুরেন্দ্রনাথ নিজেকে কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে মিলিয়ে দিয়েছিলেন এবং এর সবচেয়ে বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। তিনি দু'বার এর সভাপতি নির্বাচিত হন। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে তিনি মাত্র দু'বার কংগ্রেস অধিবেশনে অনুপস্থিত থাকেন।

যখন একটি সর্বভারতীয় সংস্থা সাধারণ জাতীয় সমস্যার প্রতি দৃষ্টি দেবার জন্য সৃষ্টি হল সুরেন্দ্রনাথ তখন তাঁর কার্যকলাপের ক্ষেত্র অন্যত্র প্রসারিত করলেন, যেমন, প্রাদেশিক সমস্যার মধ্যে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, শিক্ষা; স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন এবং অন্যান্য—এ সমস্ত সমস্যার রূপ প্রদেশে প্রদেশে বিভিন্ন। তিনি প্রাদেশিক সভা করবার ব্যাপারে অগ্রগণ্য ছিলেন এবং ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে বাংলাদেশে এর প্রথম অধিবেশন হয়। এই আন্দোলন অন্য প্রদেশেও ব্যাপ্ত হয়। পরে ভারতের বহুস্থানে এমনকি জেলা সম্মেলনও হতে থাকে! বাংলাদেশে প্রাদেশিক সভাগুলিতে প্রচণ্ড ভীড় হত এবং এরকম সভার পর বেশ কিছু সামাজিক সভাও হত, তারও

অনেকগুলিতে সুরেন্দ্রনাথকে সভাপতি হতে হত। দুটো সামাজিক সমস্যা তখন জনসাধারণের মনকে ব্যস্ত রেখেছিল, সেগুলো হল হিন্দু মেয়েদের বিয়ের বয়স বাড়িয়ে দেওয়া এবং হিন্দু বিধবার পুনর্বিবাহ। এই দুই ব্যাপারেই সুরেন্দ্রনাথের ছিল প্রগতিশীল অভিমত। এই প্রগতিমূলক কাজকর্মের ব্যাপারে সুরেন্দ্রনাথ একটি কৌতুহলোদ্দীপক ঘটনার কথা আমাদের জানিয়েছেন। দু একবার তিনি বেঙ্গলীতে ব্রাহ্মণ বিধবাদের বিবাহের জন্য বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন এবং তাতে আশ্চর্যজনকভাবে সাড়া পড়ে গিয়েছিল। একবার তিনি ১৫০ খানি আবেদন পত্র পান, আবেদনকারীদের মধ্যে কেউ কেউ ছিলেন রক্ষণশীল।

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের কলকাতা কংগ্রেসের সভাপতিত্ব করেন দাদাভাই নওরোজি—এখানে সম্মিলিত হয়েছিলেন পুরনো আমলের আর নতুন আমলের নেতা যাঁরা এসেছিলেন মধ্যবিত্ত এবং জমিদারদের ভেতর থেকে। সমাজের রক্ষণশীল অংশ, দি বৃটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন, যেটা ছিল জমিদারদের সমিতি, কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিল। সুরেন্দ্রনাথ একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন সেটি হল আইন সভার সংশোধন এবং সম্প্রসারণ—এই বিষয়টি সুরেন্দ্রনাথের বড়ই প্রিয় ছিল কংগ্রেসে এটা মেনে না নেওয়া পর্যন্ত তিনি এই প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন। সুরেন্দ্রনাথ নিজেই এই বিষয়ে এবং আরো কয়েকটি জনসাধারণের স্বার্থের প্রশ্নে প্রচণ্ড আবেগ এবং একাগ্রতার কথা তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন :

"আমার সমগ্র জীবনে বারবার একটি অতি শক্তিশালী আদর্শ আমাকে পরিচালিত করেছে। এটি হল সিভিল সার্ভিসের প্রশ্ন, বা স্বায়ত্ত্ব শাসন বা আইন সভার সম্প্রসারণ, বা স্বদেশী—এরই সঙ্গে দেশ ভাগকে সংশোধন করার প্রশ্ন যুক্ত, এগুলিই আমার মনের দিগন্তে সম্পূর্ণভাবে দেখা দিয়েছিল, আমার উৎসাহকে প্রজ্জ্বলিত করেছিল এবং আমার আত্মাকে পূর্ণ করেছিল। কিছু সময়ের জন্য আমি আমার আদর্শের মধ্যে থাকতাম। অন্য ব্যাপারে আমার কাজকর্ম ছিল অনেকটা যান্ত্রিক। আমি নিজেকে

বিশ্বাস করিয়েছিলাম যে এই একটিমাত্র অমূল্য বস্তু আমাদের অন্য যে কোনো বস্তুকে বাদ দিয়ে পেতে হবে এবং অন্যদের এ ব্যাপারে বিশ্বাস করাতে আমার কোনো অসুবিধাই হত না।"[৪২]

এর পরের কংগ্রেস অধিবেশন বসেছিল মাদ্রাজে ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে। বাংলার দলটি, যার মধ্যে ছিলেন স্যার রাসবিহারী ঘোষ, সমুদ্র পথে মাদ্রাজ যাত্রা করেন। সুরেন্দ্রনাথ দক্ষিণ ভারতের অনেক নেতার সঙ্গে স্থায়ী বন্ধুত্ব সূত্রে আবদ্ধ হন—এঁদের মধ্যে ছিলেন আনন্দ চারলু, বীর রাঘবাচারিয়ার, রঙ্গাইয়া নাইডু এবং জি, সুব্রহ্মণ্য আয়ার। বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় বিজয় নগরের তৎকালীন মহারাজার সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব—যিনি বহু জন আন্দোলনকে সমর্থন করতেন এবং যাঁর দেওয়া বেশ মোটা রকমের চাঁদায় ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন একটি সভাগৃহ তৈরী করতে পেরেছিল।

মাদ্রাজ কংগ্রেসে সুরেন্দ্রনাথ একটি প্রস্তাব খুব জোরের সঙ্গে সমর্থন করেছিলেন, তা গৃহীতও হয়েছিল—সেটি হল অস্ত্র আইনের বিলুপ্তি। এই সভাতেই, একজন সদস্য গো-হত্যা নিবারণ বিষয়ক একটি প্রস্তাবের বিজ্ঞপ্তি দেন, ফলে এই সাম্প্রদায়িকতামূলক প্রস্তাব আনা হবে কি হবে না তা নিয়ে কংগ্রেসের সামনে এক সমস্যা দেখা দেয়। স্যার সইয়দ আহমেদ এবং তাঁর পেট্রিয়টিক অ্যাসোসিয়েসন কংগ্রেসের বিরুদ্ধে চলে গেলেন। মুসলমানদের পৃথক হয়ে যাবার প্রশ্নটি তখন খোলাখুলিভাবে প্রকাশ পাচ্ছিল। অবশেষে এটা স্থির হয় যে কোনো শ্রেণী বা সম্প্রদায়ের স্বার্থের পরিপন্থী এবং সংখ্যালঘু হলেও কোনো প্রতিনিধি যদি আপত্তি তোলেন তাহলে সে রকম কোনো প্রস্তাব কংগ্রেসে আনা হবে না। কংগ্রেস এর পর থেকে এই নীতি সর্বদাই মেনে এসেছে।

---

৪২। এ নেশন ইন মেকিং

আমলাতন্ত্রের বিরোধিতা সত্ত্বেও ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে এলাহাবাদে কংগ্রেস অধিবেশন হয়, আর অন্যান্য অনেক ব্যাপারের মধ্যে অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যান পণ্ডিত অযোধ্যানাথের অক্লান্ত প্রচেষ্টা ঐ অধিবেশনের সাফল্যের কারণ ছিল। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের বোম্বাই কংগ্রেসের বৈশিষ্ট্য ছিল চার্লস ব্রাডলফের স্তুতিমূলক অভিভাষণ, এবং মন্ত্রণা সভার সংস্কার বিষয়ক সংক্ষিপ্ত পরিকল্পনা, যেটি পরের বছরে ব্রাডলাফ-এর বিল হিসাবে পার্লামেণ্টে উঠেছিল। এই সভায় সুরেন্দ্রনাথের কাজ ছিল তহবিলের জন্য আবেদন করা। আশ্চর্য সাড়া পাওয়া গেল। ওখানেই ২০ হাজার টাকার বেশী উঠল, আর ৪৪ হাজার টাকার প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেল। এইভাবে মহান জাতীয় সমিতির উদ্ভব হল, যার ফলে কালক্রমে সুরেন্দ্রনাথ প্রায় ত্রিশ বছর এর সঙ্গে নানা ঘটনাচক্রে বাঁধা পড়েন।

এই সময়কার একটা বিশেষ স্মরণীয় ব্যাপার হল বোম্বাইএর কংগ্রেস অধিবেশনে একটি প্রস্তাবকে কার্যকর করার জন্য ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডে কংগ্রেসের একটি প্রতিনিধিমণ্ডল প্রেরণ। এর আগের একটি অধ্যায়ে আমরা দেখেছি কেমন করে লালমোহন ঘোষ সিভিল সার্ভিস প্রশ্নে একক ভাবে প্রতিনিধিত্ব করে বিরাট সাফল্য অর্জন করেছিলেন। ইংল্যাণ্ডের মধ্যেই প্রচুর সংখ্যক লোক ছিলেন যাঁরা ভারতের আশা আকাঙ্খাকে সমর্থন করতেন। দাদাভাই নওরোজি এ ব্যাপারে এর আগেই বৃটেনের শিক্ষিত লোকদের ভারতের ব্যাপারে উৎসাহ জাগাবার জন্য মূল্যবান কাজ করে গিয়েছেন তাঁর প্রতিষ্ঠান সমূহের সাহায্যে—এগুলির নাম হল লণ্ডন ইণ্ডিয়ান সোসাইটি এবং ইস্ট ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন। সুরেন্দ্রনাথ সর্বদাই বিশ্বাস করতেন যে ভারতবর্ষের হয়ে কাজ করবার সুযোগ ইংল্যাণ্ডে প্রচুর আছে, এবং ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের কংগ্রেস প্রতিনিধিগণের সাফল্যে এটা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হল। এই প্রতিনিধিগণ ছিলেন অ্যালেন হোম, স্যার ফিরোজ শা মেহতা, মনমোহন ঘোষ, ডব্লিউ. সি. ব্যানার্জী, শারিফুদ্দিন, ইয়ারডলি নরটন্, আর. এন. মুধোলকার এবং সুরেন্দ্রনাথ। বৃটিশ জনসাধারণের কাছে ভারতের রাজনৈতিক সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বক্তব্য উপস্থিত করাই ছিল এর উদ্দেশ্য। এই

প্রতিনিধিরা প্রত্যেকে নিজেদের টাকা খরচ করবেন এটাই আশা করা হয়েছিল। সুরেন্দ্রনাথ ধনী ছিলেন না। সেই সময়ে তাঁর সমস্ত সঞ্চয়ের পরিমাণ ছিল ১৩ হাজার টাকা, তাঁর স্ত্রীর নামে সিকিউরিটিতে নিয়োজিত ছিল, এবং তাঁর ইংল্যাণ্ড ভ্রমণের মোট খরচ হবার কথা ছিল প্রায় ৪ হাজার টাকা। অন্য কথায় বলতে গেলে এতে তাঁর সমগ্র জাগতিক সঞ্চয় —যার পরিমাণ এমন কিছু বেশি বলা যায় না, তার প্রায় এক তৃতীয়াংশ খরচ করার প্রশ্ন ছিল। তিনি তা বিনা দ্বিধায় করতে প্রস্তুত ছিলেন। ঠিক একই ভাবে তাঁর স্ত্রী কোনো দ্বিধা না করে—যিনি সর্বদাই নীরবে তাঁর রাজনৈতিক কাজে প্রেরণা জাগিয়েছেন—এগিয়ে এলেন এবং তাঁর সিকিউরিটি বিক্রী করে টাকা যোগাড় করবার প্রস্তাব করলেন।

ইংল্যাণ্ডে এই প্রতিনিধিগণকে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের বৃটিশ কমিটী সভা সমিতির আয়োজন করে সাহায্য করেন। এই সব সভা প্রচণ্ড সাফল্য লাভ করে। সুরেন্দ্রনাথের অনন্যসাধারণ বাগ্মিতা বৃটিশ জনসাধারণের মনে বেশ সাড়া জাগায়। সমস্ত সভাতেই সুরেন্দ্রনাথকে আবার সেখানে যাবার জন্য অনুরোধ করা হয়। এই প্রতিনিধিগণ ইংল্যাণ্ড, স্কটল্যাণ্ড এবং ওয়েলস্‌এর নানা স্থানে সভা করে শেষে গ্ল্যাডস্টোনের সঙ্গে দেখা করে তাঁদের অভিযান শেষ করেন। ফলে লর্ড ক্রসএর বিলটি দ্বিতীয়বার পড়বার সময় গ্ল্যাডস্টোন ভারতবর্ষকে প্রকৃত এবং প্রাণময় প্রতিনিধিত্ব দেবার জন্য আবেদন করেন। নির্বাচন নীতির ব্যাপারে এটি একটি স্পষ্ট লাভ। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দের পার্লামেণ্টারি স্ট্যাটিউটএর নিয়ম যে ভাবে বিধিবদ্ধ হয় তাতে নির্বাচন নীতিকে সোজাসুজি না হলেও মেনে নেওয়া হয়েছিল। ইম্পিরিয়াল কাউন্সেলের সভ্যদের প্রশ্ন করবার অধিকার দেওয়া ছিল এবং বাজেট বিষয়ে আলোচনা করা অনুমোদিত হয়েছিল। ঐ সময়ের কথা ভাবলে এই লাভকে মোটেই সামান্য বলে মনে করা যায় না, যদিও দেশ যা দাবি করছিল তার তুলনায় ব্যাপারটি কিছুই নয়।

রক্ষণশীলদের শক্তিশালী দুর্গ অক্সফোর্ড ইউনিয়নে একটি স্মরণীয় বিতর্ক হয়। হাউস অব কমন্সে উত্থিত বিলে, যেখানে নির্বাচন নীতিকে

না মেনে নেবার কথা ছিল, সেখানে দুঃখ প্রকাশ করে কংগ্রেসের প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন নরটন। বিরোধী দলে নেতৃত্ব করেন লর্ড হিউ সিসিল। সুরেন্দ্রনাথ এর খুব জোরালো উত্তর দেন এবং প্রস্তাবটি গৃহীত হয়, ফলে প্রমাণ হয় যে কংগ্রেসের মধ্যপন্থী প্রস্তাবগুলি বৃটেনের সবচেয়ে বড় রক্ষণশীলদের কাছেও গ্রহণীয় ছিল।

১৮৯০ খৃষ্টাব্দে ভারতে ফেরবার পর সুরেন্দ্রনাথকে বোম্বাইতে ফ্র্যামজি কাওয়াশ্‌জিতে বিরাট অভ্যর্থনা জানানো হয়—এলাহাবাদ এবং কলকাতাতেও তাঁকে অভ্যর্থনা জানানো। এই সমস্ত সভায় তিনি একই কথা বার বার বলেন, আর তা হল যে, আরব্ধ কাজ আরো জোরের সঙ্গে করা উচিত। এর মধ্যে একটি কাজ হল ইংল্যাণ্ডে প্রতিনিধি প্রেরণ। ইংল্যাণ্ড থেকে ফিরে এসেই তিনি রিপন কলেজের ব্যাপারে দারুণ অসুবিধের মধ্যে পড়ে গেলেন। কলেজ কর্তৃপক্ষের একটা সামান্য ত্রুটি বা অবহেলার ফলে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেট এক বছরের জন্য আইন বিভাগটি বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতার বাইরে রাখবার পরামর্শ দেয়, ফলে কলেজ ধ্বংস হয়ে যাবারও সম্ভাবনা ছিল। এই পরামর্শ যাতে কার্যকর না হয় সেজন্য সুরেন্দ্রনাথকে সম্ভব অসম্ভব নানা কাজ করতে হয়েছিল এবং যে প্রতিষ্ঠানকে তিনি যত্ন এবং ভালবাসার সঙ্গে গড়ে তুলেছিলেন তাকেও রক্ষা করতে পেরেছিলেন।

যে পরিশ্রম এবং দুশ্চিন্তার ভেতর দিয়ে তাঁকে চলতে হচ্ছিল তাতে তাঁর মত শক্ত শরীরের লোকের পক্ষেও অসহনীয় হয়ে পড়ল। একদিন সন্ধ্যায় যখন তিনি একটা ভোজ সভায় নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে রওনা হচ্ছিলেন তখন হঠাৎ তাঁর জ্বর বোধ হয়। দেখা গেল তাঁর নিউমোনিয়া হয়েছে। এই অসুস্থতা অবশ্য তিনি ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের কলকাতা কংগ্রেস অধিবেশন হবার আগেই কাটিয়ে ওঠেন। সে অধিবেশনে ইংল্যাণ্ডে কংগ্রেস প্রতিনিধিদের কাজকর্মকে প্রশংসা করে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

# নবম অধ্যায়

## মন্ত্রণা সভা কক্ষে

১৮৬১ খৃষ্টাব্দ থেকে শুরু করে প্রায় ত্রিশ বছর সরকার দেশের সংস্কারের জন্য কিছুই করেননি। সংস্কার তাই তখন খুব জরুরী হয়ে পড়েছিল। কংগ্রেস সংস্কারের জন্য আন্দোলন করছিল আর জনসাধারণ আশান্বিত হচ্ছিল।

ভারতবর্ষের সাংবিধানিক কর্মতৎপরতা ১৭৭৩ এর রেগুলেটিং অ্যাক্টের পর থেকে অত্যন্ত সাবধানে নিয়ন্ত্রণের ভেতর দিয়ে এবং খুব হিসেব করে কিছু না করার নীতি গ্রহণ করে চলেছিল। শাসন বিষয়ের আইনের কিংবা সেই আইন কার্যকর করার ব্যাপারে ভারতীয়দের মতামত কঠোরভাবে এর বাইরে রাখা হয়েছিল। যাঁরা এর সঙ্গে জড়িত ছিলেন তাঁদের বেশির ভাগই ছিলেন "জো-হুজুর" এর দলের—মহারাজা, রাজা, অবসরপ্রাপ্ত সরকারী অফিসার ইত্যাদি। সরকার ছিল, কিন্তু শাসিতদের সঙ্গে প্রয়োজনীয় কোন কথাবার্তাই হত না।

১৮৬১ খৃষ্টাব্দের আইন অনুযায়ী বড়লাটকে, কেবলমাত্র আইন প্রণয়নের জন্য ন্যূনপক্ষে ছ'জন এবং উর্ধ পক্ষে বারো জন সদস্য বড়লাটের মন্ত্রণা সভায় মনোনীত করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল, এঁদের মধ্যে অন্তত অর্ধেক লোককে বে-সরকারী হতে হবে এই ভাবে নির্দিষ্ট করা ছিল। প্রাদেশিক সরকারের আইন প্রণয়নের ক্ষমতা, যা ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের আইনের বলে রদ করা হয়েছিল তা আবার প্রতিষ্ঠা করা হল এবং বড়লাটকে কিছু নতুন প্রাদেশিক মন্ত্রণা সভা সৃষ্টির ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। এই আইন অনুসারে কেন্দ্রে বা প্রদেশের মন্ত্রণা সভায় বে-সরকারী প্রতিনিধি মনোনয়নের ব্যবস্থা ছিল। তবে নির্বাচনের নীতি তখনও স্থির হয়নি;

বে-সরকারী সভ্যদের বেছে নেওয়া হত। তাঁদের আইন বিষয়ে বিশেষ কোনো বক্তব্য থাকত না, সেগুলি শাসকের হুকুম মাফিক চলত। এই আইনের দ্বারা সভ্যদের কোনো প্রশ্ন তোলা বা নীতি বিষয়ে কোনো বক্তব্য প্রকাশ করার অধিকার গ্রহণ করা হয়েছিল। আইন সভার ক্ষমতা প্রচণ্ড-ভাবে সীমিত ছিল। সুরেন্দ্রনাথ এবং অপরাপর কংগ্রেসী নেতারা ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের সংস্কারের অপ্রতুলতাকে সম্পূর্ণভাবে প্রকট করেছিলেন।

১৮৯২ খৃষ্টাব্দের আইনে আইন সভার কার্যকলাপ বাড়িয়ে দেওয়া হয়। এখন থেকে সভ্যেরা নিয়মিত আইন সভায় যে ঘোষণা করতে হত সেই বাৎসরিক অর্থনৈতিক ঘোষণা নিয়ে আলোচনা করতে পারতেন, তবে বাজেট সংক্রান্ত কোনো ব্যাপারে আইন সভায় কোনো প্রস্তাব উত্থাপন বা ভোটাভুটির ব্যবস্থা ছিল না। প্রশ্ন তোলার অধিকার দেওয়া হয়েছিল বটে, তবে সম্পূরক কোনো বক্তব্য দাবির অধিকার ছিল না। সভার বে-সরকারী প্রতিনিধি সংখ্যা বাড়ানো হয়েছিল। কেন্দ্রীয় আইন পরিষদে এখন থেকে অন্যূন দশ জন এবং ষোলর বেশি নয় এমন সংখ্যক প্রতিনিধি নেবার এবং বে-সরকারী প্রতিনিধির সংখ্যা দশ জন করার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। বাংলা দেশে সভ্যদের সর্বোচ্চ সংখ্যা স্থির করা হয়েছিল কুড়ি। নির্বাচনের নীতি এভাবে অনিচ্ছা সত্ত্বেও গৃহীত হয়েছিল, তবে নির্বাচিত ব্যক্তিগণ কেবলমাত্র সরকারী মনোনয়নের পরই সভায় বসবার অনুমতি পেতেন। নির্বাচক মণ্ডলীর মধ্যে ছিল কিছু সংস্থা, ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটি ইত্যাদি, যেগুলির নির্বাচিত প্রতিনিধির সংখ্যা সীমিত হওয়ার ফলে একটা নীতি নির্বাচিত হয়েছিল যাতে ঘুরে ঘুরে নির্বাচন করবার সুযোগ তাদের নিজেদের মধ্যে আসে।

এটা কিছুই আশ্চর্যের বিষয় নয় যে কংগ্রেসের বড় বড় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি যেমন, সার ফিরোজ শা মেটা, ডব্লিউ. সি. ব্যানার্জি এবং দাদাভাই নওরোজি এই আইনের সোজাসুজি সমালোচনা করেছিলেন। কংগ্রেস অপর পক্ষে এই আইনটি সমর্থন করেছিলেন তবে দুঃখের সঙ্গে, কারণ, "এই আইন জনগণকে পরিষ্কার ভাবে আইন সভায় তাদের নিজেদের

প্রতিনিধি নির্বাচনের অধিকার দেয় নি।"[৪৩] পুনা কংগ্রেস অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে সুরেন্দ্রনাথ নির্বাচিত প্রতিনিধি সংখ্যা বৃদ্ধির উপর জোর দিয়েছিলেন, কেননা তিনি অনুভব করেছিলেন সেটা ১৮৯২ সালের আইনকে অল্প একটু অদল বদল করে নিলেই সম্ভব। বাজেট আলোচনা সম্পর্কে সভ্যদের নিয়ন্ত্রণকে সুরেন্দ্রনাথ বলেছিলেন যে এটা একটা "সর্বতোভাবে অনাবশ্যক বাধা।"

১৮৯২ সালের সংস্কারকে সুরেন্দ্রনাথ অবশ্য এক হিসেবে প্রশংসা করেছিলেন। এর কারণ এই যে নির্বাচকমণ্ডলী কোনো সাম্প্রদায়িক স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করতেন না। এটা ঠিক যে ১৯০৯ সালের মর্লি-মিণ্টো সংস্কারের মধ্য দিয়েই সাম্প্রদায়িক নির্বাচক মণ্ডলীর সৃষ্টি করা হয় এবং এভাবে মুসলমানদের সঙ্কীর্ণ স্বার্থপরায়ণতা সৃষ্টিতে সাহায্য করা হয়।

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে সুরেন্দ্রনাথ বাংলাদেশের আইন সভার সদস্য হন কলকাতার করপোরেশন থেকে নির্বাচিত হয়ে। তিনি ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের নির্বাচন-নীতি গৃহীত হওয়ার পর থেকেই এর একজন সভ্য হয়েছিলেন এবং বরাবর তাই ছিলেন। তাঁর সঙ্গে দু'জন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন, এঁরা হলেন বাবু কালীনাথ মিত্র এবং বাবু জয় গোবিন্দ লাহা, পৌর ব্যাপারে দুজনেই ছিলেন পোক্ত। সংস্কার প্রাপ্ত আইন সভায় এভাবে নির্বাচিত হয়ে সুরেন্দ্রনাথ কলকাতা করপোরেশনের প্রথম প্রতিনিধি হন। তিনি ১৮৯৩ থেকে ১৯০১ সাল, এই আট বছর কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন। তিনি করপোরেশন থেকে দ্বিতীয় বার নির্বাচিত হন এবং তৃতীয় ও চতুর্থ বার নির্বাচিত হন মিউনিসিপ্যালিটি এবং প্রেসিডেন্সী ডিভিশনের জেলা বোর্ড সমূহ থেকে। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে যখন ঢাকা বিভাগ থেকে প্রতিনিধি পাঠানোর সুযোগ এল এবং সুরেন্দ্রনাথের নির্বাচিত হবার কোনো সম্ভাবনাই ছিল না, তখন লেফ্‌টেন্যাণ্ট গভর্নর তাঁর অবাধ ক্ষমতা প্রয়োগ করে সেবারে প্রেসিডেন্সী বিভাগ থেকেই প্রতিনিধি পাঠানোর সুযোগ দিলেন যাতে সুরেন্দ্রনাথের নির্বাচন আবার সুনিশ্চিত হয়। সরকার তখন

৪৩। হাউ ইণ্ডিয়া রট্ হার ফ্রীডম—অ্যানি বেসান্ত

সুরেন্দ্রনাথের পক্ষে সভাতে থাকা খুব জরুরী ব্যাপার মনে করেছিলেন, কেননা তখন কলকাতা মিউনিসিপ্যাল বিলটি উত্থাপিত হয়েছে।

কলকাতা করপোরেশন এবং বাংলাদেশের কোনো কোনো স্থানীয় সমিতির সঙ্গে সুরেন্দ্রনাথের সম্পর্ক ছিল নিবিড় এবং দীর্ঘ। সিভিল সার্ভিস প্রশ্নের মত নির্বাচনমূলক এবং সরকারী বাধা-মুক্ত স্থানীয় স্বায়ত্ত্ব শাসন প্রশ্নটি প্রচণ্ড উন্মাদনার সঙ্গে তাঁর জীবনকে আবেগমণ্ডিত করেছিল, আর এই লক্ষ্য পূর্ণ করবার জন্য তিনি প্রচণ্ড লড়াই করেছিলেন। আগেই বলা হয়েছে, তিনি বিশ্বাস করতেন যে স্থানীয় স্বায়ত্ত্ব শাসন হল জাতীয় স্বায়ত্ত্ব শাসনের দিকে প্রথম পদক্ষেপ। তিনি যখন কাউন্সিলের সভ্য ছিলেন তখন প্রচণ্ড জরুরী দুটি কার্যসূচী কাউন্সিলের সামনে উপস্থিত হয়—সে দুটি হল, বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল আইন সংশোধন এবং ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল আইনের সম্পূর্ণ সংশোধন। যে ভাবে তিনি বাংলাদেশের স্বায়ত্ত্ব শাসনকে সরকারী বাধার দ্বারা নিষ্ফল এবং নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টাকে বাধা দিয়েছিলেন তা এখন ইতিহাসের বিষয়বস্তু।

যদিও দুজন উদারচেতা বড়লাট, লর্ড মেয়ো এবং লর্ড রিপন ভারতবর্ষের পৌর ক্ষেত্রে সুন্দর একটা আবহাওয়া এনেছিলেন কিন্তু স্থানীয় স্বায়ত্ত্ব শাসন প্রায়ই, ভারতবাসীদের প্রতি আন্তরিক অবিশ্বাসসম্পন্ন আমলাদের কাজের এলে নিষ্ঠুরভাবে আঘাত পেত। বাংলাদেশের আইন পরিষদে উপরে উল্লিখিত দুটি বিল-এর উৎপত্তি বুঝতে গেলে এই ঘটনাটি মনে রাখা প্রয়োজন। লর্ড রিপন, যাঁকে সঠিকভাবে ভারতবর্ষের স্থানীয় স্বায়ত্ত্ব শাসনের সৃষ্টিকর্তা বলা হয় এইসব ব্যাপার তাঁর ধারণার বাইরে ছিল। বেঙ্গল মিউনিসিপাল আইনটি ছিল সোজাসুজি প্রতিক্রিয়াশীল। যাতে মিউনিসিপ্যালিটিগুলি তাদের নিজেদের চেয়ারম্যান নির্বাচন করতে না পারে এবং কমিশনারগণের পক্ষে একটি মিউনিসিপ্যালিটির বিভিন্ন অংশগুলির ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব না হয় সেই উদ্দেশ্যেই এই আইন তৈরী করা হয়েছিল। অপর কথায়, সরকার, আইনসঙ্গত ভাবে মিউনিসিপ্যালিটিগুলিকে যে অধিকার দেওয়া হয়েছে তা বাতিল করতে চেয়েছিল। সুরেন্দ্রনাথ এই সরকারী ঔদ্ধত্বের বিরুদ্ধে দারুণ সংগ্রাম

করেছিলেন। তিনি খবরের কাগজে এবং মঞ্চে প্রতিবাদ করেছিলেন, কিন্তু এ সবই বৃথা হয়েছিল। নিরাশ না হয়ে তিনি এমন একটি অসাধারণ কাজ করলেন যা সম্ভবত অন্য কোনো রাজনৈতিক নেতা করবার কথা চিন্তা করতেন না। তিনি ইংল্যাণ্ডে হিউমকে একটা বড় চিঠি লিখে জানালেন যে তিনি যেন লর্ড রিপনকে ঘটনাগুলো জানান—লর্ড রিপন তখন বৃটিশ মন্ত্রীসভার একজন সভ্য, এবং যাঁর কর্মকে আমলাতন্ত্র ঐ বিলের সাহায্যে দুষ্ট বুদ্ধি প্রণোদিত হয়ে ধ্বংস করতে বদ্ধ পরিকর হয়েছিল। লর্ড রিপন সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপারটা লর্ড কিম্বারলিকে জানালেন—তিনি ছিলেন তখন ভারতসচিব। হঠাৎ একদিন বাংলাদেশের লেফটেন্যাণ্ট গভর্নর সার চার্লস এলিয়ট, যিনি ঐ প্রতিক্রিয়াশীল বিলটির উদ্যোক্তা ছিলেন, কাউন্সিলে এসে ঘোষণা করলেন যে, যে সমস্ত ব্যাপারে আপত্তি করা হয়েছে বিল থেকে তা বাদ দেওয়া হল। বাংলার মফঃস্বল অঞ্চলের স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলির স্বার্থ এইভাবে সুরেন্দ্রনাথের এক অসমসাহসিক কৌশলের ফলে রক্ষা পেল।

তবে এর চাইতে বড় রকমের যুদ্ধ তখন সুরেন্দ্রনাথের জন্য অপেক্ষা করছিল, সেক্ষেত্রে সরকারের বদলে তাঁকেই পরাজয় স্বীকার করতে হয়। যেটা ম্যাকেঞ্জি বিল নামে পরিচিত সেই বিষয়ের ব্যাপার এটা। এই বিলটি প্রণয়ন করেছিলেন সার আলেকজেণ্ডার ম্যাকেঞ্জি যিনি বাংলাদেশে লেফটেন্যাণ্ট গভর্নর হিসাবে সার চার্লস এলিয়টের পরে যোগদান করেন। সার আলেকজেণ্ডারের স্থানীয় স্বায়ত্ত্ব শাসন প্রতিষ্ঠানগুলির উপর ছিল গভীর অবিশ্বাস। তিনিই বলেছিলেন যে কলকাতা করপোরেশন হল বক্তৃতার এবং বিলম্বের একটা অস্ত্রাগার। সংশোধনী বিলটিতে চেয়ারম্যান, যিনি সরকারের লোক, তাঁকে স্বাধীন কাজকর্ম করবার ক্ষমতা দিয়ে করপোরেশনের শ্রেষ্ঠত্ব কমিয়ে আনবার চেষ্টা করা হয়েছিল। কলকাতা করপোরেশনের গণতান্ত্রিক ধারাকে এভাবে বিকলাঙ্গ করা ছিল এর উদ্দেশ্য, ফলে শহরে ব্যাপক অসন্তোষ দেখা দেয়। দু'বছর ধরে বিলটিকে নিয়ে অ্যাসেম্ব্লিতে বিতর্ক হয় তারপর সেটাকে সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানো হয় সেখান থেকে বিলটি প্রায় অপরিবর্তিত অবস্থায় ফিরে আসে।

তৎকালীন বড়লাট লর্ড কার্জন জন-নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সংখ্যা কমিয়ে সরকার মনোনীত প্রতিনিধিদের সমান করে দেবার হুকুম দিলেন, ফলে স্থানীয় স্বায়ত্ত্ব শাসনের উপর শেষ আঘাত হানা হল। যেহেতু চেয়ারম্যান ছিলেন সরকারী লোক, সেহেতু সর্বদাই জন-নির্বাচিত প্রতিনিধিদের চাইতে সরকারী দল ভারী হয়ে থাকল। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে বিলটি গৃহীত হয় এবং ১৯০০ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাস থেকে এটি চালু হয়। সিলেক্ট কমিটির সভ্য হিসেবে সুরেন্দ্রনাথ এই বিলটির বিরুদ্ধে খুব কঠোর এবং তীব্র সংগ্রাম করেন। কিন্তু সরকার তবু অবিচল রইলেন। বিলটিকে সংশোধন বা রদ করতে না পেরে সুরেন্দ্রনাথ ২৭ জন কমিশনারসহ প্রতিবাদে করপোরেশনের কমিশনারের পদ থেকে ইস্তফা দেন। কিন্তু বাইরে থেকে তিনি করপোরেশন আমলাতান্ত্রিক হওয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যান এবং শেষ পর্যন্ত বহুকাল বাদে তিনি মন্ত্রী হবার পর এই অবস্থার অবসান ঘটান। এইটিই ছিল সরকারী স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে প্রথম অহিংস এবং নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন, পরে যা বয়কট আন্দোলনের রূপ নেয়। এই আন্দোলনের জন্য পরিশ্রম এবং চাপের ফলে সুরেন্দ্রনাথের মস্তিষ্ক জ্বর হয়। তিনি যে সমস্ত মারাত্মক অসুখে ভুগেছিলেন এটা ছিল সেগুলোর মধ্যে অন্যতম, এবং এই অসুখ থেকে পরিত্রাণ পেতে অনেক সময় লেগেছিল।

স্থানীয় স্বায়ত্ত্ব শাসন নিয়ে আন্দোলনটি আর সংকীর্ণ রইল না, এটি সর্ব ভারতের আন্দোলন হয়ে দাঁড়াল। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজ কংগ্রেস অধিবেশনে কলকাতা করপোরেশন এবং বোম্বাই সিটি ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্টের ব্যাপারে সরকারের প্রতিক্রিয়াশীল নীতির বিরুদ্ধে প্রস্তাব গৃহীত হয়। এর পরের বছরে কংগ্রেসে "কলকাতা মিউনিসিপ্যাল আইন এবং বোম্বাই এর লেজিস্‌লেটিভ কাউন্সিলে ঐ একই রকম আইন প্রণয়নের ব্যবস্থাদি গ্রহণের জন্য সরকারের প্রতিক্রিয়াশীল নীতি যা স্থানীয় স্বায়ত্ত্ব শাসনের পরিপন্থী" তার বিরুদ্ধে একই রকম প্রস্তাব গৃহীত হয়……[৪৫] এই প্রস্তাব উথাপন করে সুরেন্দ্রনাথ বলেছিলেন এর

৪৫। হাউ ইণ্ডিয়া রট হার ফ্রীডম, অ্যানি বেসান্ত কৃত

আগের কংগ্রেস অধিবেশনে যে আশা করা হয়েছিল যে লর্ড কার্জন বর্তমান প্রতিক্রিয়াশীল নীতির পরিবর্তন করবেন, সে আশা পূর্ণ হয়নি। কেমন করে কলকাতার পৌর অধিকারগুলিকে ধ্বংস করা হয়েছে, কিভাবে শাসক এবং শাসিতের মধ্যে বিরাট ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছে সেগুলির উপর জোর দিয়ে তিনি বলেন: "তাদের নীতিতে প্রতিক্রিয়া, মতামতে প্রতিক্রিয়া, সর্বত্র প্রতিক্রিয়া, প্রতিক্রিয়ার হুকুম মতই সমস্ত চলছে······যে অদম্য শক্তির সঙ্গে প্রগতি আন্দোলন অগ্রসর হচ্ছে তারা তাকে আনন্দের সঙ্গে প্রতিহত করবার চেষ্টা করছে।"[৪৬]

১৮৯৩ এর ঘটনাবলীতে ফিরে যাওয়া যাক। ঐ বছরের ২রা জুন তারিখে বৃটিশ হাউস অব কমন্সএ হারবার্ট পল কর্তৃক প্রস্তাবিত, ইংল্যাণ্ডে এবং ভারতবর্ষে একই সময়ে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা গ্রহণ করার নীতি গৃহীত হয়। ঐ সময় দাদাভাই নওরোজি পার্লামেণ্টের একজন সভ্য ছিলেন এবং তিনিই ছিলেন ঐ প্রস্তাবের অন্তর্নিহিত শক্তি। সরকার পরাজিত হবেন তা ভাবেন নি, ফলে শক্তি সমাবেশও ঘটানো হয়নি, এদিকে দাদাভাই এই নিয়ে ভেতরে ভেতরে খুব কাজ করে গেছেন। বৃটিশ আমলারা এই বোমার আঘাতে হতবুদ্ধি হয়ে পড়লেন। ভারত সচিব এটিকে আকস্মিক ভোট নেওয়া হয়েছে এবং এতে সমগ্র পার্লামেণ্টের মত নেই এই অজুহাতে বাতিল করতে চেয়েছিলেন। ভারতের কর্তৃপক্ষের মতামত এ ব্যাপারে চাওয়া হল। মাদ্রাজ ছাড়া সমস্ত প্রাদেশিক সরকারই এর বিরোধিতা করলেন। অতএব এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য ভারতবর্ষের আমলাদের দ্বারা ব্যর্থ হয়ে গেল। এই প্রসঙ্গে সার অ্যাণ্টনি ম্যাকডনেল, যিনি তখন বাংলার লেফটেন্যাণ্ট জেনারেলের বিকল্প হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন, সুরেন্দ্রনাথকে ডেকে পাঠিয়ে জিজ্ঞেস করলেন কেন তিনি দুজায়গায় পরীক্ষার ব্যবস্থা করবার জন্য এত আগ্রহী। সুরেন্দ্রনাথের উত্তর ছিল যেমন জোরালো তেমন সোজাসুজি। তিনি বলেছিলেন, "কারণ,···আমরা মনোনয়নের প্রতি আস্থা সম্পূর্ণ হারিয়েছি·····আমি আবার বলছি,

৪৬। হাউ ইণ্ডিয়া রট হার ফ্রীডম্

সরকার কর্তৃক মনোনয়ন আমাদের সন্তুষ্ট করতে পারে না, পারবে না।" তৎকালীন সরকারী নীতিগুলির এটা হল যথাযথ বিরোধিতা।

১৮৯৪ সালে মাদ্রাজ কংগ্রেস অধিবেশনে সুরেন্দ্রনাথ আবার একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন, যেটি সম্পর্কে অ্যানি বেসান্ত বলেছিলেন, "একই সঙ্গে পরীক্ষা গ্রহণের সেই চির নবীন বিষয়।"[৪৭] এটিতে তিনি সমান ব্যবহার করার বৃটিশ অঙ্গীকার কেমন করে ভাঙ্গা হয়েছে তা স্পষ্ট করে দেখিয়ে দেন। যে দুটি বিষয়ে তিনি খুব দৃঢ়ভাবে লেগেছিলেন সেগুলি হল উচ্চ পদে ভারতীয়দের আরোও বেশি সুযোগ পাওয়া এবং প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি। এটা তাঁর বিশ্বাস ছিল যে, "যদি আমাদের উপর আইন করবার, অর্থনীতি এবং শাসন পরিচালনার ভার দেওয়া হয়, এবং সেগুলো আমাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নির্ধারিত নীতি অনুসারে করা হয়, তাহলে আমরা সত্যিকারের স্বরাজ পাব, এবং আমাদের শক্তি এবং সুবিধেগুলিকে বাড়িয়ে তুলে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মধ্যে আইন সঙ্গত স্থান করে নেব।"[৪৮]

মাদ্রাজে সুরেন্দ্রনাথকে একটা ছাত্রসভায় বক্তৃতা দিতে নিমন্ত্রণ জানানো হয়। আলোচনার বিষয় ছিল, ছাত্রদের রাজনীতিতে যোগ দেওয়া উচিত কিনা। সুরেন্দ্রনাথ এই আলোচনায় যোগ দেন এবং বলেন, "ছাত্ররা নিশ্চয় রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করবে, এমনকি ঠিকমত নিয়ন্ত্রিত ভাবে এবং পরিচালনায় রাজনৈতিক কাজেও তাদের যোগ দেওয়া উচিত।"[৪৮] পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য তাঁর বিরোধিতা করেন। এখানে স্মরণ থাকতে পারে যে সুরেন্দ্রনাথ কলকাতার ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে যোগ দিতে অস্বীকার করেছিলেন কেন না ছাত্রদের সেখানে রাজনৈতিক আলোচনা করা নিষিদ্ধ ছিল। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে রাজনীতি থেকে ছাত্রদের সরিয়ে রাখা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। ছাত্রদের ভাল হোক মন্দ হোক রাজনীতি থাকবেই, আর তাদের ভাল রাজনীতিতে, ঠিকমত

৪৭। হাউ ইণ্ডিয়া রট হার ফ্রীডম্

৪৮। এ নেশন ইন মেকিং

উপায়ে শিক্ষা দেওয়াই হল বুদ্ধিমানের কাজ। কিন্তু তিনি যুবকদের পক্ষে গুণ্ডামি এবং নিয়ম না মেনে চলার বিরোধিতা করেছেন সব সময়েই। তিনি বলেছিলেন যে নিয়মানুবর্তিতা হল ছাত্রদের জীবনের আত্মার মত। এমন কি সেই সময়েও তিনি লক্ষ্য করেছিলেন নিয়ম না মেনে চলার ঝোঁক আমাদের ঘরে এবং শিক্ষাক্ষেত্রে ধীরে ধীরে প্রবেশ করছে এবং তিনি কেবল আশা করতেন যে এটা নিতান্তই সাময়িক ব্যাপার। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁর এই আশা পূর্ণ হয়নি।

## দশম অধ্যায়

## কংগ্রেস সভাপতিরূপে

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে পশ্চিম ভারতের সর্বপ্রকার জন আন্দোলনের মহান নেতা মহাদেব গোবিন্দ রানাডে সুরেন্দ্রনাথকে কংগ্রেসের পুনা অধিবেশনের সভাপতি হতে নিমন্ত্রণ পত্র পাঠান। তিনি সেই সম্মান গ্রহণ করলেন। ঐ পুনা কংগ্রেস অধিবেশন পরে "সর্ববাদী সম্মতভাবে, সবচেয়ে চমৎকার অধিবেশন" হয়েছিল।[৪৯] সেই সময়ে কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচিত হতেন না; অভ্যর্থনা সমিতির ছিল পছন্দ করে নেবার ভার। সম্ভবত কংগ্রেসের সভাপতিত্ব নিয়ে ১৯০৬ সালে প্রথম স্পষ্ট বিবাদ সুরু হয় যার ফলে পরের বছর চরম এবং নরম পন্থী এই দুই দলে কংগ্রেস ভাগ হয়ে যায়।

যদিও তিনি বহুবিধ কাজকর্মে লিপ্ত ছিলেন, যেমন অধ্যাপনা, সাংবাদিকতা এবং করপোরেশনের কাজ, সুরেন্দ্রনাথ হৃদয় এবং আত্মা দিয়ে সভাপতির অভিভাষণ তৈরী করেছিলেন, যে অভিভাষণ বাগ্মিতার সৌন্দর্যে ধ্রুপদী হয়ে রয়েছে। প্রতিদিন দিনে দু ঘণ্টা করে এক নাগাড়ে ছসপ্তাহ ধরে তিনি অসাধারণ পরিশ্রম করে ঐ বিরাট অভিভাষণটি শেষ করেন।

সুরেন্দ্রনাথকে সভাপতির আসনে আহ্বানের প্রস্তাব করেছিলেন আনন্দ চারলু, ঐ প্রস্তাবকে সায় দেন এবং সমর্থন করেন, যথাক্রমে ডক্টর বাহাদুরজী এবং আর. এন. মাধোলকার। কংগ্রেসের রিপোর্টে বলা

৪৯। রিপোর্ট অব দি পুনা কংগ্রেস, ১৮৯৫

হয়েছে : "কংগ্রেসের মঞ্চে মিস্টার ব্যানার্জি ছিলেন সবচেয়ে প্রিয়। ভারতের বক্তাদের মধ্যে প্রথম স্থান হল তাঁর।"[৫০] ডক্টর বাহাদুরজী তাঁর সম্বন্ধে বলেছিলেন, "জনগণের প্রকৃত লোক ইনি, দেশ এঁকে আনন্দের সঙ্গে সম্মান দেখাবে।"[৫১]

এই অধিবেশনের সভাপতি হিসাবে সুরেন্দ্রনাথ স্মৃতি থেকে, কোনরকম কাগজপত্র না দেখে, অসাধারণ বক্তৃতাটি করেন, এই সময় পাঁচ হাজার লোক তাঁর বক্তৃতায় মুগ্ধ হন। "সভাপতির প্রারম্ভিক অভিভাষণ সব দিক দিয়েই তাঁর উপযুক্ত এবং সময়োপযোগী হয়েছিল। বক্তার কণ্ঠস্বর, পরিষ্কার, সুরেলা এবং শক্তিশালী এবং তাঁর উত্তেজক এবং মনে দাগ কাটে এমন বলার ভঙ্গী, যা পুরো তিন ঘণ্টা ধরে তিনি বলেছিলেন এটা একটা অসাধারণ ব্যাপার—মানুষের বাচন শিল্পের চরম পরাকাষ্ঠা।"[৫২] তিনি পুনাতে প্রচণ্ড অভ্যর্থনা পেয়েছিলেন – জাতির প্রতি তাঁর কৃতকর্মের জন্য এটা ছিল তার অভিব্যক্তি। একজন স্কুল শিক্ষক এবং আন্দোলনকারীকে তাঁর প্রদেশের বাইরের লোকে যে এমন ভাবে সম্মানিত করেছে এটা ভেবেই তিনি বিশেষভাবে খুশী হন।

সুরেন্দ্রনাথ তাঁর আত্মজীবনীতে স্মরণ করেছেন কেমন করে শ্রোতারা তাঁর পূর্ব লিখিত শেষ অংশটুকু পড়া সুরু হবার আগে অদ্ভুত আবেগের বিদ্যুতে কেঁপে উঠেছিল। তখন একজন বক্তা আর শ্রোতাদের প্রেরণা জোগাচ্ছিলেন না, সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থা তখন বিরাজ করছিল। সুরেন্দ্রনাথ সেই জনতার প্রচণ্ড আবেগে এমন উৎসাহিত হয়েছিলেন যে তিনি তাঁর পূর্ব লিখিত বক্তৃতাটি ফেলে দিয়ে সোজাসুজি বক্তৃতা শুরু করেন। ঐ বক্তৃতাটি তাঁর মহান দেশ প্রেমের সাক্ষী, ভারতের জাতীয়তাবাদের প্রতি তাঁর প্রাণকে সম্পূর্ণভাবে উৎসর্গ করার প্রমাণ। তিনি

৫০। রিপোর্ট অব দি পুনা কংগ্রেস, ১৮৯৫
৫১। ঐ
৫২। ঐ

ঘোষণা করেছিলেন : "যদি আমি এই মুহূর্তের জন্য, কেবল এই টুকুর জন্য বেঁচে থাকতাম এবং তারপর আমার মৃত্যু হত, তাহলে আমি নিজেকে সমস্ত মানুষের চাইতে সুখী বলে গণ্য করতাম। আমি জানি আপনারা চান আমি দীর্ঘজীবী হই। এটা দীর্ঘজীবন হবে কিংবা হবে না আমার জানা নেই, সে যাই হোক না কেন আমি সর্বশক্তিমান ভগবানকে এই ঘোষণার সাক্ষী করতে চাই যে ·····এই পবিত্র প্রতিজ্ঞা আমি এখানে উপস্থিত ভারতবর্ষের চোখের সামনে করছি যে আমার এই প্রাণকে ভবিষ্যতে আপনাদের সেবার জন্য উৎসর্গ করলাম। হ্যাঁ, আমার প্রাণ উৎসর্গীকৃত হবে সেই সব আশা, প্রচেষ্টা, ধারণার রূপ দেবার জন্য যে বাণী আমার দেশের ঐক্যময় মহিমা থেকে উচ্চারিত হয়েছে।"[৫৩] এই মহা বক্তৃতার পর অপেক্ষাকৃত তরুণ বয়স্কেরা মঞ্চের দিকে ছুটে আসে তাঁর পায়ের ধূলো নেবার জন্য।

এই বক্তৃতার সংক্ষিপ্ত আলোচনা এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক হবে। কিছু ইংরিজী খবরের কাগজে এই কথাটা বাঁকাভাবে ইঙ্গিত করেছিল যে হিন্দু সর্ব দেবতার মন্দিরে কংগ্রেস নিজে স্থান করে নিয়েছে। সুরেন্দ্রনাথ জোরের সঙ্গে বলেছিলেন, "কংগ্রেস হচ্ছে যুক্ত ভারতের, এ হচ্ছে হিন্দুর, মুসলমানের, খৃষ্টানের, পারসীর, শিখের······এখানে আমরা দাঁড়িয়েছি একটা সাধারণ মঞ্চে, এখানে আমরা সকলে আমাদের সামাজিক এবং ধর্মীয় পার্থক্যকে ঘুচিয়ে দিয়েছি।" বাস্তবিক, কংগ্রেস তার সমস্ত জীবনের স্বপ্ন, যুক্ত ভারতের এবং ধর্মনিরপেক্ষ ভারতের প্রতিনিধি হয়েছে, এখানে সাধারণ জাতীয়তাবোধের বা সাধারণ রাজনৈতিক আদর্শের পথে চলতে গেলে ধর্ম বাধা হয়ে দাঁড়ায় না।

১৮৯২ খৃষ্টাব্দের ইণ্ডিয়ান কাউন্সিলস আইনকে সুরেন্দ্রনাথ প্রচণ্ড বিরোধিতা করলেন। "বাংলাদেশে সাত জন নির্বাচিত লোক সাত কোটি লোকের সমাজের শক্তি এবং প্রাণবন্ততার প্রতিনিধি হয়েছেন।" তিনি

৫৩। রিপোর্ট অব দি পুনা কংগ্রেস, ১৮৯৫

বলেছিলেন। গ্ল্যাডস্টোন যে বলেছিলেন "প্রাণময় প্রতিনিধি" এ কি সেই ? তিনি আইন সংস্কার এমন ভাবে করতে বললেন যাতে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সংখ্যা বাড়ানো যায়। ঐ রকম ভাবে তিনি বাজেটের আলোচনায় সভ্যদের উপর আরোপিত বাধা নিষেধকে বললেন, "অপ্রয়োজনীয়।"

ভারতের অর্থনীতি সম্পর্কে খুব ভাল জ্ঞান থাকায়, সুরেন্দ্রনাথ সরকারের অর্থ বাইরে পাঠানোর নীতি ফাঁস করলেন। "এটা বলা অত্যুক্তি হবে না যে ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা হল পৌনঃপুনিক ঘাটতি এবং ক্রমবর্ধমান ঋণ।" এবং এটা তিনি সরকারের "আক্রমণাত্মক অর্থনীতি''র ফলে ঘটেছে বললেন। এই নীতি কেবল যে "ভারতের অর্থনীতির পক্ষে ধ্বংসকারী" তা নয়. "আমাদের শাসকেরা এই নীতি অবাধ উৎসাহের সঙ্গে মেনে চলছেন।" তিনি চিত্রল অভিযানকে উল্লেখ করেছিলেন এবং উদাহরণ দিয়ে দেখিয়েছিলেন কেমন ভাবে এই সব দুঃসাহসিক অভিযানের ফলে ভারতবর্ষের ঘাড়ে আরো বেশি অর্থনৈতিক দায়িত্ব এসে পড়ে এবং ভারতবর্ষ দেউলিয়ার পথে যায়।

বৈজ্ঞানিক সীমান্ত সন্ধানের ব্যাপারে তিনি বলেছিলেন : "অসংখ্যবার আমরা কংগ্রেসে জমায়েত হয়েছি ··সরকারের অতিরিক্ত বেশি যুদ্ধে ব্যয় করার প্রতিবাদ করেছি···বৈজ্ঞানিক সীমান্তটি কেবলই, যত আপনারা এগুতে থাকেন তত তা আলেয়ার মত পিছিয়ে যেতে পারেনা।······ রাশিয়ানদের আক্রমণের বিরুদ্ধে সত্যিকারের বৈজ্ঞানিক সীমান্ত কোনো দূরের দুর্গম. অনাবিষ্কৃত পাহাড়ে অবস্থিত নয়, তার স্থান হাউস অব কমন্স এও নয় - এমন কথা কেউ যেমন বলে থাকেন, এটি রয়েছে কৃতজ্ঞ এবং প্রভুভক্ত সন্তুষ্ট লোকেদের অন্তঃকরণের গভীরে।'' তিনি গর্জন করে বলেছিলেন : "আমরা পূর্বে ইংল্যাণ্ডের হয়ে যুদ্ধ করেছি আমাদের রক্ত এবং ধন দিয়ে। আবিসিনিয়ার যুদ্ধে আমাদেরই যুদ্ধ করতে হয়েছে, রক্তপাত হয়েছে, ভারতবর্ষের সরকার করেছে খরচ আর তার সাহসী

সৈনিকেরা দিয়েছে প্রাণ বিসর্জন।'' মধ্য এশিয়া নীতিটি কেবলমাত্র ভারতবর্ষের স্বার্থে হয়নি, এটি ইউরোপীয় এবং এশিয়ার শক্তি হিসেবে গ্রেট বৃটেনেরও স্বার্থে হয়েছিল। তাহলে কেন ঐ বিপুল ব্যয় ভারতবর্ষের অর্থ ভাণ্ডার থেকে হবে ?

ইংল্যাণ্ডের খরচ সম্পর্কে, যাঁর নামে ভারতের অর্থকোষ থেকে অর্থ ক্রমাগত বাইরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তাঁর সমালোচনা ছিল নির্দয়ভাবে কঠোর। তিনি বলেছিলেন, "ইংল্যাণ্ডের খরচ হিসেবে যে অর্থ প্রচণ্ডভাবে বেরিয়ে যায় তার ফলে দেশের ক্রমবৃদ্ধিমান দৈন্যের বোঝা আরো ভারি হয়।''

সুরেন্দ্রনাথ, বৃটিশ এবং ভারতীয় বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতদের সংখ্যাতত্ত্ব উদ্ধৃত করে প্রমাণ করেন ভারতবর্ষের দৈন্য অতি প্রচণ্ড, তিনি ভারতবর্ষের বারংবার দুর্ভিক্ষের দিকে, যে দুর্ভিক্ষের ফলে একজন সাধারণ ভারতীয়কে তার সমস্ত জীবন ধরে কিভাবে ভুগতে হয়, তার অতি ক্ষুদ্র আয় এবং তাকে যে করের ভারি বোঝা বইতে হয় সে সমস্তের দিকে তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি তাঁর দেশের লোকেদের শোচনীয় দুর্দশার অন্ধকারের দিকে জোরালো আলো নিক্ষেপ করে বলেন, "তাহলে এটা কিছুই আশ্চর্যের ব্যাপার নয় যে আমাদের দেশের চার কোটি লোককে একবেলা খেয়ে কাটাতে হয়…।'' ভারতবর্ষের যন্ত্রশিল্প সম্পর্কে তিনি বিশেষ জোরের সঙ্গে বলেন কেমন করে ইংল্যাণ্ডের তুলো এবং পাট শিল্পের স্বার্থে সেগুলোকে পঙ্গু করে রাখার চেষ্টা করা হয়। "আমাদের প্রতিষ্ঠানটি রাজনৈতিক, কিন্তু আমরা আমাদের দেশের যন্ত্র শিল্পের এবং কলে প্রস্তুত দ্রব্যের উন্নতির পথে যে সমস্ত অন্তরায় তার দিকে দৃষ্টি না দিয়ে পারিনা।…তাঁদের বক্তব্যে রয়েছে গভীর জাতীয় গুরুত্ব। সুরেন্দ্রনাথের প্রিয় বিষয়—আরো বেশি ভারতীয়দের চাকুরী দেওয়ার প্রশ্ন, নতুন করে অর্থনৈতিক ন্যায্যতায় অধিষ্ঠিত হল। বিদেশী লোকদের বড় বড় পদে মোটা মাইনে দেবার ফলে যে টাকা ইংল্যাণ্ডে চলে যায় তাতে নিশ্চিত

রূপেই ভারতীয় দৈন্যকে প্রভাবিত করে। এটা হল সুনীতির পরিপন্থী, অর্থনৈতিকভাবে সর্বনাশা এবং রাজনীতিগতভাবে অসুবিধাজনক……।”

ঐ বক্তৃতায় তৎকালীন জনসাধারণের সমস্ত বক্তব্যই তুলে ধরা হয়েছিল, তারমধ্যে ভারতীয়দের সৈন্যবাহিনীতে উচ্চ পদে নিয়োগের কথা এবং বিচার বিভাগ থেকে শাসন বিভাগকে পৃথক করার কথাও ছিল। একটা ব্যাপারে তিনি বিশেষ জোর দেন। ভারতবর্ষের হয়ে ইংল্যাণ্ডে কাজ করার উৎসাহে সুরেন্দ্রনাথ বললেন যে ভারতবর্ষকে ইংল্যাণ্ডের দলগত রাজনীতিতে ঢোকাতে হবে, কেননা একমাত্র তাহলেই ভারতবর্ষের ব্যাপারে বৃটিশ জনসাধারণ, সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল এবং সমবেদনশীল হবে।

ঐ সময়কার বক্তৃতাগুলির মধ্যে এই বক্তৃতাটিকে সবচেয়ে অদ্ভুত রাজনৈতিক বক্তৃতা হিসেবে ধরা হয়। এর মধ্যে ছিল বিপুল তথ্যের সমাবেশ, যুক্তি, বিশ্লেষণ এবং সেই রকম বিপুল রাজনৈতিক আবেগ। অষ্টাদশ এবং উনবিংশ শতাব্দীর রাজনৈতিক বক্তাদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন তাই সুরেন্দ্রনাথের বক্তৃতায় ছিল অলঙ্কারের সমন্বয় আর বেশ কিছু আবেগ। তাঁর সহকর্মীদের অনেকেই যখন একেবারে সাদামাটা বক্তৃতা দিতেন তখন সুরেন্দ্রনাথ অনেক উর্ধে উঠে যেতেন এবং তাঁর সুললিত বক্তৃতা হত প্রেরণাপূর্ণ। তাঁর বলার মধ্যে জাদু ছিল। বড় বড় সভাকে তিনি চমকিত করতেন। কিন্তু তিনি কখনই তথ্যের দৃঢ় ভিত্তি এবং কঠোর রাজনৈতিক বাস্তবতা থেকে দূরে থাকতেন না। তিনি একঘেয়ে তথ্য এবং নীরস বর্ণনাকে কিভাবে অদম্য আবেদনে ভরিয়ে তুলতে হয় তা জানতেন। তিনি তাঁর নিজস্ব তেজ তারমধ্যে সঞ্চারিত করতেন।

সমস্ত বক্তৃতা জুড়ে ইংল্যাণ্ডের প্রতি তাঁর অটল বিশ্বাস এবং শ্রদ্ধা প্রকাশ পায়। তখনকার আমলের অধিকাংশ কংগ্রেসীদের মতো তিনিও ভারতের সঙ্গে বৃটিশের সম্পর্কটিকে ঐতিহাসিক প্রয়োজন বলে মনে

করতেন। এবং তিনি ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অগ্রগতি বৃটিশদের সাহায্যে হবে বলে বিশ্বাস করতেন। তা সত্ত্বেও তিনি বক্তৃতাটিতে ভারতের প্রতি অন্যায় এবং অবিচারের জন্য সরকারের বিরুদ্ধে বলতে ছাড়েননি। সমালোচনাগুলি সংযত এবং পরিমিত হলেও বাক্যে জ্বালা কম ছিল না। অপরাজেয় দেশপ্রেমীর কণ্ঠস্বর রূপ পেল সেই অভিভাষণের ভেতর দিয়ে, একজন আন্দোলনকারীর কণ্ঠস্বর কেঁপে উঠল অশান্ত আবেগে। একথা বলা নিষ্প্রয়োজন যে, বক্তৃতাটি সকলেরই ভাল লেগেছিল, আর উচ্চ প্রশংসা লাভ করেছিল, এমনকি ইংরেজরাও প্রশংসা করেছিলেন সেটি।

সুরেন্দ্রনাথ তাঁর আত্মজীবনীতে তাঁর মন্ত্রমুগ্ধকর বক্তৃতা দেবার ক্ষমতা সম্পর্কে কিছু ইঙ্গিত দিয়ে গিয়েছেন। প্রথমটা হল খুব পরিশ্রমের সঙ্গে প্রস্তুতি ; জন ব্রাইটের মত তিনি বিশ্বাস করতেন যে আগে থেকে প্রস্তুত করা না হলে বক্তৃতা শুনবার মত হয় না। জনসাধারণের কাছে বক্তৃতা দিয়ে সাফল্য লাভ করতে গেলে, তিনি অনুভব করেছিলেন, কেবল বুদ্ধি থাকলেই চলবে না, থাকতে হবে নৈতিক এবং আবেগ সম্পর্কীত প্রেরণা। তাঁর দেশপ্রেম থাকতেই হবে এবং তাঁর অন্তরের অন্তঃস্থলে থাকতে হবে সত্যিকারের প্রবল উৎসাহ। তাঁর চিন্তাগুলি আসবে হৃদয় থেকে এবং পরে হৃদয় তা মস্তিষ্কে পৌঁছে দেবে।

সুরেন্দ্রনাথ তখন জাতির রাজনৈতিক মঞ্চের কেন্দ্রস্থলে এসে পড়েছেন, এবং জাতীয় নেতা বলতে যা বোঝা যায় তা তিনি হয়ে পড়েছেন পুরোপুরি। তিনি ১৯০২ সালে আহমেদাবাদে আবার কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি সভাপতি হন বা না হন, "সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি বছরের পর বছর কংগ্রেসের মধ্যে সবচেয়ে বড় নেতা ছিলেন।"[৫৪]

---

৫৪। ইণ্ডিয়ান পলিটিক্স সিনস্ মিউটিনি, চিন্তামণি

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে কলকাতায় কংগ্রেস অধিবেশন হয়। অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যান সেবারে হন সার রমেশ চন্দ্র মিত্র, নানাদিক থেকে তিনি ছিলেন বাংলার জাস্টিস রানাডে। তখন যে দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি দেশে শোনা যাচ্ছিল সে সম্পর্কে সুরেন্দ্রনাথ প্রস্তাব উত্থাপন করেন। সেই প্রস্তাবে বলা হয় যে ক্রমশ ভারতবর্ষ থেকে যে বাইরে তার সম্পদ চলে যাচ্ছে সেজন্য, অতিরিক্ত করধার্য, আয়ের পরিমাণ বেশি ধরা এবং সামরিক এবং অসামরিক খাতে অপ্রয়োজনীয়ভাবে অতিরিক্ত ব্যয় করার ফলেই ভারতবর্ষে বারংবার দুর্ভিক্ষ হয়—প্রায় একই কথা তিনি বলেছিলেন তাঁর পুনা অধিবেশনের বক্তৃতায়। প্রস্তাব উত্থাপন করে তিনি বলেছিলেন যে দুর্ভিক্ষগুলো "আমাদের শাসকদের সাঙ্ঘাতিক ভুলের জন্যই ঘটেছে।" এবং সেই দুর্ভিক্ষগুলি হল "সরকারকে ঠিক পথে যাবার জন্য প্রকৃতির সাবধান বাণী।"[৫৫]

কলকাতা কংগ্রেস অধিবেশনের একটি বিশেষ বিভাগ ছিল একটি যন্ত্রশিল্প প্রদর্শনী। তখন সবে স্বদেশী জিনিস ব্যবহারের ইচ্ছে আস্তে আস্তে অঙ্কুরিত হচ্ছে।

যন্ত্র শিল্পের পথ প্রদর্শকদের মধ্যে একজন, জে. চৌধুরী সুরেন্দ্রনাথের প্রচণ্ড সমর্থন পেয়ে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন। জে. চৌধুরী ছিলেন কলকাতার একজন ব্যারিস্টার এবং সুরেন্দ্রনাথের জামাতা। বাংলার লেফটেন্যান্ট গভর্নর সার জন উডবার্ন প্রদর্শনীটির দ্বার উদ্ঘাটন করতে অস্বীকার করেন একথা বলে যে, এর মধ্যে বেশ রাজনৈতিক গন্ধ আছে। কুচবিহারের মহারাজা এই প্রদর্শনীটির উদ্বোধন করেন। দশ বছর পর তখনকার বড়লাট লর্ড মিণ্টো ঐ একই রকম প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেছিলেন। বৃটিশ শাসকদের কংগ্রেসের প্রতি ধারণার প্রচুর পরিবর্তন হয়েছিল, এবং রাজনৈতিক আবহাওয়া অনুযায়ী সেই পরিবর্তন হত। লর্ড

৫৫। হাউ ইণ্ডিয়া রট হার ফ্রীডম

ডাফরিন এবং লর্ড কনেমারা যথাক্রমে কলকাতা এবং মাদ্রাজের কংগ্রেস অধিবেশনের প্রতি প্রীত ছিলেন, কিন্তু যুক্ত প্রদেশের লেফটেন্যাণ্ট গভর্নর সার অ্যাণ্টনি ম্যাকডনেল কংগ্রেসের ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের লক্ষ্মৌ অধিবেশনের ব্যাপারে খুব অসুবিধেয় ফেলেছিলেন।

# একাদশ অধ্যায়

## নরম জাতীয়তাবাদের যুগ

স্বাধীনতার পূর্বেকার যুগের কংগ্রেসী আন্দোলনকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা যায় : ১৮৮৫ থেকে ১৯০৬, ১৯০৬ থেকে ১৯১৮ এবং ১৯১৮র পরবর্তী সময়। প্রথম দিকে কংগ্রেস নরম জাতীয়তাবাদ বাধা-হীনভাবে গ্রহণ করেছিল, এরই সরব ব্যাখ্যাকার ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ। কংগ্রেসের প্রথম দিকের নেতাদের বৃটিশ উদারতাবাদ এবং ন্যায় বিচার সম্পর্কে ছিল বিরাট বিশ্বাস। ভারতীয় উদারতাবাদীদের বৃটিশ গণতন্ত্রের উপর ছিল অশেষ আস্থা" ভারতীয় উদারতাবাদীরা বৃটিশ প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান থেকে যে সমস্ত সমিতি পার্লামেণ্টারী ধরনের ছিল এবং বৃটেনে সাফল্যের সঙ্গে চলছিল, পশ্চিমের রাজনৈতিক দার্শনিকদের মতবাদ থেকে, বলতে গেলে বলতে হয় পশ্চিমের সমগ্র সংস্কৃতি থেকে খাদ্য সংগ্রহ করেছিল। "ভারতীয় উদারতাবাদ হল বৃটিশ উদারতাবাদেরই ফল।"[৫৬]

ভারতবর্ষের প্রথম মহান উদারচেতা ব্যক্তি হলেন রাজা রামমোহন রায়। তিনি রাজনৈতিক অন্যায় দূর করবার জন্য প্রথমে সংবিধানিক আন্দোলনের নীতিকে গ্রহণ করেন। আমাদের দেশের প্রথম দিকের দেশপ্রেমীরা উদারপন্থায় বিশ্বাসী ছিলেন এবং ইংরেজদের নিরপেক্ষতা সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, এবং তাঁরা এটাও বিশ্বাস করতেন যে যদি ইংরেজদের কাছে নিজেদের অবস্থা এবং দাবি ঠিকমত বোঝাতে পারা যায় তাহলেই ভারতের প্রতি ন্যায় বিচার তাঁরা করবে। তাঁদের অভিযোগ

৫৬। রাইজ অ্যাণ্ড গ্রোথ অব ইণ্ডিয়ান লিবারেলিজম্—এম. এ. বুখ

ঠিক ইংরেজদের বিরুদ্ধে ছিল না, যা ছিল তা ইঙ্গ-ভারতীয়দের আমলা-তন্ত্রের বিরুদ্ধে। তাঁদের উপায়গুলির মধ্যে ছিল দাবী, স্মারকলিপি, আবেদন এবং প্রস্তাব। তাঁদের আন্দোলন বিপ্লবী বা বিধান বহির্ভূত পন্থার পরিপন্থী ছিল। তাঁদের দাবী ছিল : চাকুরীগুলিকে ভারতীয়করণ, মন্ত্রণা সভার বিস্তার, খবরের কাগজের সংখ্যা বৃদ্ধি, সামরিকখাতে ব্যয় কমানো, শাসন বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ পৃথক করা এবং এরকম সব ছোট ছোট সংস্কার। তাঁদের সব চাইতে বড় দাবী ছিল সাম্রাজ্যের ভেতরে থেকেই ঔপনিবেশিক স্বরাজ লাভ। তর্ক উঠতে পারে যে প্রথম দিকে শাসক এবং শাসিতদের মধ্যে সংঘর্ষ এমন পর্যায়ে ওঠেনি যাতে বৈপ্লবিক আন্দোলন ছাড়া চলত না, বা বৈপ্লবিক আন্দোলন প্রয়োজন হত। এরফলে প্রথম দিকের উদারনৈতিকতা বেশ শক্তি পায় এবং তাঁদের ক্রম বৃদ্ধিমান ধারণা হয় যে তাঁদের ছাড়া চলবে না, যত দিন না নতুন শক্তির উদ্ভব হয়ে উদারনৈতিকদের কঠোরভাবে আঘাত করেছিল ততদিন এই রকম ধারণাই ছিল। কিন্তু যখন এরকম শক্তির উদ্ভব ঘটেছিল তখন বেশির ভাগ উদারনৈতিকই তার সঙ্গে মিলিয়ে নিতে না পেরে জাতীয় সংগ্রামের প্রধান প্রবাহ থেকে সরে গেলেন।

হিসেব করে নরমপন্থী মতামত এবং কর্মপন্থা গ্রহণের জন্য প্রথম দিককার কংগ্রেসীদের সম্ভবত কেউ দোষ দেবেন না। এই নরমপন্থা আসলে ছিল ঐতিহাসিক অগ্রগমনেরই একটা অংশ। ডক্টর সীতারামাইয়া বলেছেন, "আসুন আমরা আমাদের গভীর এবং স্থায়ী কৃতজ্ঞতা জানাই সেই সমস্ত মহান ব্যক্তিদের যাঁরা আমাদের আগেকার যুগের প্রগতির বাহক ছিলেন।"[৫৭] তাঁরা যেটুকু করেছিলেন তাকে কোনোক্রমেই কম বলা চলে না। তাঁরা সুদৃঢ় ভাবে তাঁদের পরবর্তীকালের সম্পূর্ণ স্বাধীনতার দাবীর ভিত্তি গড়ে তুলেছিলেন। ঔপনিবেশিক স্বরাজ, সাম্রাজ্যের ভেতর থেকে স্বায়ত্ত্ব শাসন, এবং স্বরাজ—দেশের রাজনৈতিক লক্ষ্যের পথে এ তিনটি ছিল প্রয়োজনীয় ব্যাপার।

৫৭। হিস্টরি অব দি কংগ্রেস

সুরেন্দ্রনাথ ছিলেন ভারতবর্ষের উদারনৈতিক ভাবাপন্নদের মধ্যে একজন, তবে পার্থক্যও ছিল। বৃটিশ সুবিচারের এবং সঠিক ব্যবহারের প্রতি, তাঁরও অনড় আস্থা ছিল এবং তিনি বিশ্বাস করতেন বিবর্তনে, বিপ্লবে নয়। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথের মধ্যে উদারতার চাইতে বড় ছিল দেশপ্রেম। সেই কারণেই নরম পন্থী সহকর্মীদের ভেতরে থেকেও তাঁর স্বাতন্ত্র্য ছিল। আসলে, তাঁর সংবিধানিক আন্দোলনের প্রতি বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও তিনি তাঁর কর্মজীবনের প্রথম থেকেই আন্দোলনকারী ছিলেন এবং বহু বছর বৃটিশ সরকারী মহলে সন্দেহভাজন ছিলেন। একটা সময়ে তাঁকে দ্বীপান্তরে পাঠানোর গুজবও শোনা গিয়েছিল। তিনি কেবল যে জনসাধারণের কাজের জন্য ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম কারাবাস করেছিলেন তাই নয়, সুরেন্দ্রনাথ রাজনৈতিক যুদ্ধে ম্যাকেনজি বিল এবং বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতার জন্য যথাক্রমে কলকাতা করপোরেশন থেকে পদত্যাগ করে এবং বেঙ্গল কাউন্সিলে প্রবেশ না করে তিনি অসহযোগ আন্দোলনকে নীতি হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। স্বদেশী আন্দোলনের সময় তাঁর জনপ্রিয়তা সবচেয়ে বেশি হয়েছিল। সাধারণ লোকের কাছে তিনি সফল জন আন্দোলনের প্রতীক এবং আমলাদের কাছে তিনি ছিলেন অগ্নিবর্ষী আন্দোলনকারী। তিনি নিজে সন্ত্রাসবাদ বা বৈপ্লবিক আন্দোলনে বিশ্বাস করতেন না। তা সত্ত্বেও, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় জন আন্দোলনের ফল, যার মূলে ছিল সুরেন্দ্রনাথের আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব, সন্ত্রাসবাদ ইত্যাদি যথেষ্ট শক্তিশালী হয়েছিল।

ঐ সময় সুরেন্দ্রনাথ যে সমস্ত বড় বড় নেতার সঙ্গে কাজ করেছেন এবং নিবিড় ভাবে যুক্ত ছিলেন, সে সমস্ত নাম ভারত ইতিহাসে এখন পবিত্র। এঁদের মধ্যে সর্বপ্রধান ছিলেন অবশ্যই মহান বৃদ্ধ মানুষটি, দাদাভাই নওরোজি যিনি তিনবার কংগ্রেস সভাপতি হয়েছিলেন। ১৯০৬ সালের সেই বঙ্গভঙ্গের চরম দিনগুলির মধ্যে দাদাভাই নওরোজির সভাপতিত্বে স্বরাজ এবং স্বদেশীর সেই বিখ্যাত প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। এমনকি সেই কংগ্রেস অধিবেশনে, যেখানে নরম পন্থীদের সঙ্গে টিলক বা

অন্য কারুর নেতৃত্বে চরম পন্থীদের সংঘর্ষ সম্ভাব্য ছিল, সেখানে সুরেন্দ্র-নাথের উপস্থিত বুদ্ধির ফলে নরম পন্থীরা রক্ষা পেয়ে যান। তিনি এবং ভূপেন্দ্রনাথ বসু দুজনে সেই মহান বৃদ্ধকে কংগ্রেসের সভাপতি হবার জন্য অনুরোধ করে তার করেন, তাঁরা জানতেন দাদাভাই-এর বিরুদ্ধে যাবার মত সাহস কারুরই হবে না। এই রাজনৈতিক কৌশলে কাজ হয়েছিল। সুরেন্দ্রনাথ নানাভাবে দাদাভাই-এর কাজ করে গিয়েছেন, বিশেষ করে তাঁর ইংল্যাণ্ডের কাজ। সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে দাদাভাই-এর প্রচুর যোগাযোগ ছিল। ওয়েলবি কমিশন, যার সামনে সুরেন্দ্রনাথ সাক্ষী দিয়েছিলেন দাদাভাই তার একজন সভ্য ছিলেন।

রানাডে সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে ইতিপূর্বেই। ভারতের সামাজিক সংস্কারে রানাডের অবদান, তাঁর অর্থনৈতিক চিন্তাধারা এবং ভারতের জাতীয়তাবাদের পরিমাপ করা সহজ নয়, সুরেন্দ্রনাথ তাঁকে পশ্চিম ভারতের সমস্ত জন আন্দোলনের পেছনের শক্তি বলে মনে করতেন। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের পুনা কংগ্রেস অধিবেশনে, কংগ্রেস পাণ্ডালে সামাজিক সভা করা নিয়ে প্রচণ্ড বিতর্কের সৃষ্টি হয়—এর ফলে কংগ্রেসের মধ্যেই ভাঙ্গন দেখা দিতে পারত। রানাডের কৌশল এবং জাতীয়তাবাদের ফলেই তা সম্ভব হয়নি।

১৮৯০ সালে ইংল্যাণ্ডে প্রেরিত কংগ্রেস দলের সদস্যদের মধ্যে সুরেন্দ্রনাথের সহকর্মীদের মধ্যে একজন ছিলেন, তাঁর নাম আর. এন. মাধোলকার। তিনি খুব কঠোর পরিশ্রমী কংগ্রেসী ছিলেন, ১৯১২ সালে তিনি কংগ্রেসের সভাপতি হয়েছিলেন। তিনি ভারতবর্ষের রাজনীতি এবং অর্থনীতির একজন নিপুণ ছাত্র ছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ আমাদের বলেছেন যে তথ্যের উপর তাঁর কর্তৃত্ব, পরিষ্কার ভাবে তা পরিবেশন করা এবং গভীর আন্তরিকতা বৃটিশ জনসাধারণের মনে এক গভীর ছাপ রেখেছিল।

১৮৭৭ সালে সুরেন্দ্রনাথ যুক্ত প্রদেশের কংগ্রেসের অবিতর্কিত নেতা পণ্ডিত অযোধ্যানাথের সংস্পর্শে প্রথম এসেছিলেন তাঁর উত্তর ভারত ভ্রমণের সময়। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে এলাহাবাদে যখন চতুর্থ কংগ্রেস অধিবেশন হয় তখন অযোধ্যানাথের সংগঠনের ক্ষমতা প্রচণ্ড বিরোধিতার মধ্যেও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অযোধ্যানাথ ছিলেন সম্বর্ধনা সমিতির চেয়ারম্যান। সুরেন্দ্রনাথ মেনে নিয়েছিলেন যে এই সহৃদয় দেশপ্রেমিক সমস্ত বাধা দূর করে আমলাতান্ত্রিক বিরোধিতাকে অগ্রাহ্য করে জনগণের ইচ্ছাকে জয়যুক্ত করেছিলেন।

গোখলে সম্পর্কে সুরেন্দ্রনাথের ছিল উচ্চ ধারণা। তিনি তাঁর সম্বন্ধে বলেন, "তিনি ছিলেন তাঁর আমলের সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক নেতাদের অন্যতম।"[৫৮] এবং তাঁর অকাল মৃত্যুতে ব্যথিত হন।

জি সুব্রহ্মণ্য আইয়ার সম্পর্কে বলা হয় তিনি, "আধুনিক মাদ্রাজের সৃষ্টিকর্তাদের একজন।"[৫৯] দুঃখের বিষয় তিনিও কম বয়সে মারা যান। দীনশা ওয়াচা সম্পর্কে সুরেন্দ্রনাথ অসাধারণ হৃদ্যতার সঙ্গে বলেন, "তাঁর ব্যক্তিগত মূল্য এবং জনসাধারণের চরিত্রকে প্রশংসা না করে কোন কথা কেউ তাঁর সম্পর্কে বলতে পারে না।"[৬০] কয়েক বছর ধরে কংগ্রেসকে পেছন থেকে যিনি শক্তি জুগিয়েছেন, সেই ফিরোজ শা মেটা ছিলেন ১৮৯০ সালে ইংল্যাণ্ড যাবার সময়ে সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গী প্রতিনিধিদের একজন। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে ফিরোজ শা মেটা এবং অন্যেরা জোর করাতে সুরেন্দ্রনাথ আমেদাবাদের কংগ্রেস সভাপতি হতে রাজি হন। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের সুরাট কংগ্রেসে মেটা ছিলেন নরম পন্থীদের দলে, আর যখন মঞ্চে চেয়ার এবং চটি ছোড়া হতে থাকে এবং মঞ্চের দিকে বহু লোক ছুটে যায় তখন সুরেন্দ্রনাথ এবং মেটাকে পাহারা দিয়ে নিয়ে যেতে

৫৮। এ নেশন ইন মেকিং
৫৯। ঐ
৬০। ঐ

হয়। কংগ্রেসে যেমন তাঁরা ছিলেন সঙ্গী, এই বিশ্রী পরিবেশেও তাঁরা হলেন সঙ্গী।

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে সুরেন্দ্রনাথ বাংলাদেশ থেকে ইংল্যাণ্ডের রয়্যাল কমিশনে সাক্ষী দেবার জন্য নিমন্ত্রিত হন, এই কমিশনের সভাপতি ছিলেন লর্ড ওয়েলবি, আর এর সভ্যদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন দাদাভাই নওরোজি। এই কমিশনের উদ্দেশ্য ছিল ভারতের খরচ এবং বৃটেন ভারতের মধ্যে অর্থনৈতিক সম্পর্কের ব্যাপারে অনুসন্ধান। আরো যাঁরা নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন বোম্বাই থেকে গোখলে এবং দীনশা ওয়াচা এবং মাদ্রাজ থেকে সুব্রহ্মণ্য আইয়ার। কোনো কোনো সরকারী মহলে এই সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছিল যে সুরেন্দ্রনাথ, যিনি রাজস্ব ব্যাপারের বিশেষজ্ঞ নন, তিনি কি সেখানে কিছু সুবিধে করতে পারবেন। সুরেন্দ্রনাথ ঐ কাজের জন্য খুব জোর প্রস্তুতি চালিয়ে ছিলেন, এবং ঐ ধরনের সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে দেখিয়েছিলেন যে ভারতীয় রাজস্ব ব্যাপারে তাঁর যথেষ্ট দখল ছিল। কমিশনের সামনে তাঁকে প্রায় সমস্ত দিন নানারকম প্রশ্নের জবাব সাফল্যের সঙ্গে দিতে হয়েছিল। জেরা করার সমস্ত সময় ধরে গোখলে সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তিনি সুরেন্দ্রনাথের সাক্ষ্যকে বলেছেন, "চমৎকার।" যদিও দাদাভাই ছিলেন কমিশনের সদস্য, তিনি নিজেকেও জেরা করতে দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। বাস্তবিক সুরেন্দ্রনাথ ভারতীয় রাজস্ব ব্যাপারে কিছু জানতেন না এটা বলা ভুল হবে। পুনা এবং আহমেদাবাদে তাঁর দুটি কংগ্রেস অধিবেশনে সভাপতির ভাষণ ভারতের রাজস্ব ব্যাপারে তাঁর পরিষ্কার ধারণার প্রমাণ এবং ভারতবর্ষ এবং বৃটেনের মধ্যে তৎকালীন রাজস্ব ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক তিনি বিশেষ ভাল করেই জানতেন। এই সম্পর্কটি ছিল ভারতের পক্ষে প্রচণ্ড অসাম্যমূলক এবং অন্যায়। তাঁকে ভারতীয়দের সিভিল সার্ভিস প্রবেশের ব্যাপারে সবচেয়ে কঠোর ভাবে জেরা করা হয়—এই পরীক্ষায় তিনি অসাধারণ সাফল্য লাভ করেন।

সাক্ষী দেবার পর যেটুকু সময় পেতেন তা তিনি জনসভায় বক্তৃতা দিয়ে কাটাতেন। তিনি সাণ্ডারল্যাণ্ড-এ দাদাভাই নওরোজির সঙ্গে একই মঞ্চ থেকে বক্তৃতা দেন।

এরমধ্যে ভারতীয় রাজনৈতিক আবহাওয়া পরিবর্তিত হচ্ছে। উপরে উপরে শান্তভাব থাকলেও ভেতরে ভেতরে নতুন শক্তির, নতুন ভাবের সমাবেশ হচ্ছে এবং চরম পন্থীদের আগমন তখন অত্যাসন্ন হয়ে উঠেছে। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দের সংস্কারগুলো যা কিনা নরম পন্থীদেরও সন্তুষ্ট করতে পারেনি, স্বভাবতই আবেদন নিবেদনের পথের উপর বহু লোকেরই অবিশ্বাস জন্মে গিয়েছিল। ভারতের তরুণ তখন নতুন পথ খুঁজে বার করবার প্রেরণায় বৃটেন কর্তৃক ভারতের উপর আধিপত্যকে বিনা প্রশ্নে, বিনা প্রতিবাদে মেনে নিতে প্রস্তুত ছিল না। এই যুগের সবচেয়ে বড় ঘটনা হল টিলকের অভ্যুত্থান—তিনি এই শক্তির প্রতীক হলেন। তাঁর যেমন ছিল পাণ্ডিত্য তেমনি ছিল অসাধারণ বক্তৃতা দেবার ক্ষমতা, আর তাঁর লেখার ছিল জোর—টিলক ভারতের রাজনৈতিক মঞ্চে নিয়ে এলেন তাঁর প্রতিবাদের মতধারা। তিনি চেয়েছিলেন কংগ্রেস তার চরিত্রকে আরো দৃঢ় করুক। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন রাজনৈতিক অধিকারের জন্য সংগ্রাম করতে হয়, নরমপন্থীদের বিশ্বাস অনুযায়ী বুঝিয়ে সুঝিয়ে তা পাওয়া যায় না। টিলক মহারাষ্ট্রে শিবাজী এবং গণপতি উৎসব সুরু করেন যাতে জনসাধারণের মধ্যে সাহসের, শৃঙ্খলার এবং দেশপ্রেমের এক নতুন ভাবের সঞ্চার হয়। টিলকের লেখা থেকে স্বামী বিবেকানন্দের সাফল্য থেকে এবং থিওসফিক্যাল সোসাইটির কার্যকলাপ থেকে নতুন করে হিন্দু ধর্মের প্রতি আগ্রহ মিশে গেল চরমপন্থী রাজনীতির সঙ্গে। বিশেষ করে মহারাষ্ট্রে এবং বাংলাদেশে এটি ঘটেছিল। এই সময় ৭০ হাজার বর্গমাইল জুড়ে দু'কোটি লোক দুর্ভিক্ষের কবলে, আর তখন ভারত সরকার রাণী ভিক্টোরিয়ার জুবিলীর জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করছে, আর তারই মধ্যে দিয়ে জনসাধারণের দুর্দশার প্রতি প্রচণ্ড অবজ্ঞা স্পষ্ট হয়ে

উঠছে। এই সময়েই বোম্বাইতে বুবোনিক প্লেগ লেগে যায় এবং সরকার প্লেগের বিরুদ্ধে যে সমস্ত কাজ করেন তা অত্যন্ত কঠোর এবং অপমানজনক বলে মনে হয়। এর পরই র‍্যাণ্ড এবং লেফটেন্যাণ্ট আয়ারস্টকে হত্যা করা হয়। এর পর রাজদ্রোহের অপরাধে টিলকের গ্রেপ্তার, পুরনো পচা আইন অনুসারে নাটু ভ্রাতাদের বিনা বিচারে দ্বীপান্তরে পাঠানো আর আতঙ্কজনক আরো যেসব পীড়ন করবার আইন কানুন তৈরী হয়েছিল তার ফলে দেশে বেশ অশান্ত অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। মিসেস বেসাণ্টের মতে প্লেগ মহামারি ও তার পরবর্তী ঘটনাবলীর জন্য চরম পন্থীদের উদ্ভব হয়েছিল।

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে শঙ্করণ নাইয়ার-এর সভাপতিত্বে অমরাবতীতে এই সমস্ত কলঙ্কিত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিত কংগ্রেস অধিবেশন বসে। সুরেন্দ্রনাথের উপর সরকারের বিশেষ ক্ষমতা অনুযায়ী পুরনো অচল আইনকে আবার বাঁচিয়ে তুলবার বিরুদ্ধে প্রস্তাব উথাপনের ভার পড়ে। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন হয় নাটু ভাইদের বিচার করা হক নয়ত তাদের ছেড়ে দেওয়া হক। পুনায় কংগ্রেস সভাপতি হবার সময় তিনি নাটু ভাইদের আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন। প্রস্তাবে সরকারের এই অসাধারণ ক্ষমতার নিন্দা করা হয় এবং বলা হয় যে, যেখানে সরকার এমন আইন প্রয়োগ করতে চান সেখানে সরকার এমন আইন প্রয়োগ করতে চান সেখানে সরকারকে নোটিশ দিতে হবে এবং বিনা বিচারে তিন মাসের বেশি কাউকে বন্দী করে রাখা চলবে না।

কংগ্রেসের অধিবেশনে টিলকের কারামুক্তি সম্পর্কে একটি বিশেষ প্রস্তাব নাকচ হয়ে যায়। কিন্তু "যা কংগ্রেসে পাওয়া গেল না, তা সভাপতি সার শঙ্করণ নাইয়ার এবং সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর বক্তৃতায় উসুল হয়ে গেল [৬১] প্রস্তাবটি উথাপন করে সুরেন্দ্রনাথ বলেন, "টিলকের জন্য আমার হৃদয় সমবেদনায় পূর্ণ। তাঁর কারাগারে আমার হৃদয়ের অনুভূতি গিয়ে

৬১। হিস্টরি অব দি কংগ্রেস, সীতারামাইয়া

পৌঁছচ্ছে। একটি জাতি অশ্রুসজল হয়ে উঠেছে।"[৬২] তাঁর রাজনৈতিক বিরোধী পক্ষ টিলক সম্পর্কে এই মতামত তাঁর উদার মতবাদ এবং গভীর দেশপ্রেমের পরিচয় বহন করে। এটা টিলক সম্পর্কে তাঁর মামুলি কথা নয়। এটি তাঁর দুঃখাক্রান্ত হৃদয় থেকে উত্থিত।

সুরেন্দ্রনাথ তাঁর রাজনৈতিক বিরোধীদের সম্পর্কে প্রচণ্ডভাবে নিরপেক্ষতা বজায় রেখে চলতেন। মিসেস বেসান্ট এর কারাদণ্ডের সময়েও তিনি একই ব্যাপার করেছিলেন। যদিও মিসেস বেসান্টের সঙ্গে তাঁর রাজনৈতিক মত পার্থক্য ছিল, তা সত্ত্বেও কলকাতায় তাঁর কারাবাসের আদেশের বিরুদ্ধে দুটি প্রতিবাদ সভায় তিনি সভাপতি হতে ইতস্ততঃ করেননি, আর তিনি তা করেছিলেন প্রচণ্ড তেজের সঙ্গে, সম্পূর্ণ প্রাণখোলা ভাবে।

প্রসঙ্গক্রমে এটা উল্লেখ করতেই হবে যে পুরনো মরচে পড়া আইনকে আবার ব্যবহারযোগ্য করে তোলার ফলে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পরবর্তী বছরগুলিতে এবং দেশের অন্যান্য স্থানে চরমপন্থা বিস্তার লাভ করায় এই আইনটির গুরুত্ব অনেক বেড়ে যায়। এই সময়ে বাংলাদেশের বেশ কয়েকজন প্রধান নেতা এবং পাঞ্জাবের লালা লাজপত রায় এবং অজিত সিংকে এই ধরনের পুনরুজ্জীবিত আইনের সাহায্যে দ্বীপান্তর পাঠানো হয়। সুরেন্দ্রনাথ এই স্বেচ্ছাচারমূলক অসাধারণ ক্ষমতাকে কোনক্রমেই মেনে নিতে পারেননি। তিনি বলেছিলেন : "জনসাধারণের কাছে কোনো দায়িত্ব নেই এমন শাসকদের হাতে একটা অন্যায় আইন প্রায়ই এমনভাবে ব্যবহার হয় যাতে প্রচণ্ড অসন্তোষের সৃষ্টি হয়।"[৬৩]

এই সমস্যা সম্পর্কে অমরাবতী কংগ্রেস অধিবেশনে সুরেন্দ্রনাথের যে বক্তব্য আমরা পাই তা হল এই। ভারতীয়রা হল জন্মগতভাবে বৃটিশ

৬২। হাউ ইণ্ডিয়া রট ফর ফ্রীডম
৬৩। এ নেশন ইন মেকিং

প্রজা, অতএব বৃটিশরা তাদের ম্যাগনা কার্টা এবং হেবিয়াস কর্পাস-এর মাধ্যমে যেসব অধিক ও সুবিধা ভোগ করে সেসব ভারতীয়দেরও প্রাপ্য এই সমস্ত অধিকার এমনকি অতুলনীয় ব্যক্তিগত অধিকার ভারতীয়রা যেকোন রকম আইনসঙ্গত উপায়ে অর্জন করবেই। স্বেচ্ছাচারমূলক ক্ষমতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন : "……ভারতে বৃটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে জীবন এবং সম্পত্তির নিরাপত্তার উপর ভিত্তি করে। ঐ অসাধারণ অধিকারের কিবা মূল্য রইল যদি যে কোন মুহূর্তে আপনাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়, গ্রেপ্তার করা হয়, হাজতে মাসের পর মাস বন্দী করে রাখা হয় বিনা বিচারে এবং বিনা কৈফিয়েতে? কোথায় তাহলে রইল বৃটিশ শাসনের আমলের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা বা স্বাধীনতার গর্ব?"[৬৪] এই হলেন গিয়ে সুরেন্দ্রনাথ—যিনি নরমপন্থী, যিনি আইনসঙ্গতভাবে চলার পক্ষপাতী, কিন্তু স্বাধীনতার একজন উৎসাহী সমর্থক। স্বাধীনতার কোনরকম দমন, সে যেকোন রকম করেই হক না কেন, তিনি তেজের সঙ্গে তা বাধা দিতেন।

৬৪। হাউ ইণ্ডিয়া রট ফর ফ্রীডম

# দ্বাদশ অধ্যায়

## কার্জনের রাজত্বকাল

লর্ড কার্জন ১৮৯৮ সালে যখন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আবহাওয়া গভীর অসন্তোষ এবং চঞ্চলতায় ভরে উঠেছে তখন বড়লাট হয়ে এলেন। তিনি কিছুই করলেন না যাতে আবহাওয়া শান্ত হয়—বরং যা করলেন তাতে ব্যাপার আরো ঘোরালো হয়ে দাঁড়াল। ভারতবর্ষের বিতর্কিত বড়লাটের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম, তাঁর মেধা ছিল প্রচণ্ড, তিনি কর্মঠ ছিলেন এবং শাসক হিসাবে ছিলেন দক্ষ। তাঁর ছিল স্বাধীনভাবে কাজ করবার ইচ্ছা এবং সুন্দর বক্তৃতা দেবার ক্ষমতা। কিন্তু যেসব নীতি তিনি অনুসরণ করলেন সেগুলো সব প্রতিক্রিয়াশীল, ফলে তিনি জনপ্রিয়তা হারিয়ে ফেলেন। তিনি তাঁর শাসিত জনগণের উপর সংবেদনশীল ছিলেন না—ধুরন্ধর রাষ্ট্রনীতিজ্ঞ তিনি ছিলেন না।

লর্ড কার্জন বড়লাট হবার কিছুদিনের মধ্যেই ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের মাদ্রাজ কংগ্রেস অধিবেশনে, সুরেন্দ্রনাথ তাঁকে স্বাগত জানিয়ে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং তাতে আশা করেন যে লর্ড কার্জন ভারতবর্ষকে বৃটিশ শাসনের সর্বোত্তম ধারা অনুযায়ী শাসন করবেন। সভাপতি আনন্দ মোহন বসু বড়লাটকে প্রস্তাবটি পাঠিয়ে দেন, তিনিও কংগ্রেসকে নিয়মমাফিক ধন্যবাদ জানান। কিন্তু প্রস্তাবে যা আশা করা হয়েছিল তা পূর্ণ হল না। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে আবার সুরেন্দ্রনাথ লর্ড কার্জনের কাছে এক প্রতিনিধি দলকে নিয়ে যান নিজের নেতৃত্বে এবং তাঁকে স্বাগত জানান। এই সময় ভবিষ্যতের ইঙ্গিত বহনকারী একটি বিশ্রী ঘটনা ঘটে। যখন তাঁরা সিংহাসন কক্ষে বড়লাটের জন্য প্রতীক্ষা করছিলেন, তখন বড়লাটের

একজন দেহরক্ষী দুজন প্রতিনিধি যাঁরা পাম্প-শূ পরেছিলেন তাঁদের বলেন হয় তাঁরা জুতো জোড়া ছেড়ে খালি পায়ে থাকুন, নয়ত প্রতিনিধি দল ছেড়ে চলে যান। শেষোক্ত পথই তাঁরা বেছে নিয়েছিলেন। প্রতিনিধি দলের মধ্যে এই ব্যাপার নিয়ে তীব্র বিরূপতার সৃষ্টি হয়, তাঁরা একযোগে ঐ কক্ষ ত্যাগ করে যাননি কেবলমাত্র এই কারণে যে এভাবে বড়লাটকে অসম্মান দেখালে শেষ পর্যন্ত ভারতবর্ষের স্বার্থের হানি হতে পারে।

আর একবার সুরেন্দ্রনাথ লর্ড কার্জনের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে এসেছিলেন কলকাতার একটি জনসভায়। সেখানে রাণী ভিক্টোরিয়ার স্মৃতির প্রতি সম্মান দেখানো উদ্দেশ্য ছিল। সভাপতি হয়েছিলেন বড়লাট। সেখানে সুরেন্দ্রনাথ বক্তৃতা দেন এবং বড়লাটের একান্ত সচিব তাঁকে অভিনন্দন জানান। এই বিপরীত ব্যক্তিদ্বয়, সুরেন্দ্রনাথ এবং লর্ড কার্জনের সঙ্গে আর দেখা হয়নি। এরমধ্যে কেবল যে আকস্মিক ব্যাপার ছিল তা নয়, ইতিহাস তাঁদের দুজনকে শত্রু হিসাবে মঞ্চে পাঠিয়েছিল। সুরেন্দ্রনাথের ব্যাপার নিয়ে খুব শিগগীর কার্জনকে বেশ দুশ্চিন্তায় পড়তে হয়েছিল। বড়লাট এর পর কখনো সুরেন্দ্রনাথকে ডেকে পাঠাননি, আর সুরেন্দ্রনাথও বড়লাটের কাজকর্ম দেখবার পর আর তাঁর সঙ্গে দেখা করার কথা ভাবেন নি।

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে কলকাতা থেকে ২১৭ মাইল দূরে স্বাস্থ্যকর জায়গা শিমূলতলায় সুরেন্দ্রনাথের বাড়ী তৈরি শেষ হয়। তিনি বছরে একবার কোন স্বাস্থ্যকর জায়গায় বিশ্রাম এবং হাওয়া বদলের জন্য মনোরম পরিবেশে যাওয়ার অভ্যেসটি বৃটিশদের কাছ থেকে শিখেছিলেন। শিমূলতলার বাড়ীটি এজন্য এবং কিছু কিছু পড়াশুনোর জন্য তৈরি হয়েছিল। পরে ১৯০২ খৃষ্টাব্দে আহমেদাবাদ কংগ্রেস অধিবেশনের সভাপতির অভিভাষণটি তিনি এখানে বসে লিখেছিলেন। তাঁর আত্ম-জীবনীর অনেকখানিই শিমূলতলার বাড়ীতে লেখা।

প্রায় এই সময়ে একটি শোচনীয় ঘটনা ঘটে তাতে সুরেন্দ্রনাথের মানবিক সমবেদনশীল মন এবং সাধারণের জন্য দরদ এই দুই এরই প্রমাণ পাওয়া যায়। সুরেশ চন্দ্র সরকার ব্যারাকপুরের একজন নামজাদা ডাক্তার ছিলেন, ইনি সুরেন্দ্রনাথের পরিবারের চিকিৎসক ছিলেন এবং তাঁর বন্ধু ছিলেন। এক রাত্রে তিনি যখন ডাক্তারখানা থেকে বাড়ী ফিরে যাচ্ছিলেন তখন তিনজন মাতাল সাহেব সেখানে এসে পড়ে, বে তর্কাতর্কি হয় এবং তাঁকে খুব জোরে পশুর মত আক্রমণ করে, ফলে হাসপাতালে অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি মারা যান। শোকে এবং দুঃখে সুরেন্দ্রনাথ ব্যাপারটা বেশ তেজের সঙ্গে গ্রহণ করলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ আলিপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে দেখা করে এই কাপুরুষ জনোচিত অপরাধের ঘটনাটি তাঁকে খুলে বললেন। ঐ সময়কার সাহেব জুরিদের ভাবভঙ্গীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় থাকায় তিনি গোড়া থেকেই খুব যত্নের সঙ্গে মামলাটিকে এমনভাবে পরিচালনা করেন যাতে অপরাধীদের শাস্তি হয়। এমনকি তিনি ব্যাপারটা নিয়ে বাংলাদেশের লেফটেন্যাণ্ট গভর্নরের সঙ্গে দেখা করেন এবং ইংল্যাণ্ডেও প্রচার চালান, ফলে পার্লামেণ্টে এই নিয়ে প্রশ্ন হয় এবং ভারত সচিবের কাছ থেকে এই ব্যাপারে ভারত সরকার একটি চিঠি পান। তিন জন আক্রমণকারীরই বিচার হয় এবং তারা মারাত্মক আঘাত করার ব্যাপারে দোষী সাব্যস্ত হয় কিন্তু আরো বড় অপরাধের অভিযোগটির জন্য বেকসুর খালাস পায়। তাই, অপেক্ষাকৃত অল্প অপরাধের জন্য আইন অনুসারে সবচেয়ে বেশী শাস্তি যা বরাদ্দ ছিল সেই শাস্তিই তাদের দেওয়া হয়।

আর একবার ঐ রকম একটি ব্যাপারে তিনি নিজেকে জড়িত করেন। দুজন সাহেবের আক্রমণের ফলে গুরদিৎ মাইতি নামে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়। সুরেন্দ্রনাথ ব্যাপারটি বেঙ্গলীতে প্রকাশ করেন এবং লেফটেন্যাণ্ট গভর্নরের সঙ্গে দেখা করেন। অপরাধীদের মধ্যে একজনকে শাস্তি দেওয়া হয়, অন্যজন দক্ষিণ আফ্রিকায় পালিয়ে যায়। ইউরোপীয়েরা ভারতীয়দের মারছে এমন ঘটনা সেকালে প্রায়ই ঘটত।

১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের কংগ্রেস অধিবেশনে রমেশ চন্দ্র দত্তের কংগ্রেস সভাপতি থাকার সময় সুরেন্দ্রনাথ একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এই প্রস্তাবটি, এর আগের বছরে লর্ড কার্জনকে স্বাগত জানিয়ে যে প্রস্তাবটি করেছিলেন তার চাইতে একেবারে অন্যরকম ছিল। এই প্রস্তাবে সরকারের প্রতিক্রিয়াশীল নীতির বিরোধিতা করা হয়, এই নীতিকে স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনের পরিপন্থী বলা হয় কেননা ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল আইন এবং বোম্বাই-এর আইন সভায় একই রকম আইন আনাতে তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল। দু সপ্তাহের মধ্যে একটি স্মরণীয় বক্তৃতার সাহায্যে সুরেন্দ্রনাথ ঐ আইনের সর্তাবলী বিশ্লেষণ করে দেখান কেমন করে কলকাতার পৌর অধিকার তাতে ধ্বংস করা হয়েছে। সুরেন্দ্রনাথ লর্ড কার্জনের ভারতবর্ষ সম্পর্কে পূর্বেকার সহানুভূতিপূর্ণ কথাবার্তায় এবং পরবর্তীকালে তাঁর দরদহীন কাজকর্মের উল্লেখ করেন। তিনি যা বলেছিলেন, যদিও আপাত দৃষ্টিতে তা মৃদু মনে হতে পারে, কিন্তু আসলে বেশ ঝাঁঝালো এবং কঠিন ছিল : "বক্তৃতাটা পড়ুন, তার সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন নীতির কতখানি পার্থক্য। বক্তৃতাটা কত মহান, কত উদার, কত সমবেদনাপূর্ণ, আর নীতি, কি সংকীর্ণ, কত অনুদার, কতখানি ইংরাজ নীতির বাইরে।"[৬৫]

এই সবটা নয়, তৎকালীন হালচাল দেখে তিনি সাবধান করে দিয়েছিলেন, পরবর্তীকালের ঘটনাবলীর বিচারে সেই সাবধান বাণী খুবই সময়োপযোগী বলে প্রমাণিত হয়েছিল। কিন্তু শাসকেরা তা গ্রাহ্য করেনি। তিনি বলেছিলেন, দুটি উপায়ে অন্যায় দূর করা যায়, আইনের সাহায্যে, কিংবা বৈপ্লবিক উপায়ে। "মহাশয়, আজকালকার দিনে··· সমস্ত সরকারেরই সবচেয়ে বড় নিরাপত্তা হল, জনসাধারণের সন্তোষ, কৃতজ্ঞতা এবং ভালবাসা পাওয়া। কি করে জনসাধারণের ভালবাসা পাওয়া যাবে যদি না তাদের দুঃখ দুর্দশা দূর করা যায়। আর দুঃখ দুর্দশা

---

৬৫। হাউ ইণ্ডিয়া রট ফর ফ্রীডম

দূর করতে হলে হয় আইনের সাহায্যে তা করতে হয় নইলে করতে হয় বিপ্লবাত্মক উপায়ে।"[৬৬] কংগ্রেস যে সংস্কারের পক্ষে তা তিনি জোর দিয়ে বলেন এবং সাবধান করে দেন যে তা হলেও অন্যেরা বিপ্লবের পথে যেতে পারে, অতএব খুব তাড়াতাড়ি সংস্কারগুলো করা প্রয়োজন, কারণ, তিনি বুঝতে পেরেছিলেন এর মাঝামাঝি আর কোনো উপায় নেই।

১৯০০ খৃষ্টাব্দে লাহোর এবং ১৯০১ খৃষ্টাব্দে কলকাতা এই দুই জায়গায় কংগ্রেস অধিবেশনেই সুরেন্দ্রনাথ প্রস্তাব উত্থাপন করেন যে সরকারী কাজে কর্মে আরো বেশী ভারতীয় নিযুক্ত করা হোক। লাহোরে তিনি অকাট্য তথ্য উদ্ধৃতির সাহায্যে প্রমাণ করেন যে সরকারের বিভিন্ন বিভাগে উচ্চপদে যাঁরা নিযুক্ত আছেন তাঁদের মধ্যে ভারতীয়দের সংখ্যা কত শোচনীয়ভাবে কম—আর এগুলো হয়েছে কিনা ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের রাণীর সমদৃষ্টিতে দেখার কথা ঘোষণার পর। বহু দিন আগে, গত দশকে, এইচিসন কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী সরকারী ছোট ছোট কাজে অধিকতর ভারতীয় নিয়োগ করার কথা বলা হয়েছিল, কিন্তু তা একেবারেই মেনে চলা হয়নি।

লাহোর কংগ্রেস অধিবেশনের আগে, একজন বিখ্যাত কংগ্রেসী লালা জয়শিরামের নিমন্ত্রণে সুরেন্দ্রনাথ পাঞ্জাব ভ্রমণে বেরোন। এর কিছু পরই জয়শিরামের মৃত্যু হয়। তিনি দিল্লী, অমৃতসর, লাহোর এবং রাওয়ালপিণ্ডিতে বেশ কয়েকটি বক্তৃতা করেন।

শতাব্দীর শেষে দেশপ্রেম নতুন করে অগ্নিময়ী হয়ে ওঠে, বিশেষ করে বাংলাদেশে, যেখানে বিপিন চন্দ্র পাল প্রমুখ ব্যক্তিদের লেখায় এবং অন্যভাবে কংগ্রেসের রাজনৈতিক ভিক্ষাবৃত্তির কথা বলা হয় এবং তাতে অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়। এর আগের বছরে প্লেগের ব্যাপারে, দুর্ভিক্ষে এবং কষ্টে অসন্তোষের মাত্রা ক্রমাগতই তিক্ততা বাড়িয়ে চলছিল এবং মনে

৬৬। হাউ ইণ্ডিয়া রট ফর ফ্রীডম

হচ্ছিল যেন বাঁধ ভেঙ্গে যাবে। আরো কতকগুলি ব্যাপারে জাতীয়তাবাদকে উদ্দীপ্ত করেছিল, যেমন, জাপানের এশিয়ার এক শক্তিতে পরিণত হওয়া এবং চীনাদের অ্যামেরিকার জিনিস বয়কটের সাফল্য। এশিয়ার অনুভূতি লোকের মনে উথলে উঠছিল। ওকাকুরা বলেছিলেন, এশিয়া হচ্ছে অখণ্ড। এর আগেই স্বামী বিবেকানন্দের অ্যামেরিকায় সাফল্যজনক প্রচারের ফলে ভারতবর্ষে জাতীয় গর্ব নতুন করে দেখা দিচ্ছিল, তার সঙ্গে ধর্মের উদ্দীপনাও ছিলনা তা নয়।

এই মুহূর্তে লর্ড কার্জনের প্রতিক্রিয়াশীল কার্যকলাপই কিভাবে ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে দারুণ সুবিধে করে দিয়েছিল—আমরা তা এখন আলোচনা করব। কলকাতা কর্পোরেশনকে স্বায়ত্ত্ব শাসন থেকে বঞ্চিত করা লর্ড কার্জনের খারাপ কাজগুলির মধ্যে প্রথম আরো অনেক খারাপ কাজ করার পর সবচেয়ে বড় যে খারাপ কাজ তিনি করতে গেলেন, তা হল বঙ্গভঙ্গ। ঝড় এসে ভেঙ্গে পড়তে আর দেরি হলনা বেশি।

ইতিমধ্যে ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারীতে, সুরেন্দ্রনাথের সাপ্তাহিক কাগজ বেঙ্গলী জনজীবনের সম্প্রসারণ এবং ক্রমবর্ধমান সংবাদ ক্ষুধাকে তৃপ্ত করতে দৈনিক কাগজে পরিণত হল। এটা বলার প্রয়োজন নেই যে বেঙ্গলী জনমতের জন্য খুব শক্তিশালী কাগজে পরিণত হয়েছিল এবং এর সাংবাদিকতার মান খুব উঁচু ছিল। তাঁর খবরের কাগজের মাধ্যমে সুরেন্দ্রনাথ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের জন্য আবেগপূর্ণ আবেদন করতেন এবং ভারতীয়দের বক্তৃতা দেবার এবং কাজ করবার স্বাধীনতার পরিপন্থী সমস্ত রকম কার্যকলাপের বিরুদ্ধে বিরামহীন সংগ্রামে অবতীর্ণ হলেন। সম্পাদক হিসেবে তিনি যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছিলেন। ঐ খবরের কাগজের সঙ্গে তিনি চল্লিশ বছর যুক্ত ছিলেন, ঐ সময়ে সুরেন্দ্রনাথ কতকগুলি সাংবাদিকতার নীতি এবং নিয়ম গড়ে তুলেছিলেন যা তখন যেমন উপযোগী ছিল আজও তেমনি আছে। রাজনৈতিক জীবন কখনো গালমন্দ বা আক্রমণ থেকে মুক্ত নয়, আর সুরেন্দ্রনাথের জীবনে সেগুলো প্রচুর পরিমাণেই ছিল। কিন্তু তিনি প্রতিশোধ কখনোই নিতে চাইতেন না, বা অন্যায় ভাবে আক্রমণও করতে চাইতেন না। তাঁর বিরোধীদের

সম্পর্কে তিনি ছিলেন স্পষ্ট এবং নিরপেক্ষ। তিনি কখনই ব্যক্তিগত হক, প্রদেশত হক, সংকীর্ণ ব্যাপারে নিজেকে জড়াতেন না।

তাঁর আত্মজীবনীতে সুরেন্দ্রনাথ বলেছেন যে তিনি প্রয়োজন হলে খুব শক্ত ভাষায় লিখেছেন, তবে তিনি রাজদ্রোহিতা, মানহানি, ব্যক্তিগত পাল্টা অভিযোগ ইত্যাদির দিকে যাননি। তাঁর বিরুদ্ধে কখনো রাজ-দ্রোহিতার অভিযোগ আনা হয়নি, যদিও বেঙ্গলীতে প্রকাশিত তাঁর কিছু কিছু লেখা প্রায় রাজদ্রোহিতার কাছাকাছি চলে গিয়েছিল। তবে তিনি বুঝেছিলেন যে একজন সম্পাদক সম্পূর্ণভাবে মানহানির দায় থেকে মুক্ত হতে পারে না। কখনো কখনো কেবলমাত্র জনস্বার্থের জন্য তিনি মানহানিকর মন্তব্য করেছেন এবং তার জন্য যা ফলাফল তা ভোগ করেছেন। তখনকার আমলের বৃটিশ শাসক খবরের কাগজের তীব্র ভাষাকে পছন্দ করতেন না। সুরেন্দ্রনাথ বলেন, তবে কিনা তাঁরা নিজেরাই ভুলে যেতেন যে এরকম লিখতে হত তাঁদেরই প্ররোচনায়। তিনি সেই সঙ্গে তাঁর দ্বিতীয়বার মানহানি মকর্দমার কথাটি বলেন, যেটিতে তিনি জড়িয়ে পড়েছিলেন বটে তবে অপরাধটির জন্য তিনি ব্যক্তিগতভাবে দায়ী ছিলেন না। ব্যাপারটা অনেক দিন পরে ঘটেছিল। ১৯১১ খৃষ্টাব্দের মে মাসে বেঙ্গলীতে মেদিনীপুরের ম্যাজিস্ট্রেটের বিচারাধীন একটি মামলা সম্পর্কে সাক্ষীর ব্যাপারে কিছু মন্তব্য প্রকাশিত হয়। এটি লিখেছিলেন বেঙ্গলীর সহ-সম্পাদক কালীনাথ রায়—ইনি পরে ট্রিবিউন-এর বিশিষ্ট সম্পাদকরূপে পরিচিত হন। যদিও কালীনাথ রায় সুরেন্দ্রনাথকে লিখিতভাবে জানিয়েছিলেন যে ঐ লেখার দায়িত্ব তাঁরই, কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ উদারচেতা হওয়াতে ব্যাপারটিকে আদালতে নিয়ে যেতে চাননি এবং তাঁর লিখিত বিবৃতিতে ঐ মন্তব্যের জন্য সম্পাদক হিসেবে নিজেই দায়িত্ব নিতে চান। কতকগুলি প্রয়োগগত ত্রুটি থাকার জন্য মামলাটা শেষ পর্যন্ত টেঁকেনি।

# ত্রয়োদশ অধ্যায়

## আহমেদাবাদ কংগ্রেস-এর সভাপতি

এরপর সুরেন্দ্রনাথের জীবনে খুব বড় ঘটনা হল ১৯০২ খৃষ্টাব্দে আহমেদাবাদের কংগ্রেস অধিবেশনে তাঁর দ্বিতীয়বার কংগ্রেস সভাপতি হওয়া। ডি. ই. ওয়াচার নিমন্ত্রণ পেয়ে সুরেন্দ্রনাথ প্রথমে সভাপতি পদের জন্য কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম প্রস্তাব করেন, তবে আহ্বায়ক মণ্ডলী জোর করাতে তিনি নিজেই ঐ সম্মানিত পদটি গ্রহণ করেন। তাঁর শিমূলতলার বাড়িতে তিনি আবার ছ'সপ্তাহ ধরে আর একটা উচ্চ শ্রেণীর সভাপতির অভিভাষণ প্রস্তুত করেন, সেটি তিনি চার হাজারেরও বেশি লোকের সামনে তু'ঘণ্টা ধরে বলেন এবং আগেকার মতই কোনো লিখিত কাগজপত্র সামনে না রেখেই।

আহমেদাবাদের অধিবেশনটি প্রচণ্ড সাফল্য লাভ করে। কংগ্রেস অধিবেশনের ন'দিন পর ১লা জানুয়ারী ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর দরবার বসবার কথা ছিল। এর আগে কয়েক বছর ধরে দেশের উপর দিয়ে খারাপ সময় এবং তুর্ভিক্ষ চলে গিয়েছে, যদিও বড়লাট এর প্রতিবাদ করেছেন তবুও এই সময় দরবার করা যে অত্যন্ত বাজে খরচের ব্যাপার সেটা সকলেই জানতেন। এরকম উৎসব প্রদর্শনীর ব্যাপার ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের একটি সুপরিচিত অঙ্গ। এরকম দরবার হয়েছে ১৮৫৮, ১৮৭৭ এবং ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে। দরবার যখন সমসান্ন তখন সুরেন্দ্রনাথের সভাপতি হওয়াটা খুব প্রয়োজনীয় বলে মনে করা হয়েছিল, যাতে দরবারের চাইতে কংগ্রেস মঞ্চটি বেশি আকর্ষণীয় বলে মনে হয়। এ ছাড়া কংগ্রেসের বক্তব্য যাতে আরো জোরের সঙ্গে বলা যায় সেটাও একটা কারণ ছিল। এই অধিবেশনটিকে যথাযথ ভাবেই নাম দেওয়া হয়েছিল করোনেশন কংগ্রেস। পি. এম. মেটা সুরেন্দ্রনাথকে সভাপতি করার প্রস্তাব করে

বলেন যে করোনেশন সভাপতি এমন একজনের হওয়া উচিত যিনি কংগ্রেসের বক্তব্য রাষ্ট্রনীতিবিদের মত দক্ষতা এবং জোরের সঙ্গে প্রকাশ করতে পারবেন। আর সুরেন্দ্রনাথের চাইতে এ কাজ অধিকতর ভাল ভাবে আর কার করবার ক্ষমতা রয়েছে, যিনি, "কংগ্রেসের কাজে তাঁর জীবন উৎসর্গ করেছেন, যিনি জনসাধারণের কাজ থেকে কখনো সরে দাঁড়াননি এবং যিনি তাঁর কাছে গিয়ে কোনো কাজের জন্য অনুরোধ করলে সে কাজের জন্য সর্বদাই প্রস্তুত।"

এই অধিবেশনটি প্রথমে হয় আহমেদাবাদে, এর ফলে গুজরাটের লোকেদের মধ্যে প্রচণ্ড উৎসাহের সৃষ্টি হয়—ব্যবসায়ীরা, দোকানদারেরা, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী এবং অন্যেরা এতে উৎসাহে যোগ দেন। কংগ্রেস অধিবেশনের আনুষঙ্গিক হিসেবে একটা যন্ত্রশিল্প প্রদর্শনীও হয়, এর উদ্বোধন করেন বরোদার গাইকোয়াড়। কংগ্রেস অধিবেশনের সঙ্গে একটা করে যন্ত্রশিল্প প্রদর্শনী তখন খুব চালু ছিল—এটার জন্য সুরেন্দ্রনাথের প্রচেষ্টা খুব কম ছিল না। গুজরাটের করিৎকর্মা লোকদের চিন্তাধারার সঙ্গে ঐ প্রদর্শনীটি মিশে গিয়েছিল আর তারই ফলে ঐ দেশ যন্ত্রশিল্পের পুনঃ প্রসার সুরু করবার প্রেরণা পায়।

আহমেদাবাদ কংগ্রেসের সভাপতি হিসেবে সুরেন্দ্রনাথের জন্য প্রাণবন্ত এবং প্রচণ্ড অভ্যর্থনা অপেক্ষা করছিল। "সমস্ত গুজরাট যেন এক কণ্ঠে কেবল যে হৃদ্যতাপূর্ণ অভ্যর্থনা করেছিল তা নয়, সেই অভ্যর্থনা ছিল প্রচণ্ড উৎসাহপূর্ণ।" ঐ বছরের কংগ্রেস রিপোর্টে তাই লেখা আছে। গুজরাট কখনো "এত বড় একজন দেশের লোককে" তাদের জেলাগুলিতে অভ্যর্থনা করেনি কিংবা "তাঁর উন্মাদনাকর বক্তৃতা" শোনেনি। তাই, সমস্ত আহমেদাবাদ তাঁর আগমনের জন্য আশায় উন্মুখ হয়ে ছিল। রাস্তাগুলোকে জাঁকজমকপূর্ণ ভাবে সাজানোতে একটা উৎসবের ভাব এসে গিয়েছিল—আগ্রহী জনতা প্রতিটি ইঞ্চি জমি দখল করেছিল যেন কোনো মহারাজা বা বড়লাটকে অভ্যর্থনা করা হবে। সভাপতির আগমন হতেই প্রচণ্ড ভীড় সৃষ্টি হল। মালা, ফুলের তোড়া, গোলাপ জল এবং অন্যান্য সব সুগন্ধী ছড়ানো হতে লাগল। রিপোর্টে আরো বলা হয়েছে, "একথা বললে

অত্যুক্তি করা হবে না" যে, "সুরেন্দ্রনাথ সেই সব বিরাট ওজনের মালার চাপে সত্যি সত্যি নত হয়ে পড়েছিলেন।" রিপোর্টে আরো বলা হয়, "সমস্ত পথের দৃশ্যের সম্পূর্ণ বর্ণনা দেওয়া অসম্ভব।"

যখন তাঁকে এভাবে শোভাযাত্রা করে ফুলে -ওঠা, উদ্বেলিত হওয়া জনসমুদ্রের ভেতর দিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তখন স্বেচ্ছাসেবকদের প্রায় পাগলামির পর্যায়ে পড়ে এমনি উৎসাহ সমস্ত রকম মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছিল এবং সুরেন্দ্রনাথের সমস্ত প্রতিবাদ সত্ত্বেও তারা ঘোড়াদের বল্গা মুক্ত করে দিয়ে নিজেরাই সভাপতির গাড়ি টেনে নিয়ে গিয়েছিল লক্ষ্যস্থলে। সেখানে তাদের দাবিতে সুরেন্দ্রনাথকে কয়েকটা কথা বলতে হয়েছিল—সেই বক্তৃতায় কতকটা বোঝা গিয়েছিল অভিভাষণে বলার ধরনটা কি হবে। তৎকালীন কংগ্রেস নেতাদের অনেকের ভাগ্যেই অমন উৎসাহ-প্রবল অভ্যর্থনা জোটেনি।

যদিও সুরেন্দ্রনাথ আইন মাফিক আন্দোলন বিশ্বাস করতেন, তবুও জননেতা হবার উপযোগী সমস্ত রকম বস্তু দিয়ে তিনি তৈরী ছিলেন। তাঁর চরিত্রের এই দিকটা খুব স্পষ্টভাবে দেখা যায় বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় এবং তিনি জন হৃদয়ে "মুকুটহীন রাজা" হিসেবে স্থান করে নিতে পেরেছিলেন। গান্ধীজী, সুভাষ চন্দ্র এবং নেহরু প্রভৃতি পরবর্তী জননেতাদের মত তিনিও জনগণের সংস্পর্শে উৎসাহের সংস্পর্শে এলে, বিদ্যুতের স্পর্শের মত সচকিত হয়ে উঠতেন। গুজরাট যখন তাঁকে ঐরকম আশ্চর্য অভ্যর্থনা করল তখন তিনিও সেই অভ্যর্থনার উপযোগী প্রাণস্পর্শী কথা বলেছিলেন। তাঁর অধিবেশনের শেষের ভাবমণ্ডিত ধন্যবাদসূচক অভিভাষণে তিনি বলেছিলেন : "একজন মানুষের জীবনে এমন সব মুহূর্ত আসে যখন সে তার মনের সবচেয়ে বড় হয়ে ওঠা ভাবকে রূপ দিতে গিয়ে ভাষার অপ্রতুলতায় খেই হারিয়ে ফেলে। আমার জীবনে সেই রকম ভাবের একটি মুহূর্ত এসে উপস্থিত হয়েছে। আমি স্বীকার করছি, আপনারা আমার প্রতি যে প্রচণ্ড অনুকম্পা প্রদর্শন করেছেন তার উপযুক্ত গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কি করে করব তা আমার জানা নেই। আমি এমন মুর্খ নই যে আমি এক মুহূর্তের জন্যও ভাবতে

পারি যে এই সম্মান প্রদর্শন ব্যক্তিগতভাবে আমার প্রাপ্য। এই সম্মান দেওয়া হয়েছে কংগ্রেসের প্রতিনিধিকে। সভাপতিকে সম্মান দেখিয়ে আপনারা কংগ্রেসের প্রতিভার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। .....আপনারা ভারতবর্ষের জনসাধারণের কাছে তূর্যধ্বনির মধ্যে ঘোষণা করেছেন যে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে একটিই আপনাদের ধর্ম, আর সে ধর্ম হল কংগ্রেসের ধর্ম।"[৬৭]

ঐ সভাপতির অভিভাষণে ঐ সময়কার রাজনৈতিক সমস্যাবলী এবং সেগুলির নানা জটিলতা সম্পর্কে বিশেষ দখল এবং উপলব্ধির পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল। অভিভাষণটি সুরু হয়েছিল দিল্লীর দরবারকে উল্লেখ করে। সুরেন্দ্রনাথ দরবারের বিরুদ্ধে একেবারে চরম মতাবলম্বীদের মত সর্বতোভাবে নালিশ জানাননি, কেননা তিনি জানতেন যতই সমালোচনা বা প্রতিবাদ করা হক না কেন দরবার হবেই। অতএব তিনি এই সুযোগে জনসাধারণকে আরো ব্যাপক অধিকার দেবার দাবী জানালেন। তিনি বললেন, "জাঁকজমকপূর্ণ দৃশ্য যা চোখ ধাঁধিয়ে এবং বিহ্বল করে দেবার জন্য করা হয়েছে, তা ভারতবাসীদের মনে চিরস্থায়ীভাবে দাগ কাটতে সমর্থ হবে না। দরবারকে আরো উচ্চস্থানে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য আরো বড় কৌশলী কূটনীতিজ্ঞ ব্যক্তির প্রয়োজন।"[৬৮] ইতিহাসের স্রোতে কোথায় হারিয়ে যাবে এই জাঁকজমকপূর্ণ দৃশ্য, কিন্তু যদি জনসাধারণের ভোটের ব্যাপারে আরো কিছু সুবিধে দেওয়া যায়, তাদের অধিকারকে আরো বিস্তৃত করা যায় তবে তা চিরকালীন হয়ে থাকবে। তাঁর বক্তব্য ছিল এই।

ভারতবর্ষ কি দিন দিন দরিদ্রতর হচ্ছে? এই মোক্ষম প্রশ্নটি করলেন সুরেন্দ্রনাথ, দাবী করলেন এই দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে খোঁজ খবর নেওয়া হক। এরকম অনুসন্ধান এর আগে দুবার করা হয়েছে —লর্ড রিপন এবং লর্ড ডাফরিন যখন বড়লাট ছিলেন। ঐ সব অনুসন্ধান ছিল গোপন ধরনের, আর সেগুলি প্রকাশিত না হওয়ায় লোকে অবস্থাটিকে

৬৭। কংগ্রেস রিপোর্ট, ১৯০২

৬৮। ঐ

খুব যে সুন্দর বলে ধরে নিয়েছিল তা নয়। এই মতবাদের আরো কারণ ছিল এই যে এরপর আর নতুন করে কোনো অনুসন্ধানের ব্যাপারে সরকারের প্রবল আপত্তি। সুরেন্দ্রনাথ সরকারী এবং সরকার সমর্থক উৎস থেকে গৃহীত সংখ্যাতত্ত্বের সাহায্যে ভারতীয় জনসাধারণের অবিশ্বাস্য দারিদ্র্যের চিত্রটি সামনে তুলে ধরলেন। এর আগের কুড়ি বছরের ছ'টি দুর্ভিক্ষে দেড় কোটি লোকের মৃত্যু হয়েছিল (অন্য একটি মতানুসারে দু'কোটি যাট লক্ষ)। এরকম ঘটনা যদি ইউরোপের কোনো দেশে হত তাহলে সমগ্র মানব সমাজের বিবেক ব্যথা পেত। "কিন্তু ভারতবর্ষ সম্পর্কে সভ্য দেশের কোনো মতামত নেই।" এই বিরাট আকারের দুর্ভিক্ষ এমনকি তার শাসকদের বিবেককে পর্যন্ত আঘাত করে না।

বৃটিশ শাসকদের সম্পর্কে এরকম বলাটা বেশ কঠোরই হয়ে গিয়েছিল। দুর্ভিক্ষ যে অনাবৃষ্টির ফলে হয়েছিল, সরকারী এই যুক্তি সুরেন্দ্রনাথ খণ্ডন করেন। অনাবৃষ্টি অন্য অনেক দেশেই হয়ে থাকে কিন্তু দুর্ভিক্ষ নয়। সুরেন্দ্রনাথের মতে, "দৈন্যই হল দুর্ভিক্ষের কারণ।"[৬৯] লোকেদের "কিছুই নেই, তারা ঋণের মধ্যে ডুবে আছে, অতি দীন, বহুক্ষেত্রেই দিনে একবার খেয়ে বাকিটা উপোস করে কাটাচ্ছে, আর অকাল সুরু হলেই তারা হাজারে হাজারে মরতে থাকে......।"[৭০] সুরেন্দ্রনাথের মতে প্রতিকার করা যায়: (১) জমির খাজনা কম করা (২) যে সমস্ত খাজনার ঋণ লোকের ঘাড়ে চেপে বসেছে তা মকুব করা (৩) অর্থনৈতিক অপচয় বন্ধ করা এবং (৪) দেশের পুরনো যন্ত্রশিল্পগুলিকে নতুন জীবন দান করা এবং নতুন শিল্প গড়ে তোলা।

কংগ্রেসের অনেকগুলি গৃহীত প্রস্তাব সুরেন্দ্রনাথের সভাপতির অভিভাষণ থেকে নেওয়া হয়েছিল। এরমধ্যে একটি প্রস্তাব ছিল যে যথা শীঘ্র সম্ভব জনসাধারণের অর্থনৈতিক অবস্থা নির্ধারণ করা।

---

৬৯। কংগ্রেস রিপোর্ট, ১৯০২

৭০। ঐ

নতুন করে যন্ত্রশিল্পকে প্রাণ দেওয়া সুরেন্দ্রনাথের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মধ্যে একটি বিশেষ স্থান পেয়েছিল, আর এই ব্যাপারে তিনি সর্বদাই অক্লান্ত ভাবে চেষ্টা করেছেন। আহমেদাবাদের অভিভাষণে তিনি ইউরোপীয় এবং ভারতীয় পণ্ডিতদের মতামত উদ্ধৃত করে প্রমাণ করেছেন যে কিভাবে ভারতের আপন শিল্প বৃটিশ উৎপাদনকারীদের অন্যায্য প্রতিযোগিতার ফলে বিনষ্ট হয়েছে এবং কিভাবে বৃটেন চেয়েছে ভারতবর্ষ একমাত্র কাঁচামাল সরবরাহকারী হিসেবেই অস্তিত্ব বজায় রাখুক। ভারতবর্ষের মুক্তি হচ্ছে যন্ত্রশিল্পের পুনর্জীবনে। তিনি বলেছিলেন, "যদি দেশকে রক্ষা করতে হয় আমরা যেন চাকুরী এবং পেশাগত পথ ছেড়ে দিয়ে বিরাট যন্ত্রশিল্পের পত্তন করবার জন্য চেষ্টা করি।......"[৭১] এ ছাড়া প্রচণ্ড অপচয়—বছরে তিন কোটি পাউণ্ড, উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ত্রিশ বছর ধরে যা চলে এসেছে, জাতীয় ধন সম্পত্তির এ একটা প্রধান ক্ষতি।

এই অর্থনৈতিক পীড়ার দাওয়াই হল রাজনৈতিক। "জনসাধারণকে জনসাধারণের ভাণ্ডার থেকে খরচ করবার ব্যাপারে সত্যিকারের কর্তৃত্ব দাও, তাহলেই রাতের পর যেমন দিন আসে তেমনি অবশ্যম্ভাবীরূপে অর্থনৈতিক পুনর্জীবন লাভ হবে।"[৭২] তিনি অতএব, স্থানীয় এবং সাম্রাজ্য বিষয়ক আইন সভার আরো সম্প্রসারণ চেয়েছিলেন, যাতে আরো জনপ্রিয় প্রতিনিধি তাতে আসেন এবং তাঁদের যেন জনসাধারণের জন্য ব্যয়ের উপর কর্তৃত্ব থাকে। তিনি অনুভব করেছিলেন, কেবলমাত্র ঐ উপায়েই দেশের অর্থনৈতিক স্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধার হবে।

জনসাধারণের আর যে একটা জরুরী ব্যাপার নিয়ে সুরেন্দ্রনাথ অনেকক্ষণ ধরে আলোচনা করেন, সেটা হল লর্ড কার্জন সরকারের শিক্ষা সংক্রান্ত নীতি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর হবার সময় এবং পরে ঐ একই বিশ্ববিদ্যালয়ে কনভোকেশনের সময়, ১৯০০ খৃষ্টাব্দে লর্ড কার্জন ভাসা ভাসা ভাবে ভারতীয় শিক্ষা সম্পর্কে তাঁর ধারণা এবং ইচ্ছে

৭১। কংগ্রেস রিপোর্ট, ১৯০২
৭২। ঐ

প্রকাশ করেন। মনে হয়েছিল যে তিনি ধারণা করেছেন যে শিক্ষা নীতিতে ত্রুটি ছিল এবং তা ঠিক করা সরকারের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে সিমলার এক গোপন বৈঠকে তাঁর ভাসা ভাসা ভাব রূপ গ্রহণ করে, আর এই বৈঠকে একজন ভারতীয়ও উপস্থিত ছিলেন না। সমস্ত কথাবার্তাই অত্যন্ত গোপন রাখা হয়। এমনকি নানা দিক দিয়ে লর্ড কার্জন-এর সমর্থক, লোভাট ফ্রেজার বলেন যে ঐ বৈঠকের গোপনত্ব নয়, যাঁদের দিয়ে ঐ বৈঠক হয় তাঁরা সমালোচনার উর্দ্ধে নন।[৭৩] সুরেন্দ্রনাথ অবশ্য এই বৈঠকের এবং বৈঠকে আলোচিত বিষয়গুলিকে গোপন রাখবার জন্যই সমালোচনা করেন। তিনি এই মত প্রকাশ করেন যে শিক্ষা সমস্যাবলীকে একজন আধা রাজনৈতিকের হাতে সমর্পণ করে এবং তা রাষ্ট্রের গোপন বিষয়ের অন্তর্গত করে কোনো লাভ হবে না।

এই বৈঠকের পর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন ভাইস চ্যান্সেলরের সভাপতিত্বে একটি বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন গঠিত হয়। এই কমিশনে মাত্র একজন ভারতীয়কে নেওয়া হয়েছিল, তিনি ছিলেন নিজাম রাজ্যের অধিবাসী, সৈয়দ হোসেন বিলগ্রামী। কিন্তু তাঁর প্রতিনিধি হবার যোগ্যতা সম্পর্কে মুসলমানেরাই প্রশ্ন তোলেন। বেঙ্গলী এবং অন্যান্য কাগজে এর বিরুদ্ধে প্রচণ্ড আপত্তি জানানোয় পরে জাস্টিস গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে কমিশনে নেওয়া হয়। রিপোর্ট শেষ করা হয় তাড়াহুড়ো করে, মাত্র পাঁচ মাসের ভেতর, যেখানে ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে এডুকেশন কমিশন নিয়েছিল প্রায় আঠারো মাস তাঁদের কাজ শেষ করতে। কমিশনের রিপোর্টের ভিত্তিতে ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের বিশ্ববিদ্যালয় আইন পাস হয়। সরকার কমিশনের সমস্ত সুপারিশ মেনে নেননি, কিন্তু তা সত্ত্বেও কমিশনের রিপোর্টটি সমগ্র দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে আলোড়ন আনে।

ঐ কমিশন নিয়োগ লর্ড কার্জনের আরো একটি প্রতিক্রিয়াশীল কাজের নমুনা এবং ভারতবর্ষের শিক্ষাকে পঙ্গু করবার কৌশল হিসাবে ধরা হয়। কংগ্রেস খুব কঠোরভাবে এর সমালোচনা করেন। গোখলে

৭৩। ইণ্ডিয়া আণ্ডার কার্জন অ্যাণ্ড আফটার

এবং সুরেন্দ্রনাথ এই আক্রমণের পুরোভাগে থাকেন। আহমেদাবাদের অধিবেশনে কমিশনের সুপারিশ মতো দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজের বিলুপ্তি, ভবিষ্যতে তালিকাভুক্তির অধিকার বাজেয়াপ্ত, সিণ্ডিকেট কর্তৃক সর্বনিম্ন ফী স্থিরীকরণ, কেন্দ্রায় আইন কলেজের আইন সংক্রান্ত পরামর্শ দানের একচ্ছত্র ক্ষমতা, মাধ্যমিক শিক্ষার লাইসেন্স প্রবর্তনের ফলে ডাইরেক্টর অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশনের উপর নির্ভরশীল হওয়া এবং সেনেট এবং সিণ্ডিকেটকে সরকারী আওতায় এনে সরকারী অফিসের সমগোত্রীয় করা ইত্যাদির বিরুদ্ধে প্রস্তাব গৃহীত হয়। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেস বিশ্ববিদ্যালয় বিল সম্পর্কে একই রকম প্রস্তাব গ্রহণ করেন। সেখানে বলা হয় যে ঐ বিলটি যদি আইনে পরিণত করা হয় তাহলে শিক্ষার ক্ষেত্র সঙ্কুচিত হবে এবং বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের স্বাধীনতা সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হবে।"[৭৪]

সভাপতির অভিভাষণে সুরেন্দ্রনাথ বলেন যে এডুকেশন কমিশনের সুপারিশগুলি এভাবে করা হয়েছে যাতে ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের এডুকেশন ডেস্প্যাচ্-এর পরম বিরোধিতা করা হয়েছে—এই ডেস্প্যাচ্-এ শিক্ষার আরো বিস্তারের কথা ছিল এবং ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে এডুকেশন কমিশনের রিপোর্টেও শিক্ষা ক্ষেত্রে বেসরকারী প্রচেষ্টাকে উৎসাহ দেবার কথা ছিল। সংস্কারের এই সমস্ত প্রস্তাব করা হয়েছে শিক্ষা ক্ষেত্রে দক্ষতা আনার জন্য। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথের মতে শিক্ষাক্ষেত্রে দক্ষতা আনবার উপায় হল শিক্ষকের দক্ষতা বাড়ানো। যখনি শিক্ষকদের পদমর্যাদা বাড়ানো হবে, তাঁদের পেশাকে উচ্চে স্থান দেওয়া হবে এবং সম্মানীয় করা হবে এবং যখন সেই সমস্ত লোকেরা, যাঁরা এই কাজকে পবিত্র মনে করবেন, নিজেদের জীবন উৎসর্গ করবেন, কাজটিকে মনে করবেন স্বর্গীয়, তখন, "আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির দক্ষতা বাড়ানোর জন্য বা শিক্ষা বিস্তারের জন্য, কমিশন, কমিটী আর আইন-কানুনের কোনো দরকারই হবে না।"[৭৫] তিনি আরোও বলেন, "আমাদের দেশের শিক্ষার ইতিহাসে অনেক মহান শিক্ষকের নাম পাওয়া যায়। শিক্ষার ব্যাপারে কর্তা ব্যক্তিরা যে সমস্ত

৭৪। হাউ ইণ্ডিয়া রট ফর ফ্রীডম

৭৫। কংগ্রেস রিপোর্ট, ১৯০২

প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন, নিয়ম-কানুন তৈরী করেছেন, সূক্ষ্ম নীতি গ্রহণ করেছেন এমনকি যে সমস্ত পবিত্র উদ্দেশ্যের কথা বলেছেন সেগুলোর চাইতে অনেক বেশী করেছেন মহান শিক্ষকেরা।"[৭৬] সরকারের শিক্ষা নীতির বিরুদ্ধে এ কথাগুলি বেশ জোরালো।

লর্ড কার্জনের সমর্থকেরা বলেন যে লাট সাহেবের এই বিস্ময়কর ভাবে শিক্ষা সংস্কারের ক্ষেত্রে প্রবেশ করাটা সেই সময়ের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ঠিকই হয়েছিল। তাঁরা বললেন যে শিক্ষা ব্যবস্থা বেসামাল, যান্ত্রিক এবং বিকৃতও হয়ে পড়েছে। বলা হল যে রাজনৈতিক লোকেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ম পরিষদে ঢুকে পড়েছেন। অন্য তরফ থেকে বলা হল যে যখন দ্রুত গতিতে শিক্ষা বিস্তারের প্রচণ্ড প্রয়োজন তখন বেসরকারী প্রচেষ্টাগুলিরও প্রয়োজন কম নয়। এরকম করতে গিয়ে বেসরকারী শিক্ষার প্রশাসনে ভুলভ্রান্তি কিছু হয়েছে তাই বলে শিক্ষা ক্ষেত্রে বেসরকারী প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে সেগুলো কোনো যুক্তিই নয়। জাতীয়তাবাদী ভারতবর্ষের কাছে লর্ড কার্জনের শিক্ষানীতি মনে হয়েছিল শিক্ষাকে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে এনে যে শিক্ষা রাজনৈতিক নবচেতনাকে শক্তি যোগাচ্ছিল সেই শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করা। ঐ নীতি, শিক্ষা এবং শিক্ষিত ভারতবর্ষ সম্পর্কে সরকারী সন্দেহকে পরিস্ফুট করেছিল। এই নীতি আইন সংক্রান্ত শিক্ষার ব্যাপারে অস্বাভাবিক ভাবে কঠোর ছিল। এখানে লক্ষ্যণীয় এই যে আইন পেশা থেকেই রাজনৈতিক নেতৃত্ব লালিত পালিত হয়েছে।

সুরেন্দ্রনাথ তাঁর অভিভাষণ শেষ করলেন কংগ্রেস এবং তার উদ্দেশ্য সম্পর্কে মহান কথা শুনিয়ে, তার সাফল্য এবং ব্যর্থতার, স্বাধীনতার জন্য এর নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের এবং কংগ্রেস যে শেষ পর্যন্ত তার লক্ষ্যে পৌঁছতে সমর্থ হবে সে সম্বন্ধে দৃঢ় বিশ্বাসের কথা দিয়ে। তিনি বললেন, "আমি নিজে বিশ্বাস করি কংগ্রেসের একটা পবিত্র কর্তব্য রয়েছে।" সন্দেহাতীত ভাবে নানা বিলম্বের কারণ ঘটেছিল, হতাশা

৭৬। কংগ্রেস রিপোর্ট, ১৯০২

এসেছিল, নানারকম পরীক্ষার মধ্যে চলতে হচ্ছিল। প্রগতির পথে সাময়িক বাধা এসে পড়ছিল। কিছু সময়ের জন্য কংগ্রেসের অবস্থা খুব খারাপ হয়ে পড়েছিল। "প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি এখন বেড়ে চলেছে।" "কিন্তু আমরা কংগ্রেসীরা কখনো পরাজয় স্বীকার করি না।"

সভাপতির অভিভাষণ সরকারের শাসনের, শিক্ষা সংক্রান্ত এবং অর্থনৈতিক নীতির কঠোর সমালোচনায় ভর্তি ছিল। সেগুলিকে কম করে দেখানো বা মোলায়েম ভাবে বলার কোনো চেষ্টাই ছিল না। কোনো সরকারেরই এরকম সোজাসুজি আক্রমণকে খুসি মনে গ্রহণ করবার কথা নয়। এই বক্তৃতায় অবশ্য উদারনৈতিক কংগ্রেসী নেতাদের সাম্রাজ্যের প্রতি আনুগত্য, তাঁদের অন্ধবিশ্বাস যে ইংরেজরা তাঁদের নিজেদের গৌরবময় ইতিহাসের কথা স্মরণ করে নিজেরাই ভারতবর্ষকে তার লক্ষ্যের দিকে নিয়ে যেতে সাহায্য করবেন—এরকম প্রমাণও নিশ্চিত ভাবে ছিল। তিনি বলেছিলেন, "আমাদের মধ্যে রাজনৈতিক আশা আকাঙ্খা, যে রাজনৈতিক আশা আকাঙ্খাতে ফল ধরবার সময় এখন হয়েছে, আমরা দাবি করি, তার সৃষ্টি হয়েছিল ইংরেজদেরই কল্যাণে।... ..ইংরেজদের তাঁদের নীতির ফলকে মেনে নিতেই হবে—তাঁদেরই কল্যাণমূলক শাসনের ফলে যা হয়েছে তা আনন্দের সঙ্গে তাঁদের মেনে নিতে হবে।......ইংল্যাণ্ড যে সমস্ত স্ব-শাসিত রাজ্যের মহিমময়ী মাতা সেই রাজ্যগুলির অন্যতম হওয়ার চাইতে উচ্চ কোনো আকাঙ্খা আমাদের নেই।[৭৭] এটা উদার-নৈতিক বিশ্বাসীদের খোলাখুলি বক্তব্য, এরই ফলে পরে পুরনো জাতীয়তাবাদের সঙ্গে নবীনদের যুদ্ধ বেধে গিয়েছিল এবং এই দুই দল এমনভাবে ভাগ হয়ে গিয়েছিল যার জোড়া আর লাগেনি।

বিশ্ববিদ্যালয় আইন পাস হবার পর সুরেন্দ্রনাথ রিপন কলেজের মালিকানা একটি অছির উপর ন্যস্ত করলেন। এবারে তিনি ঐ বাড়ী তৈরীর অর্থ সংগ্রহের জন্য বেরিয়ে পড়বার মত অবসর পেলেন। তিনি সার এডোয়ার্ড বেকার এবং সার উইলিয়াম ডিউক এই দুইজন উদার মনো-ভাবাপন্ন লেফটেন্যান্ট গভর্ণরের আনুকূল্যে বেশ মোটা সরকারী সাহায্য

৭৭। কংগ্রেস রিপোর্ট, ১৯০২

পেয়েছিলেন। এঁরা দু'জনেই শিক্ষার ব্যাপারে উৎসাহী সমর্থক ছিলেন। পরবর্তী জীবনে সেজন্য তিনি বেশ দুঃখ পেয়েছিলেন। তাঁর আত্মজীবনীর সর্বত্র ছড়িয়ে আছে উষ্ণতায় ভরা শিক্ষাবিদ হিসাবে তাঁর দিনগুলির কথা। তিনি বলেছেন তাঁকে তাঁর ছাত্রদের মধ্যে রাজনৈতিক ধারণা ঢুকিয়ে দেবার জন্য অভিযুক্ত করা হয়েছিল। তিনি কিন্তু দাবী করেন যে, তিনি কেবল ন্যায্য রাজনৈতিক চিন্তাধারা তাদের মনে প্রবেশ করিয়েছিলেন। তাঁর সমগ্র জীবন ধরে তিনি দেশ প্রেমের সঙ্গে সুসংবদ্ধ গঠনতান্ত্রিক প্রগতির শিক্ষা দিয়েছিলেন। ছাত্রেরা যদি পরে অন্যরকম পন্থায় বিশ্বাসী হয়ে থাকে—বৈপ্লবিক নীতির বীজে তাদের বিশ্বাস হতে থাকে, তাহলে তার কারণ ছিল সেই সময়কার অর্থ নৈতিক এবং রাজনৈতিক অবস্থা এবং শাসকদের নিজেদেরই প্রতিক্রিয়াশীল নীতিগুলি। তিনি এরকম হবে সে সম্পর্কে বারবার সাবধান করে দিয়েছিলেন।

নতুন বিশ্ববিদ্যালয় আইনে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট-এর সভ্য হলেন। এর আগে সেনেট-এ এ ধরনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল, তবে তাতে নির্বাচিত প্রার্থীদের ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের আগে গ্র্যাজুয়েট হতে হত। কেন যে ঐ তারিখটা ধার্য করা হয়েছিল তা রহস্যময়। একটা ব্যাখ্যায় বলা হয় যে সুরেন্দ্রনাথ যাতে নির্বাচনে দাঁড়াতে না পারেন সেজন্য তা করা হয়েছিল, কেননা সুরেন্দ্রনাথ গ্র্যাজুয়েট হন ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে।

১৯০১ খৃষ্টাব্দে তিনি বেঙ্গল লেজিস্‌লেটিভ কাউন্সিল-এর সভ্য আর রইলেন না, তবে ইম্পিরিয়াল লেজিস্‌লেটিভ কাউন্সিলের নির্বাচনে দাঁড়ালেন। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন দ্বারভাঙ্গার তৎকালীন মহারাজা। তাঁদের দুজনই সমান সমান দাঁড়ালেন, প্রত্যেকেই পাঁচটা করে ভোট পেলেন, ব্যাপারটা ভারত সরকারের কাছে মীমাংসার জন্য গেল। লর্ড কার্জনএর কর্তৃত্বে ভারত সরকারএর তরফ থেকে নিয়ম অনুসারে দু মাসের মধ্যেই এ ব্যাপারে কিছু করা উচিত ছিল, কিন্তু তা করলেন না, তার বদলে তিন মাস পর নতুন করে নির্বাচনের হুকুম করলেন, তখন সুরেন্দ্রনাথ বেঙ্গল কাউন্সিলের সভ্য না হওয়ায় নিজের ভোটটা নিজেকে আর দিতে পারলেন না।

## চতুর্দশ অধ্যায়

### বঙ্গভঙ্গ, বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলন

বঙ্গভঙ্গের পরবর্তী আন্দোলনের সময় সুরেন্দ্রনাথ তাঁর জনপ্রিয়তার শীর্ষে উঠে গেলেন এবং তিনি এক রকম অঘোষিত রাজা হয়ে গেলেন। লর্ড কার্জন-এর প্রতিক্রিয়াশীল নীতি বঙ্গভঙ্গের সময় সবচেয়ে প্রকট হল; যে জাত আবেগ মণ্ডিত ভাবে তার সংস্কৃতি এবং ঐক্য সম্পর্কে গর্বিত তাকে জীবন্ত অবস্থায় টুকরো টুকরো করে ভাগ করা হল। এটা ঠিকই যে বৃটিশ আমলে ভারতবর্ষের প্রদেশগুলো এলোমেলো বিক্ষিপ্ত ভাবে সাম্রাজ্যবাদী-দের অগ্রসর হবার সঙ্গে সঙ্গে গড়ে উঠেছিল। যে ভাবে গড়ে উঠেছিল তার মধ্যে ভাষাগত, সংস্কৃতিগত, জাতিগত—এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে শাসনগত সুবিধার কোনো রকম যুক্তিই ছিলনা। সেই দৃষ্টিভঙ্গীতে প্রদেশগুলির সীমারেখা বিজ্ঞান-সম্মত ভাবে নতুন করে ধার্য করা অবাঞ্ছনীয় ছিলনা। সত্যি কথা এই যে, কংগ্রেস নিজেই এ নিয়ে এই শতাব্দীর সুরু থেকেই সংগ্রাম করছিল। কিন্তু বাংলাদেশকে ভাগ করাটা ঠিক ভাষাগত বা জাতিগত নীতি অনুসারে প্রদেশ পুনর্গঠন ছিলনা। একটি সম্পূর্ণ, জীবন্ত, চঞ্চল জিনিসকে কেটে দুভাগ করা ছিল এটার আসল উদ্দেশ্য।

১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে বাংলাদেশ থেকে আসামকে পৃথক করা হয়—এর সঙ্গে তিনটে বাংলা ভাষাভাষী জেলাকে যোগ করা হয় এবং একজন চীফ কমিশনার এর শাসনভার গ্রহণ করেন। বাংলাদেশে সেই সময় জনমত অত্যন্ত দুর্বল ছিল তাই আসামের ভেতর তিনটে বাংলা ভাষাভাষী জেলার অন্তর্ভুক্তির বিরুদ্ধে কোন রকম জোর করা সম্ভব হয়নি। গত শতাব্দীর শেষ দশকে উত্তর পূর্ব সীমান্তকে আরো ভাল ভাবে রক্ষার জন্য কর্তৃপক্ষ এর

আয়তন আরো বাড়ানোর জন্য চট্টগ্রাম বিভাগকে এর সঙ্গে অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাব করেন। এই ব্যাপারে জনমত বিরোধিতা করে এবং সাময়িক ভাবে ব্যাপারটাকে স্থগিত রাখা হয়। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে কার্জন সরকার এই ব্যাপারটিকে নতুন করে চালু করার চেষ্টা করেন। এবারে সমগ্র চট্টগ্রাম বিভাগ এবং ঢাকার তুটি জেলাকে নিয়ে পূর্ব বাংলা এবং আসাম নামে একটি নতুন প্রদেশ গঠন করার এবং এটি একজন লেফটেন্যাণ্ট গভর্নর শাসন করবেন এ রকম প্রস্তাব হয়। আঘাতের সঙ্গে সঙ্গে অপমান যোগ করার জন্য বলা হয় এই নতুন প্রদেশের সঙ্গে উত্তর বাংলার ছটি জেলা যুক্ত হবে। সরকারী ব্যাখ্যা হল এই যে, বাংলাদেশ একজন মাত্র লেফটেন্যাণ্ট গভর্নরের পক্ষে বেশ বড় এবং অদল বদলের প্রস্তাবগুলি শাসন সংক্রান্ত সুষ্ঠুতার জন্যই করা হচ্ছে এবং এ ব্যাপারে লর্ড কার্জন খুবই উৎসাহী। জাতীয়তাবাদী বাংলাদেশের কাছে এই ঘোষণা এল হতবুদ্ধিকর আঘাতের মত, বাংলাদেশের শিরদাঁড়া ভেঙ্গে দেবার জন্যই যেন এই পরিকল্পনা এবং বাংলাদেশ থেকে উত্থিত নব জাগরণের স্রোত যা ভারতে ছড়িয়ে পড়ছিল তাকে শেষ পর্যন্ত খতম করাই এর উদ্দেশ্য। এটা ছিল-বিভেদ সৃষ্টি করো, শাসন করো-নীতির ওস্তাদের মার—এর সাহায্যে পূর্ব বঙ্গের এবং আসামের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের সঙ্গে হিন্দুপ্রধান বাংলাদেশের শত্রুতা বাধিয়ে দেওয়াই উদ্দেশ্য ছিল।

ইতিহাসে কখনো কখনো রহস্যময়ভাবে আপাত অমঙ্গল থেকে আশাতীত মঙ্গলের জন্ম হয়, আর দেশ বিভাগের বেলায় তাই ঘটেছিল। বাংলাদেশের গভীরতম স্থান পর্যন্ত এর আলোড়ন স্পর্শ করেছিল। মুসলমানগণ সমেত সর্বশ্রেণীর লোকেরা তাদের জন্মভূমিকে ভাগ করার ব্যাপারে তাদের অসন্তোষ এবং বিরোধিতা প্রকাশ করেছিল। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর থেকে ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের অক্টোবরের মধ্যে তু হাজারেরও বেশি জনসভা হয়েছিল, এই সব জনসভায় ৫০০ থেকে ৫০,০০০ পর্যন্ত লোক সমাগম হয়েছিল। ১৯০৫ সালের মার্চ মাসে কলকাতার একটি জনসভায় খোলাখুলিভাবে বড়লাটের নিন্দা করা হয়েছিল। জনসাধারণের মনের ভাব বুঝতে পেরে সরকার জনমতকে শান্ত করবার চেষ্টা করল।

বেলভেডিয়ারে, লেফটেন্যান্ট গভর্নর সার অ্যাণ্ডরু ফ্রেজার-এর সভাপতিত্বে কতকগুলো সভা হয়, এই সভায় পূর্ববঙ্গের নেতাদের আমন্ত্রণ জানানো হয়। লর্ড কার্জন নিজে পূর্ববঙ্গ সফরে যান এবং বিশেষ করে মুসলমানদের কাছ থেকে তাঁর পরিকল্পনার সমর্থন পাবার জন্য চেষ্টা করেন। তিনি এতে আংশিক সাফল্য লাভ করেছিলেন। নতুন প্রদেশে মুসলমানদের উন্নতির আশার লোভ দেখানোর ফলে কোনো কোনো শ্রেণীর মুসলমান ধীরে ধীরে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন থেকে দূরে সরে যান। তবে তাঁদের মধ্যে অন্যেরা তা মেনে নেননি। ভারত সরকার এবং ভারত সচিবকে শত শত স্মারকলিপি পাঠানো হয়। একটি স্মারকলিপিতে পূর্ববঙ্গের ৭০,০০০ হিন্দু এবং মুসলমানের স্বাক্ষর ছিল।

নেতাদের বুঝিয়ে দলে আনতে না পেরে সরকার তখন খুব গোপনে সব কাজ করতে লাগল। কিছু সময় এমন শান্ততা বিরাজ করছিল তাতে মনে হচ্ছিল যেন পরিকল্পনাটা বাতিল হয়ে গেছে। হঠাৎ, ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ২০শে জুলাই তারিখে বঙ্গভঙ্গের ঘোষণাটা যেন একটা বোমার মত ফেটে পড়ল। লোকেরা হতবুদ্ধি অপমানিত হয়ে পড়ল। তাদের মনে হল তাদের প্রতি চালাকী করা হয়েছে, করা হয়েছে বিশ্বাসঘাতকতা। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ১৬ই অক্টোবরে প্রদেশ বিভাগ পুরোপুরি ভাবে হয়ে গেল, আর ১৮ই নভেম্বরে লর্ড কার্জন ভারত থেকে বিদায় নিলেন।

সরকারের এই গোপনতার অপকৌশল, যার ফলে জনমতকে অগ্রাহ্য করা হয়েছিল সে সম্পর্কে সুরেন্দ্রনাথের বেঙ্গলীতে এভাবে লেখা হয়েছিল : "কর্তৃপক্ষ গোপনে আলোচনা করেছেন, গোপনে পরামর্শ করেছেন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন গোপনেই, এই প্রস্তাবে যাদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হবে সেই কোটি কোটি লোকের সঙ্গে সামান্য পরামর্শও করা হল না। এই কাজকর্মের ভেতর দিয়ে লর্ড কার্জন এবং সার অ্যাণ্ডরু ফ্রেজার যেরকম ভাবে জনমতকে অশ্রদ্ধা করলেন, তেমন জঘন্যভাবে আর কখনো কোনো জনমতকে কেউ অশ্রদ্ধা করেনি। তবে সরকার যেন এই দেশের আত্মার

উপর স্তুতিবাদের মলম চাপিয়ে এই জঘন্য কাজকর্মের বিরুদ্ধে আন্দোলনকে থামিয়ে দেবার কথা না চিন্তা করেন।……[৭৮]

এই প্রদেশ বিভাগ জনসাধারণের মধ্যে যতদূর সম্ভব হতাশা এবং বিরোধিতার সৃষ্টি করল। এমনকি স্টেটসম্যান এবং ইংলিশম্যানের মত ইঙ্গ-ভারতীয় কাগজগুলিও এর বিরোধিতা করল। আবহাওয়াটা প্রচণ্ড অসন্তোষ এবং উত্তেজনায় ভরা ছিল। তখন জনসভা, প্রস্তাব গ্রহণ এবং আবেদন ছাড়াও অন্য অর্থপূর্ণ কিছু করবার সময় এসে গিয়েছিল বলে লোকে মনে করেছিল। এই রকম আবহাওয়ার মধ্যে জনসাধারণের সামনে তুলে ধরা হল বিলিতি বস্ত্র বর্জনের ধারণাটি, আর সঙ্গে সঙ্গে সেটা বিদ্যুতের মত কাজ করল, কলকাতা তো বটেই, জেলাগুলিতেও। কে যে প্রথম এই মত প্রকাশ করেছিলেন তা আর এখন ঠিকমত বলা সম্ভব নয়। সুরেন্দ্রনাথ মনে করেন কয়েকজন লোক একই সঙ্গে এই প্রস্তাব করেন। কেউ বলেন বাংলার বিরাট দেশভক্ত কৃষ্ণ কুমার মিত্র, যিনি বাংলা সাপ্তাহিক কাগজ সঞ্জীবনীর সম্পাদক ছিলেন। তিনি তাঁর কাগজের পৃষ্ঠায় প্রদেশ বিভাগের যোগ্য উত্তর হিসেবে বিলিতি বস্ত্র বর্জন করা উচিত বলে মন্তব্য করেছিলেন।[৭৯] কৃষ্ণ কুমার মিত্রের উদ্দেশ্য ছিল এই বিরাট অবিচার সম্পর্কে সরকারকে অবহিত করা, দেশে বিশাল পরিমাণে বিলিতি মালের আমদানি বন্ধ করা এবং সেই সঙ্গে ভারতবর্ষের যন্ত্রশিল্পকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া

ঐ বয়কট এবং স্বদেশী আন্দোলনের সূচনা হয় ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ৭ই আগষ্টে কলকাতার টাউন হলের এক জনসভায়। ইণ্ডিয়ান মিরর-এর বিখ্যাত সম্পাদক নরেন্দ্রনাথ সেন প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং তা সমর্থন করেন সুরেন্দ্রনাথ। ভারতবর্ষের শিল্প ক্ষেত্রে যে জাতীয় চিন্তাধারা

৭৮। বেঙ্গলী ঃ ১৯০৫ সালের ৭ই আগষ্ট-এর "একটি সাংঘাতিক জাতীয় দুর্ঘটনা" শিরোনামার সম্পাদকীয় দ্রষ্টব্য।

৭৯। হিস্টরি অব ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অ্যাণ্ড ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল ইভলিউশন।

চলছিল তার সঙ্গে এই প্রস্তাব বেশ খাপ খেয়ে যায়। ভারতবর্ষের যন্ত্রশিল্পের ব্যাপারে অসহায় অবস্থা, তার প্রাচীন কালের ক্ষয়িষ্ণু ব্যবসা বাণিজ্য ইতিমধ্যেই কংগ্রেস নেতাদের কাছে বেদনাজনক ভাবে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। কংগ্রেস ইতিমধ্যেই বার্ষিক অধিবেশনের সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রশিল্পের প্রদর্শনী সুরু করেছিলেন যাতে ভারতের যন্ত্রশিল্পকে ধাক্কা দিয়ে এগিয়ে দেওয়া যায়। সুরেন্দ্রনাথ সর্বদাই কংগ্রেস মঞ্চ থেকে যন্ত্রশিল্পকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে একটি প্রধ ন ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। ইতিমধ্যেই বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলার সভা সমিতিতে জনসাধারণ বৃটিশ দ্রব্য বর্জন করে স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার করবেন বলে তাঁদের দৃঢ় প্রতিজ্ঞার কথা প্রকাশ করেছিলেন।

৭ই আগষ্টের সেই অতি গুরুত্বপূর্ণ সভা সুরু হবার প্রাক্কালে বেঙ্গলীর সম্পাদকীয়তে লেখা হয়: "আমরা যা বলেছিলাম তাই হয়েছে। আমাদের দেশবাসী বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রচণ্ডভাবে রুখে দাঁড়িয়েছেন। হয়ত এরফলে লাভ কিছু হবেনা, আঘাতকে সামলানো হয়তো যাবে না, তবে এরফলে প্রচণ্ডভাবে নৈতিক লাভ হবে। আমরা ধ্বংসের ভেতর থেকে প্রচণ্ড রকমের নৈতিক জয় লাভ করতে দৃঢ় সঙ্কল্প··· ··।"[৮০] টাউন হলে সভা হবার পর বেঙ্গলীতে এরকম লেখা হল: "আমাদের কেবল এই ইচ্ছে যে এই সময়ে সমস্ত প্রদেশে বাংলাদেশ বিভাগের ফলে লোকের যে দুঃখ এবং ক্ষোভ হয়েছে তা স্বচক্ষে দেখবার জন্য লর্ড কার্জন এবং সার অ্যাণ্ডরু ফ্রেজার উপস্থিত থাকলে ভাল হত······এটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে আমরা এখন আন্দোলনের নতুন পর্যায়ে প্রবেশ করছি। আমরা অগুণতি সভা সমিতিতে প্রতিবাদ করেছি, প্রার্থনা করেছি, কিন্তু সরকার আমাদের কথায় কর্ণপাত করেননি। ভারত সরকার এই ভাবে জনমতকে তাচ্ছিল্য করার ফলে আমরা শান্তিপূর্ণ ভাবে প্রতিরোধ করতে এখন বাধ্য হচ্ছি··· ···বাংলাদেশ আজ শোকগ্রস্ত।[৮১]

৮০। "দি টাউন হল মিটিং" ৪ঠা আগষ্ট ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের সম্পাদকীয় দ্রষ্টব্য।

৮১। "দি টাউন হল মিটিং" ১০ই আগষ্ট ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের সম্পাদকীয় দ্রষ্টব্য।

এই সমস্ত সম্পাদকীয় মন্তব্য থেকে এটা স্পষ্ট যে প্রয়োজন হলে সুরেন্দ্রনাথের অগ্নিরূপী দেশপ্রেম শান্তিপূর্ণ প্রতিরোধ করতে ইতস্তত করত না। প্রদেশ বিভাগের সময় যে বর্জন আন্দোলন করা হয় সেরকম আর আগে কখনো হয়নি। এটা একটা নতুন পথ দেখিয়েছিল, এক হিসাবে এটা ছিল বৈপ্লবিক ধারণা। আর সুরেন্দ্রনাথ তখন আহত বাংলার আন্দোলনের কেন্দ্রস্থল হয়ে পড়লেন। যদি চীনেরা সাফল্যের সঙ্গে অ্যামেরিকান দ্রব্য বর্জন করতে সক্ষম হয় তাহলে ভারতবাসীরা বৃটিশ দ্রব্য বর্জন করতে কেন পারবে না? এই আন্দোলন পরে গান্ধীজীর আরো অনেক বড় গণসংগ্রামের পথ প্রশস্ত করেছিল।

৭ই আগষ্টের প্রস্তাবে ছিল: "মফঃস্বলে আহুত বহু সভায়, যতদিন না পর্যন্ত প্রদেশ বিভাগ প্রস্তাব পরিত্যাজ্য হয় ততদিন পর্যন্ত বৃটিশ কারখানায় উৎপন্ন দ্রব্যাদি ক্রয় বন্ধ রাখার যে বহু প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, সেই সমস্ত প্রস্তাবের প্রতি এই সভার পূর্ণ সমর্থন আছে। বৃটিশ জনসাধারণের ভারতবর্ষের ব্যাপারে ঔদাসীন্য এবং তাহার ফলে বর্তামন সরকার ভারতের জনমতকে অমান্য করিয়াছে বলিয়া এই প্রস্তাবে তাহার বিরোধিতা করা হইতেছে।"

এই বর্জন তাই একটি অস্থায়ী ব্যাপার ছিল। যতদিন পর্যন্ত দেশ বিভাগ প্রস্তাব থাকবে বৃটিশ দ্রব্য বর্জনও ততদিনই চলবে এই স্থির হয়। সুরেন্দ্রনাথ সমেত এই প্রস্তাবের উদ্যোক্তাগণ চেয়েছিলেন যাতে এরফলে খুব বেশি জাতি-বৈরিতার সৃষ্টি না হয় এবং ইংরেজদের মধ্যে যাঁরা আন্তরিক ভাবে ভারতবর্ষের বন্ধু তাঁদের শত্রু করে তোলা না হয়।

তাঁর অতি প্রিয় ব্যাপার নিয়ে এই আন্দোলনের সুরু থেকে সুরেন্দ্রনাথ অক্লান্তভাবে নিজেকে যুক্ত রেখেছিলেন। তিনি সভার পর সভায় জনগণকে, বিশেষ করে যুবক এবং ছাত্রদলকে, সনির্বন্ধ অনুরোধ করলেন যেন তারা আবেগের সঙ্গে স্বদেশী আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। বাস্তবিক, ঐ আন্দোলন তাঁকে জীবনের "সবচেয়ে বেশি আবেগ"-এর মধ্যে টেনে নিয়ে গেল এবং সম্পূর্ণভাবে ঐ উদ্দেশ্যে তিনি নিজেকে

নিয়োজিত করলেন। যুবকদের উৎসাহ প্রবলতম হয়ে উঠল। তারা স্বদেশী জিনিসপত্র নিয়ে ফেরি করে বেড়াতে লাগল, বিদেশী দ্রব্য বেচে এমন সব দোকানের সামনে জমায়েত হয়ে দোকানে ঢুকতে লোকদের বাধা দিতে লাগল এবং স্বদেশীর মাহাত্ম্য বোঝাতে লাগল। অনেকেই, বিশেষ করে যারা সরকারী শিক্ষালয়ে পড়াশুনো করত, লেখাপড়া ছেড়ে দিল। ঘরে মেয়েরা স্বদেশীকে আরো উৎসাহের সঙ্গে গ্রহণ করল। এমনকি ছোটদের পর্যন্ত এ ব্যাপার গভীরভাবে স্পর্শ করল। সুরেন্দ্রনাথ তাঁর এক পাঁচ বছর বয়সের নাতনীর কথা বললেন, যে তার আত্মীয়ের কাছ থেকে এক জোড়া বিলিতি জুতো উপহার নিতে অস্বীকার করে। তিনি আরো শুনেছিলেন ( তৎকালীন একজন বিখ্যাত ডাক্তারের কাছ থেকে ) কেমন করে তাঁর একজন ছোট মেয়েরোগী বিকারের ঘোরে বলে উঠেছিল যে সে বিদেশী ওষুধ গ্রহণ করবে না।

আন্দোলনের অনেকগুলি দিক ছিল, জীবনের তিনটি প্রধান ব্যাপারের সঙ্গে এর যোগাযোগ—অর্থনৈতিক, শিক্ষানৈতিক এবং রাজনৈতিক। অর্থনৈতিক দিক থেকে এই আন্দোলন বাংলাদেশে এবং অন্যান্য জায়গায় শিল্পের ক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ নতুন যুগের সূচনা করেছিল। শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষা বর্জনের ফলে ন্যাশনাল কাউন্সিল অব এডুকেশন-এর উৎপত্তি হয়—এর সঙ্গে সুরেন্দ্রনাথ নিবিড়ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। সুরেন্দ্র-নাথ নিজেই বলেছেন, এ ব্যাপারটি জাতীয় জাগরণের সঙ্গে একই সঙ্গে ঘটেছিল—সেটা হয়েছিল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসকে অনুসরণ করে। এরফলে বাংলার জীবনের প্রধান প্রধান সমস্ত ক্ষেত্রে, তার মধ্যে সংস্কৃতিও ছিল, নতুন করে সৃষ্টি করবার এক শক্তির উদ্ভব হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই নতুন জাতীয় চেতনার একজন প্রচণ্ড আবেগপূর্ণ চারণ কবি।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ১৬ই অক্টোবর তারিখের সেই চরম দিনে, যে দিন বাংলাদেশকে ভাগ করা হয় সেদিন সারা বাংলাদেশে জাতীয় শোকদিবস পালিত হয়েছিল। সেই দিন হাজারে হাজারে লোক উপবাস করে, প্রত্যেকে প্রত্যেকের হাতে রক্ত রাখী পরিয়ে দিয়ে প্রায়শ্চিত করে। এই রাখী ছিল অটুট ভ্রাতৃপ্রেমের প্রতীক। ঐ দিনই বিকেলে, সুরেন্দ্রনাথের

পরামর্শে ফেডারেশন হলের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হয়—যদি বঙ্গভঙ্গ শেষ পর্যন্ত রোধ না করা যায় তাহলে যুক্ত বাংলার প্রতীক হয়ে থাকবে এই হলটি। এই সভায় সভাপতিত্ব করবার জন্য অসুস্থ নেতা আনন্দমোহন বসুকে 'ইন্‌ভ্যালিড্' চেয়ারে বসিয়ে নিয়ে আসা হয়। পরে আর একটা জনসভায়, তাঁতীদের সাহায্যের জন্য, একটি জাতীয় তহবিলের প্রবর্তন করলেন সুরেন্দ্রনাথ। সুরেন্দ্রনাথ তাঁর সহকর্মীদের সঙ্গে নিয়ে সভার পর সভায় বক্তৃতা করতে লাগলেন। কোনো কোনো সভায় শ্রদ্ধা জানাবার জন্য লোকে তাঁর পায়ের ধুলো নিয়েছিল, আবার কোনো কোনো সভায় লোকেরা ভক্তি দেখানোর জন্য এতই অধীর হয়ে ভীড় করত যে কোনো-ক্রমে তাঁকে সেই জনচাপ থেকে বেশ কষ্টের সঙ্গে রক্ষা করা হত। সুরেন্দ্রনাথ হয়ে পড়লেন নব জাগরিত স্বদেশী চেতনার জীবন্ত প্রতীক।

এই অভূতপূর্ব জন-উত্থানে ভীত হয়ে সরকার জনসাধারণের উপর দমন নীতির কল চালিয়ে দিলেন। কিন্তু ফলে আন্দোলন আরো জোরালো হল। সরকার ইস্তাহার জারি করে স্কুল এবং কলেজ কর্তৃপক্ষকে জানালেন যে তাঁরা যেন ছাত্রদের বিলিতি দ্রব্য বর্জন, পিকেট করা এবং আন্দোলনের অন্যান্য ব্যাপার থেকে দূরে রাখেন নইলে নানারকম শাস্তি দেওয়া হবে বলে ভয় দেখান হয়। পূর্ব বাংলার নতুন সরকার বহু নিষেধাজ্ঞা জনিত ইস্তাহারের মধ্যে একটিতে প্রকাশ্যে বন্দেমাতরম্ গান গাওয়া বে-আইনী বলে ঘোষণা করলেন। বৃটিশ সরকারের একজন সবজান্তা অফিসার, তাঁর প্রচণ্ডতম জ্ঞানের দাপটে আবিষ্কার করলেন যে বঙ্কিমচন্দ্রের ঐ সরল, দেশপ্রেমপূর্ণ ধর্মসঙ্গীতে মা-কালীকে প্রতিশোধ নেবার জন্য আবাহন করা হচ্ছে। কিন্তু আমলাতান্ত্রিক নিষেধাজ্ঞার ফলে গানটিকে চেপে দেওয়া সম্ভব হয়নি, এরফলে স্বাধীনতা পাবার আগেই এটি জাতীয় সঙ্গীতের পর্যায়ে উঠে গিয়েছিল। ইতিমধ্যে এই প্রদেশ বিভাগ, সেই সময়ের জন্য হলেও কার্যত সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল, অন্তত সরকার বারবার তাই ঘোষণা করেছিলেন। পরে কেমন ভাবে প্রদেশ বিভাগকে বানচাল করা হয় সে আর এক কাহিনী।

যদিও ব্যাপারটা ছিল একটা প্রদেশকে নিয়ে, তা হলেও বঙ্গভঙ্গ একটা জাতীয় ব্যাপার হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করল এবং সমগ্র ভারতবর্ষে এর জন্য সহানুভূতির সৃষ্টি হল। কংগ্রেস সাধারণত প্রদেশভিত্তিক কোনো ব্যাপারে থাকত না, কিন্তু বঙ্গভঙ্গ ব্যাপারটি বিরাট একটি জাতীয় গুরুত্ব হিসারে স্বীকৃতি পেল। এরকম অবস্থা তো অন্য কোনো প্রদেশেরও হতে পারে? "এইভাবে পারসী, মারাঠী, মাদ্রাজী, সিন্ধী ও পাঞ্জাবীরা বাঙ্গালীর সঙ্গে এক হয়ে সেই অনড় সিদ্ধান্তকে নড়িয়ে দিয়েছিল।"[৮২] "বাংলার স্বার্থ ভারতের স্বার্থ হয়ে দাঁড়াল।"[৮৩] এর আগে ১৯০৩ সালেই যখন সবে বঙ্গভঙ্গ করবার প্রস্তাব হয়েছে এবং ১৯০৪ সালে যখন জনসাধারণের সামনে প্রশ্নটা এসে উপস্থিত হয়েছে, কংগ্রেস এই প্রস্তাবগুলির জোর বিরোধিতা করে প্রস্তাব গ্রহণ করে। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেসের কাশী অধিবেশনে সভাপতি হিসেবে গোখলে বলেন: "আমাদের জাতীয় প্রগতির পথে প্রদেশ বিভাগ সঞ্জাত ব্যাপারে জনমত বাংলাদেশে যেমন প্রচণ্ডভাবে ফেটে পড়েছে তা স্মরণীয় হয়ে থাকবে……এই দেশের জনজীবন প্রচণ্ড প্রয়োজনীয় শক্তির অধিকারী হয়েছে, যার জন্য সমগ্র ভারত বাংলাদেশের কাছে কৃতজ্ঞ।"[৮৪] কংগ্রেসে প্রদেশ বিভাগের বিরুদ্ধে প্রস্তাব তুলে সুরেন্দ্রনাথ ঘোষণা করলেন যে যতদিন না বঙ্গভঙ্গ রোধ করা হয় ততদিন আন্দোলন চলবে। গোখলে বিলিতি দ্রব্য বর্জনকে রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে সম্পূর্ণ ভাবে সমর্থন করালেন। তিনি বললেন এটি শেষ অস্ত্র হিসেবে প্রয়োগ করা উচিত, এই সঙ্গে তিনি স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারের জন্য বেশ জোর দিয়ে বললেন। কংগ্রেস বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রস্তাব গ্রহণ করলেন এবং সরকারের দমন নীতির নিন্দা করলেন।

পরের বছর কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে আবার বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রস্তাব গৃহীত হল। সেখানে বলা হল যে বিলিতি দ্রব্য বর্জন আইনসঙ্গত, আর সেই সঙ্গে স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারের আন্দোলন সম্পর্কে

৮২। ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল ইভলিউশন।
৮৩। হিস্টরি অব দি কংগ্রেস,—ডক্টর সীতারামাইয়া।
৮৪। হাউ ইণ্ডিয়া রট ফর ফ্রীডম।

সহৃদয় সমর্থন জানানো হল। বঙ্গভঙ্গ সংক্রান্ত প্রস্তাবটি একজন মুসলমান, ঢাকার নবাব খাজা আতিকুল্লা উত্থাপন করেন। তিনি হিন্দু এবং মুসলমানকে মিলে মিশে এর বিরোধিতা করতে বলেন। এই প্রস্তাবকে সমর্থন করে সুরেন্দ্রনাথ প্রচণ্ড আবেগের সঙ্গে বলেন: "আমাদের অপেক্ষা করতেই হবে; এছাড়া করবই বা কি? আমাদের শাসকদের কাছে ধর্ণা দিয়ে থাকাই আমাদের ভাগ্য……। আমরা নিশ্চয়ই অপেক্ষা করব, তবে আমাদের শাসকদের কাছে দুর্বল ভাবে নয়, বা তাদের আদেশকে অমোঘ নিয়তি বলে মনে করেও নয়, আমরা ঐ নিয়তিকে পরাস্ত করে নিজেদের মুক্তি নিজেরা খুঁজে নিতে চাই।"[৮৫] ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজে এর পরের অধিবেশনে বঙ্গভঙ্গ এবং স্বদেশী জিনিস ব্যবহার সম্পর্কে একই রকম প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। বাংলাদেশের সমস্যা এরকম করে সমস্ত ভারতের সমস্যা হয়ে দাঁড়াল।

কংগ্রেসের প্রথম দিকের উদারপন্থীদের পক্ষে বিলিতি বর্জন ব্যাপারটা মেনে নেওয়া শক্ত ছিল, কেননা এরমধ্যে বর্ণ সংক্রান্ত স্বাতন্ত্র্য ছিল বলে মনে করা হয়েছিল। তাঁরা এটিকে শেষ আইনসঙ্গত অস্ত্র হিসেবে এবং কেবলমাত্র বাংলাদেশের জন্য ঐ বিশেষ পরিবেশে মেনে নিয়েছিলেন। স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার অবশ্য অত গোলমেলে ছিল না তাই বিলিতি বর্জনের চাইতে তা অধিকতর গ্রহণীয় হয়েছিল। এর মধ্যে এমন একটা ঘটনা ঘটল যার ফলে তখনকার সময়কার উত্তেজনা আরো বেড়ে গেল, এবং ব্যাপারটা বেশ সঙ্গীন হয়ে দাঁড়াল। বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল কনফারেন্স ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের এপ্রিলে বরিশালে হবার কথা ছিল—বঙ্গ বিভাগের ফলে বরিশালকেও বাইরে চলে যেতে হয়েছিল। পূর্ব বাংলার অন্যান্য শহরের মত বরিশালের রাস্তাতেও বন্দেমাতরম্ সঙ্গীত নিষিদ্ধ হয়েছিল। সুরেন্দ্রনাথ এবং তাঁর দলের প্রতিনিধিবর্গ বরিশালে পৌঁছে জানতে পারলেন যে কর্তৃপক্ষ স্থানীয় নেতাদের, যাঁরা ঐ সম্মেলন আহ্বান করেছিলেন তাঁদের, এটা প্রতিশ্রুতি দিতে বাধ্য করেছেন যে প্রতিনিধিদের সম্বর্ধনার সময় বন্দেমাতরম্ ধ্বনি করা হবে না। এটা সুরেন্দ্রনাথ এবং তাঁর

৮৫। হাউ ইণ্ডিয়া রট ফর ফ্রীডম।

সঙ্গীদের খুব আপত্তিজনক বলে মনে হল, বিশেষ করে প্রতিনিধিদের মধ্যেকার তরুণেরা এ ব্যাপারে আরো বিশেষ ভাবে তা মনে করল। যাই হোক, একটা রফা হিসেবে সাব্যস্ত হল যে কেবলমাত্র অভ্যর্থনা করবার সময় বন্দেমাতরম্ ধ্বনি দেওয়া হবে না, অন্য সময়ে এই ধ্বনিতে বাধা থাকবে না।

ঐ প্রতিনিধিদের শোভাযাত্রা, স্বদেশীর উত্তেজনায় মুখর হয়ে সুরেন্দ্রনাথ, অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক মতিলাল ঘোষ এবং ভূপেন্দ্রনাথ বসুকে সামনে রেখে বার হল। প্রত্যেককে বলা হয়েছিল তাঁরা যেন শান্তিপূর্ণভাবে চলেন এবং কোনোরকম উত্তেজনার সৃষ্টি না করেন। কিছু সময় শোভাযাত্রা বিনা বাধায় এগুলো। কিন্তু যে মুহূর্তে তরুণ প্রতিনিধিরা শোভাযাত্রায় যোগ দিল পুলিস তক্ষুনি আক্রমণ সুরু করল, যদিও তারা তখনও বন্দেমাতরম্ ধ্বনি দেয়নি। পুলিসের লাঠি খুব জোর তাদের উপর এসে পড়ল—যেখানে সেখানে এলোপাথারিভাবে এবং মাতৃভূমির জন্য রক্তপাত হল। কোনোরকম প্ররোচনা দেওয়া হয়নি তা সত্ত্বেও শান্তিপূর্ণ সমাবেশের উপর এই আক্রমণ করা হয়েছিল। কিন্তু ঐ দমনের ফলে প্রতিজ্ঞা আরো দৃঢ় হল। পুলিসের লাঠি যত পড়তে লাগল শোভাযাত্রীরা ততই চেঁচিয়ে বলতে লাগল, বন্দেমাতরম্, আর পাকা শান্তিপূর্ণ প্রতিরোধকারীদের মত অখণ্ড শান্ততার মধ্যে ঐ আক্রমণ সহ্য করতে লাগল। পুলিস সুপারিনটেণ্ডেণ্ট কেম্পকে সামনে দেখতে পেয়ে সুরেন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করলেন, কেন তিনি শোভাযাত্রীদের এরকম ভাবে মারছেন? তিনি বললেন: "যদি তারা কিছু করে থাকে সেজন্য শাস্তি আমার প্রাপ্য, কেননা সেজন্য আমিই দায়ী। গ্রেপ্তার করতে হয় আমাকে করুন।" তাঁকে গ্রেপ্তার করা হল। যখন অন্যেরা সবাই গ্রেপ্তার হবার জন্য এগিয়ে এলেন তখন কেম্প বললেন, তাঁকে "কেবলমাত্র ব্যানার্জীকে" গ্রেপ্তার করবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

সুরেন্দ্রনাথকে ম্যাজিস্ট্রেট এমারসনের এজলাসে নিয়ে যাওয়া হল। তিনি যখন চেয়ারে বসতে যাচ্ছেন তখন ম্যাজিস্ট্রেট খুব কঠোরভাবে আসামীকে তাঁর সামনে চেয়ারে বসতে নিষেধ করলেন। সুরেন্দ্রনাথ

উত্তর দিলেন যে তিনি সেখানে ম্যাজিস্ট্রেটের অপমান গ্রহণ করবার জন্য আসেননি, তিনি আশা করেছিলেন ভদ্র এবং সংযত ব্যবহার। এই সময় সুরেন্দ্রনাথকে ক্ষমা প্রার্থনা করতে বলা হয় কিন্তু তাতে তিনি অসম্মত হন। রুষ্ট ম্যাজিস্ট্রেট তখন তাঁকে আদালত অবমাননার জন্য ২০০ টাকা জরিমানা করেন এবং আইন ভাঙ্গবার জন্য পরে ঠিক ঐ পরিমাণ টাকা পুলিসের মামলার বাবদ জরিমানা করা হয়। জরিমানার টাকা জমা দেবার পর সুরেন্দ্রনাথ অধিবেশনে বিনা বাধায় যোগ দেন।

অধিবেশনের জন্য যে মণ্ডপ করা হয়েছিল সেখানে প্রচণ্ড উত্তেজনা, কেননা শোভাযাত্রার উপর নির্দয়ভাবে আক্রমণ করা হয়েছিল। পুলিস শোভাযাত্রীদের উপর কেবল লাঠি চালিয়েই ক্ষান্ত হয়নি, চিত্তরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা নামে একজন তরুণকে তারা নির্দয়ভাবে প্রহার করে জল ভতি একটা পুকুরে ফেলে দিয়েছিল। পূর্ববঙ্গ সরকারের দমন নীতির বিরুদ্ধে প্রস্তাব গ্রহণ করার পর ঐ অধিবেশনের সমাপ্তি ঘটে।

পরদিন যখন অধিবেশন চলছে, পুলিস এসে সভাপতি আবদুল রসুলকে বলল যে সরকারী আদেশ অনুযায়ী ঐ অধিবেশন নিষিদ্ধ হয়েছে। এই ভুল আদেশের প্রতি যদিও সবাইকার বিরূপতা ও তিক্তভাব হয়েছিল, তবুও প্রতিনিধিরা এই আমলাতান্ত্রিক আদেশের কাছে নতি স্বীকার করলেন। একটি সাহিত্য সভা, যাতে যোগ দেবার জন্য কলকাতা থেকে রবীন্দ্রনাথ এসেছিলেন, সেটিও পরিত্যক্ত হল। এই সময় সর্বদা উত্তেজনা বজায় থাকা সত্ত্বেও লোকেরা অদ্ভুত নিয়মানুবর্তিতা এবং সংযমের পরিচয় দিয়েছিল। অহিংস প্রতিরোধের এ এক অদ্ভুত পরীক্ষা হল।

পূর্ব বাংলার নতুন সরকার সার ব্যাম্পফীল্ড ফুলার-এর নেতৃত্বে দমন নীতির চরম দেখালেন বলপূর্বক অধিবেশন ভেঙ্গে দিয়ে এবং শান্তিপূর্ণ শোভাযাত্রীদের উপর পুলিসের মারপিট চালিয়ে। আরো খারাপ করা হল সাম্প্রদায়িকতার বিষ বেশ তৎপরতার সঙ্গে ছড়িয়ে দিয়ে। তখন ইচ্ছে

করে হিন্দু সমাজের সম্মানিত লোকদের উপর মিলিটারি পুলিসের সাহায্যে অত্যাচার করা হতে লাগল। গভর্নরের মত একটা উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হয়ে তিনি একটা কুৎসিত মন্তব্য করলেন যে তাঁর দুই স্ত্রী, একজন হিন্দু এবং একজন মুসলমান। এর মধ্যে তিনি শেষের জনকেই বেশি পছন্দ করেন।

তারপর দিন সুরেন্দ্রনাথ কয়েক মাইল দূরে বরিশালের অভ্যন্তরে বিনাবাধায় একটি প্রদেশ-বিভাগ-বিরোধী সভা করেন—পুলিস সেখানে সভা শেষ হয়ে যাবার পর পৌঁছনয় কিছু করতে পারে নি। এরপর তিনি কলকাতার দিকে রওনা দেন। প্রতিটি স্টেশনে - ষ্টীমার বা ট্রেন যেখানেই থেমেছে সেখানেই প্রচণ্ড উচ্ছাসে জনগণ তাঁকে এক ঝলক দেখবার জন্য পাগল হয়ে উঠেছে। কয়েক দিন ধরে তাঁর বিশ্রাম ছিলনা, ঘুম ছিলনা, বক্তৃতা দিতে দিতে তাঁর গলা ভেঙ্গে গিয়েছিল। সমস্ত সভাতেই তিনি স্বদেশী ব্যবহারের প্রতিজ্ঞার কথা বলেছেন—এই আন্দোলনটির প্রকৃতি কিরকম হবে তা তিনি নিজেই আগে স্থির করেছেন—তা হল, জনসাধারণকে দেশী জিনিসপত্র ব্যবহার করতে হবে এবং বিলিতি জিনিস ব্যবহার থেকে বিরত থাকতে হবে। কলকাতায় পৌঁছে তিনি আর একবার প্রচণ্ড উৎসাহ এবং উদ্দীপনার মধ্যে বক্তৃতা দেন, তাতে তিনি জনসাধারণকে প্রদেশ বিভাগের বিরোধিতা করে দৃঢ়ভাবে আন্দোলন করতে বলেন। সুরেন্দ্রনাথ বললেন : "মানুষের জীবনে এক একটা মুহূর্ত আসে যে জন্য বেঁচে থাকা সার্থক মনে হয়। আমার পক্ষে সেটা সেই রকমের মুহূর্ত ছিল।"[৮৬] তাঁর রাজনৈতিক জীবনে এই সময়টাই শ্রেষ্ঠ ছিল।

৮৬। এ নেশন ইন মেকিং

## পঞ্চদশ অধ্যায়

## চরম পন্থার অভ্যুত্থান

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের ঝড় যেমন বেড়ে উঠতে লাগল, তখন অত্যন্ত ভয়াবহ এবং অস্বস্তিকর জন চাঞ্চল্য দেখা দিতে লাগল। বাংলার তরুণদের বৈপ্লবিক কাজকর্মের প্রতি ভক্তি বেড়ে উঠল এবং তাদের মনে শক্তিশালী প্রভাব বিস্তার করতে লাগল। সাপ্তাহিক যুগান্তরে বিপ্লবের সমর্থনে প্রচার চলতে লাগল। প্রথমে বিপিন চন্দ্র পাল ও পরে অরবিন্দ ঘোষের সম্পাদনায় প্রকাশিত বন্দেমাতরম্-এ চরম পন্থায় এবং সম্পূর্ণ স্বায়ত্ব শাসনের সমর্থনে রচনা প্রকাশিত হতে লাগল। ব্রহ্ম বান্ধব উপাধ্যায়ের বাংলা কাগজ, 'সন্ধ্যা'-তে খুব জোরালো ভাষায় লেখা হতে লাগল। সরকার দমন-চক্র চালিয়ে দিলেন পূর্ণ গতিতে। চরমপন্থী কাগজগুলিকে শাস্তি দেওয়া হল, বড় বড় নেতাদের ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের অপ্রচলিত তিন আইনের সাহায্যে বিনা বিচারে দ্বীপান্তরে পাঠানো হতে লাগল। সুরেন্দ্রনাথকেও দ্বীপান্তরে হয়ত পাঠানো হত, কিন্তু তখন সার এডওয়ার্ড বেকার বাংলার লেফটেন্যান্ট গভর্নর হয়েছেন, তিনি সুরেন্দ্রনাথকে ভালভাবে জানতেন, এবং তাঁরই শেষ মুহূর্তের হস্তক্ষেপের ফলে সুরেন্দ্রনাথকে দ্বীপান্তর নির্বাসনে যেতে হয়নি। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে মজঃফরপুরে সাংঘাতিক বোমা ছোড়ার ঘটনা ঘটেছিল, যার ফলে ক্ষুদিরামের ফাঁসি হয় এবং প্রফুল্ল চাকী আত্মহত্যা করেন। এর পরই মুরারীপুকুর ষড়যন্ত্র আবিষ্কার এবং তার বিচার হয়। ঐ সময়কার চিন্তা এবং মনোভাব সুরেন্দ্রনাথ তাঁর আত্মজীবনীর একটি ঘটনার সাহায্যে ফুটিয়ে তুলেছেন। একদিন সন্ধ্যায়, বরিশাল অধিবেশনের কয়েক মাস পর, দুজন যুবক গোপনে তাঁর ব্যারাকপুরের বাড়ীতে সাক্ষাৎ করে এবং জিজ্ঞেস করে তারা

বাংলার লেফটেন্যাণ্ট গভর্নর সার ব্যাম্পফীল্ড ফুলারকে গুলি করে মারতে চায় এবং এ ব্যাপারে সুরেন্দ্রনাথ কি বলেন। তারা বরিশালের বানারিয়া পাড়ায় অবস্থানকারী সৈন্য কর্তৃক এখানকার কিছু মহিলার উপর অত্যাচারের প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিল। তাদের এই বিপজ্জনক পথ থেকে ফিরিয়ে আনতে সুরেন্দ্রনাথকে বিশেষ বেগ পেতে হয়েছিল।

যদিও সুরেন্দ্রনাথ বিবর্তনে বিশ্বাসী ছিলেন, তবু তিনি এটা বেশ বুঝতে পেরেছিলেন যে সাম্প্রতিক ঘটনাবলী যুবকদের বিধিসঙ্গত উপায়ের প্রতি বিশ্বাস টলিয়ে দিয়েছিল এবং তাদের হিংসা ও রক্তপাতের পথে ঠেলে নিয়ে গিয়েছিল। যদিও এরকম উপায়ের তিনি প্রচণ্ড বিরোধী ছিলেন, তিনি কর্তৃপক্ষের দারুণ ভুলের জন্যই, বিশেষ করে তাদের দমন নীতির জন্য এগুলো হচ্ছে বলে তাদের উপর দোষারোপ করেন। তিনি তাঁর দৃঢ় বিশ্বাসকে অকপট ভাষায় প্রকাশ করেন—"বঙ্গভঙ্গ এবং তার পরবর্তী-কালীন নীতি আমার প্রদেশের আন্দোলনের মূল কারণ, যদিও এর সঙ্গে অর্থনৈতিক কারণ যোগ হওয়াতে আন্দোলন আরো জোরদার হয়েছে।"[৮৭] খুব রহস্যের ব্যাপার এই যে, নতুন সেক্রেটারী অব ষ্টেট, লর্ড মরলি—যিনি দেশ বিভাগকে পছন্দ না করার মত উদার ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি বঙ্গভঙ্গকে, "অনড় ব্যাপার" বলে মনে করতেন এবং যদিও তিনি দমন নীতির এবং বিনা বিচারে দ্বীপান্তরে নির্বাসন দেওয়ার বিরোধী ছিলেন, তিনি কিছুতেই স্থানীয় শাসকদের তা বোঝাতে পারেননি। ফলে একই রকম নীতি চালু রইল।

এর মধ্যে কংগ্রেসী উপায়ে বিধিসম্মত আন্দোলনে অসন্তোষ প্রকাশ করতে লাগলেন কংগ্রেসরই একটি অংশ। তাঁরা কেবল যে আন্দোলনের ধারাকে বদলাতে চেয়েছিলেন তা নয়, তাঁরা আন্দোলনের লক্ষ্য সম্পর্কেও পুরনো যুগের মত বদলালেন, পুরনো রাজনৈতিক মূল দর্শন বদলে ফেললেন। প্রদেশ বিভাগ তাঁর মনে প্রবল বৃটিশ বিরোধী প্রতিক্রিয়া

৮৭। এ নেশন ইন মেকিং

এনে দিয়েছিল, উদারনৈতিক কংগ্রেস নেতাদের বৃটিশ শাসনের উপকার সম্বন্ধে প্রায় অখণ্ড বিশ্বাসের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক ছিলনা। টিলকের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সংগ্রামী জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটেছিল, এখন তা আবার নতুন করে জোর পেল। পুরনো জাতীয়তাবাদের সঙ্গে নতুন জাতীয়তাবাদের ভেতরকার বিরোধ এই সময় থেকে বেড়েই চলল। পুরনো চিন্তাধারা তখনো বৃটিশদের কথাবার্তা এবং উদারতায় বিশ্বাসী রইল, কিন্তু নতুন চিন্তাধারার এ সম্পর্কে কোনো মোহ রইলনা, তা বিশ্বাস করল যে স্বাধীনতা আনতে গেলে তা নিজের জোরেই আনতে হবে। এঁরা বিশ্বাস করতেন যে বৃটিশ শাসকরা কখনো ভারতবর্ষের লক্ষ্যে পৌঁছতে সাহায্য করবেনা, আর ঐ শাসনের ফলে যে উপকার পাওয়া যাচ্ছে, তা সে যতই অমূল্য হোক না কেন, রাজনৈতিক বশ্যতার ক্ষতিপূরণ করতে পারেনা। পুরনো জাতীয়তাবাদ নতুন উৎসাহের স্রোতের মুখে হারিয়ে গেল। কাউন্সিল হল থেকে অধিবেশনের প্যাণ্ডেল পর্যন্ত রাজনৈতিক ক্ষেত্র জনসাধারণের দিকে সরে যেতে লাগল। রাজনীতি আর কেবল বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রইলনা, এখন তা সাধারণ লোকের ব্যাপারে দাঁড়িয়ে গেল।

১৯০৬ খৃষ্টাব্দের শিবাজী উৎসবে টিলক কলকাতায় উপস্থিত ছিলেন এবং খুব উৎসাহের সঙ্গে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী কাজকর্মে অংশ গ্রহণ করেছিলেন এবং বৃটিশ দ্রব্য বর্জন, স্বদেশী জিনিসের ব্যবহার এবং শিক্ষার ব্যাপারে যোগ দিয়েছিলেন। তিনি খুব উৎসাহের সঙ্গে বিদেশী দ্রব্য বর্জন সম্পর্কে প্রচার চালাতে লাগলেন, এই অস্ত্রটি ছিল বেশ জোরালো, এর সাহায্যে মুষ্টিমেয় কিছু ইউরোপীয় এবং প্রচুর ভারতীয় মিলে যে শাসন চলছিল তা বানচাল করে দেওয়া যেত। বিপিন চন্দ্র পাল উপহার হিসেবে স্বরাজ চাননি, তিনি চেয়েছিলেন তাঁর নিজের হাতে তা অর্জন করতে। অরবিন্দ ঘোষের মত অনুসারে জাতীয়তাবাদ ধর্মের জন্ম ভগবান থেকে। তিনি শান্তিপূর্ণ প্রতিরোধ এবং আত্মনির্ভরতা এই দুটি ফলদায়ক রাজনৈতিক

অস্ত্র ব্যবহার করার কথা প্রচার করতেন। চরমপন্থার অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে গোপন বৈপ্লবিক কার্যকলাপ বিশেষ করে বাংলাদেশে এবং পাঞ্জাবে বেড়ে চলল।

সুরেন্দ্রনাথ বঙ্গভঙ্গ জনিত আন্দোলনে গভীরভাবে ব্যাপৃত ছিলেন —তিনি ছিলেন এর অবিসংবাদিত নেতা—এর পেছনের প্রেরণা। চরমপন্থার দিকে যাওয়ার এই নতুন আন্দোলন অবশ্য তাঁর সমগ্র জীবনের বিশ্বাসের পরিপন্থী ছিল। তাঁর কর্ম জীবনে এখন একটা সঙ্কট মুহূর্তে তিনি এসে পৌঁছুলেন।

১৯০৬ খৃষ্টাব্দেই কলকাতার কংগ্রেস অধিবেশনে ব্যাপারটার নিষ্পত্তি হতে পারত। চরমপন্থীরা সভাপতির আসনের জন্য টিলকের নাম প্রস্তাব করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু অধিক বয়স্ক নেতারা তা চাননি। কেবলমাত্র একাশি বছর বয়স্ক দাদাভাইকে—সেই সুদূর ইংল্যাণ্ড থেকে এনে সেই ঝঞ্ঝা সঙ্কুল অধিবেশনে সভাপতি করে খোলাখুলিভাবে দুভাগে ভেঙ্গে যাওয়ার হাত থেকে বাঁচানো গিয়েছিল। বিপিন চন্দ্র পাল এবং টিলক এই দুজনে চরমপন্থী হিসাবে আক্রমণ পরিচালনা করেছিলেন। ঐ অধিবেশন যদিও একদিক দিয়ে সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল, কিন্তু দুদলের মধ্যে অন্তর্নিহিত প্রচণ্ড পার্থক্যও এতে ধরা পড়ে গেল। চিন্তামণি এটিকে বলেছিলেন, "সবচেয়ে গোলমাল পূর্ণ", "প্রায়বিদ্রোহী" অধিবেশন।[৮৮] ইতিমধ্যে মনস্তাত্ত্বিক পার্থক্য এমন বেড়েছে যে তা আর পূরণ করা সম্ভব ছিলনা। সভাপতির অভিভাষণে দাদাভাই প্রথম সরকারী ভাবে স্বরাজ কথাটা ব্যবহার করার ফলে লোকেদের চিত্ত স্পর্শ করেছিল এবং কিছু সময়ের জন্য চরমপন্থীদের ধার ভোঁতা করে দিয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা আর থাকেনি। দাদাভাই-এর চিন্তাধারা অনুযায়ী, যা তিনি ঐ বক্তৃতায় প্রকাশ করেছিলেন, স্বরাজের অর্থ হল ভারতবর্ষ হবে ভারতীয়দের অধীনে, স্বায়ত্ত্ব শাসন, অনেকটা উপনিবেশের ধাঁচে। কিন্তু চরমপন্থীদের বৃটিশের সঙ্গে সম্পর্কের

৮৮। ইণ্ডিয়ান পলিটিক্স সিন্স মিউটিনি।

উপর কোনো বিশ্বাস ছিলনা এবং তাঁরা তা প্রয়োজনীয়ও মনে করতেন না, তাই চরমপন্থীরা এটিকে তাঁদের নিজেদের মত ব্যাখ্যা করে শেষ পর্যন্ত এতে আস্থা হারিয়ে ফেললেন। এটা ঠিকই যে স্বরাজ কথাটা যদিও হাজার হাজার লোকের মুখে মুখে ঘুরত তবুও এর অর্থ ছিল ঝাপসা এবং অনির্দিষ্ট। একটি সংস্থা হিসাবে কংগ্রেস পূর্ণ স্বরাজ লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করে ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বরে. লাহোর অধিবেশনে।

১৯০৭ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে সুরাট কংগ্রেস অধিবেশনের এক মাস আগে বাংলাদেশের মেদিনীপুরে একটি ছোট ঘটনা ঘটেছিল। জেলার রাজনৈতিক সম্মেলন ঐ জেলার সুপরিচিত নেতা কে. বি. দত্তর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সুরেন্দ্রনাথ সেখানে নিমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। যখন সভাপতি বলতে সুরু করেছিলেন তখন তাঁকে বার বার বাধা দেওয়া হচ্ছিল এবং সভা ভেঙ্গে দেবার চেষ্টা করা হচ্ছিল। বেশ চেষ্টার ফলে সর্ববরেণ্য সুরেন্দ্রনাথ গোলমাল থামাতে এবং সভার কাজকর্ম আবার সুরু করাতে সাহায্য করেছিলেন। যারা শান্তিভঙ্গ করছিল তারা যে নৈরাজ্যবাদীদের দলের সঙ্গে বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিল সে সন্দেহ ছিল খুব জোরালো। এই ঘটনাটিতে সুরেন্দ্রনাথের কাছে সমস্ত ব্যাপার স্পষ্ট হয়ে দেখা দিল। তিনি সমস্ত ব্যাপারটিকে এভাবে সংক্ষেপে বলেছিলেন: "নিয়মতান্ত্রিক উপায় সম্পর্কে যে জনপ্রিয়তা ছিল তার ভিত্তি কেঁপে উঠেছে। হতাশায় কুঁকড়ে যাওয়া তরুণ এবং আগ্রহীরা দেশকে সেবা করার আগ্রহে অরাজকতা এবং বলপ্রয়োগের নীতি গ্রহণ করছে বড়দের কথা না শুনে।"[৮৯] যদিও সুরেন্দ্রনাথ যে কোনো রকম চরমপন্থার বিরোধী ছিলেন তবুও সুরেন্দ্রনাথ সরকারকেই এই অবস্থার জন্য হৃদয় বিদারক হতাশা সৃষ্টির এবং দমন নীতির জন্য দায়ী করলেন। চরমপন্থাকে পুষ্ট করবার মত উর্বর জমি এ সমস্তই সৃষ্টি করছে।

---

৮৯। এ নেশন ইন মেকিং।

এক মাস পরে সুরাটে আরো বড় আকারে যা ঘটেছিল তা সুবিদিত। সুরেন্দ্রনাথের পক্ষে এটাই ছিল প্রথম বড় পরাজয়। তাঁর ভাবগম্ভীর অলঙ্কারপূর্ণ বক্তৃতা যা সাধারণত কংগ্রেস মঞ্চ থেকে গম্ভীর, শান্ত ও সশ্রদ্ধ চিত্তে লোকেরা শুনত, সুরাটে তা শ্রোতারা মানলনা। অধিবেশন একটা চাপা উত্তেজনার মধ্যে সুরু হল। মিসেস বেসান্ট বলেছেন : "সমস্ত দেশটা আলোড়ন এবং উত্তেজনার মধ্যে ছিল আর জাতীয় দলটির মধ্যে দুটি দলে বামপন্থী এবং দক্ষিণপন্থীতে ভাগ হয়ে যাবার চিহ্ন বেশ স্পষ্ট দেখা দিল।" ঝড়ের সঙ্কেত দেখা দিল একটি মতামতের মাধ্যমে। মত প্রকাশ হল যে নরমপন্থীদের লোক রাসবিহারী ঘোষের পরিবর্তে লালা লাজপত রায়কে সভাপতি করা হক। লালা লাজপত রায় অবশ্যই এই সম্মান গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন। সুরেন্দ্রনাথের বক্তব্য অনুসারে জানা যায় যে সভাপতি হিসেবে টিলককে দাঁড় করানোর ব্যাপারে বেশ কিছু লোক প্রস্তুত ছিলেন।

যখন রাসবিহারী ঘোষের নাম অম্বালাল দেশাই প্রস্তাব করেছিলেন তখন সভার কাজে ব্যাঘাত ঘটানো হয়েছিল। যখন সুরেন্দ্রনাথ, "কংগ্রেসের বহুদিনকার পছন্দসই" ঐ প্রস্তাবকে সমর্থন করতে দাঁড়ালেন তখন গোলমাল করে বাধা দেওয়ার পরিমাণ এবং তীব্রতা বেড়ে উঠল। সভা স্থগিত রাখা হল। এর পরদিন সুরেন্দ্রনাথকে অসমাপ্ত বক্তৃতা শেষ করতে দেওয়া হল, কিন্তু পরে টিলকের সংশোধনী প্রস্তাব সভাপতি কর্তৃক নাকচ হলে আবার গোলযোগের সৃষ্টি হল। প্রচণ্ড গোলমাল সুরু হল। একটা জুতো সুরেন্দ্রনাথের গালে লেগে ফিরোজ শা মেহটাকে আঘাত করল, এবং দুজনকেই প্যাণ্ডেলের বাইরে নিয়ে যাওয়া হল। অনির্দিষ্ট কালের জন্য কংগ্রেস অধিবেশন স্থগিত রাখা হল। এর একটু পরেই বাংলার প্রতিনিধিরা একত্রে মিলিত হয়ে সুরেন্দ্রনাথের প্রতি আস্থা জানিয়ে একটি প্রস্তাব ভোট গ্রহণ করলেন। আর সমস্ত ভারতবর্ষের প্রতিনিধিরা তার পরদিন একটি জমায়েতে মিলিত হলেন। অনেকেই সেই জমায়েতে আসবার আবেদনে স্বাক্ষর করেছিলেন, সুরেন্দ্রনাথও তাঁদের

মধ্যে একজন ছিলেন। এই জমায়েতে ১৬০০ জন প্রতিনিধির মধ্যে গরিষ্ঠ সংখ্যক ৯০০ জন উপস্থিত ছিলেন। এই জমায়েত থেকেই কংগ্রেসের উদ্দেশ্য ঔপনিবেশিক ধারায় স্বায়ত্ব শাসন লাভ তা নির্দিষ্টভাবে বলা হয় এবং কংগ্রেসের জন্য একটা গঠনতন্ত্র তৈরি করা হয়। এইভাবে কংগ্রেস নরমপন্থী এবং চরমপন্থী এই দুই ভাগে ভাগ হয়ে যায়।

১৯০৮ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি টিলককে ছ'বছরের জন্য দ্বীপান্তরে পাঠানো হয়। বাংলাদেশে অশ্বিনী কুমার দত্ত এবং কৃষ্ণ কুমার মিত্রের মত শ্রদ্ধেয় নেতাদের ১৮১৮ সালের তিন আইনে নির্বাসিত করা হয় যদিও তাঁরা খুব হিসেব করে গঠনতান্ত্রিক উপায়ে আন্দোলন করেছেন এবং পুলিসী অত্যাচার অহিংস ভাবে বিনা বাক্য ব্যয়ে মেনে নিয়েছেন। বৈপ্লবিক কার্য-কলাপ এবং দমন পাশাশাশি চলতে লাগল—এরকম ব্যাপার এর আগে আর হয়নি। আমূল সংস্কারের পক্ষপাতী লর্ড মরলিকে মনে হয়েছিল তিনি দমন নীতি চালাবেন না, কিন্তু তাঁর হুকুম হাজার হাজার মাইল দূরের ভারতবর্ষের সরকার ঠিক মেনে নিলেন বলে মনে হলনা—এই কারণেই ভারতবর্ষের গঠনতান্ত্রিক বিবর্তনে সেক্রেটারি অব ষ্টেট-এর পদটি অসংলগ্ন এমন কি অপ্রয়োজনীয় বলে সমালোচনা করা হয়েছে। সুরেন্দ্রনাথও বলেছিলেন যে সেক্রেটারি অব ষ্টেটের ক্ষমতা ভারত সরকারের দখলে যাওয়া উচিত, অবশ্য এর যথেচ্ছ ব্যবহার যাতে না হয় সেজন্য জনপ্রিয় নিয়ন্ত্রণও থাকা উচিত।

১৯০৮ খৃষ্টাব্দে মরলি-মিন্টো প্রস্তাব হিসাবে পরিচিত গঠনতান্ত্রিক সংশোধন পরিকল্পনাগুলি ঘোষণা করা হয়। ঐ পরিকল্পনার প্রধান ব্যাপারগুলির মধ্যে একটি ছিল বড়লাটের শাসন পরিষদে একজন ভারতীয় নিয়োগ, প্রাদেশিক শাসন পরিষদে এবং লণ্ডনের ইণ্ডিয়া কাউন্সিলে একজন ভারতীয় নিয়োগ। এ ছাড়াও বে-সরকারী সভ্য কর্তৃক প্রস্তাব আনবার ক্ষমতা এবং সরকারী নীতির সমালোচনা করার ক্ষমতা দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়। মন্ত্রণা সভায় যেহেতু সরকারী সভ্যদের থাকল সংখ্যাগরিষ্ঠতা সেহেতু ভারতীয়দের পক্ষে এগুলি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব ছিলনা।

## ষোড়শ অধ্যায়

## মরলি-মিণ্টো সংস্কার সমূহ

কংগ্রেসের মাদ্রাজ অধিবেশনে (১৯০৮) সংস্কার প্রস্তাবগুলি "গভীর ও সাধারণ" সন্তোষ সহকারে গ্রহণের কথা লিপিবদ্ধ করা হয়, আইন সভাগুলি সম্প্রসারণ, শাসন পরিষদে ভারতীয় সভ্যদের নিয়োগ এবং অন্যান্য আকারে "দফায় দফায় উদার সংস্কারগুলি" সম্পর্কে সন্তোষ প্রকাশ করা হয়।

সুরেন্দ্রনাথ প্রস্তাবটি উত্থাপন করে বলেন, আইন সভাকে একটুখানি বাড়িয়ে দাও একথা বলার মত দিন আর ভারতীয়দের নেই এবং বাংলাদেশে এই ধারণাটা বেশ চালু হয়ে গেছে যে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন করে আর লাভ নেই, বঙ্গভঙ্গকে এখনো বাতিল করা হয়নি, এবং তিনি তখনো, "নিয়মতান্ত্রিক উপায়গুলি আঁকড়ে ধরে" আছেন। কারণ? কারণ তিনি বুঝতে পারছিলেন যে সংস্কারগুলির সাহায্যে কিছু একটা করা যাবে অন্তত —তা যৎসামান্যই হক না কেন। তিনি একটা উদাহরণ দিয়েছিলেন। বাংলাদেশে ন'জন শ্রদ্ধেয় নাগরিককে নিজেদের আত্ম সমর্থনের বা কৈফিয়ৎ দেবার সুযোগ না দিয়েই দ্বীপান্তরে পাঠানো হয়। এই পরিকল্পিত সংস্কারগুলির সাহায্যে অন্তত আইন সভায় সরকারের এ ধরনের কার্য-কলাপের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা সম্ভব হবে। কিন্তু তিনি সাবধান করে দেন এই বলে যে এই পরিকল্পনা অনুসারে যে নিয়ম চালু হবে সেই নিয়মগুলিই একে রক্ষা করবে, বা ধ্বংস করবে।

১৯০৯ খৃষ্টাব্দে লাহোরের কংগ্রেস অধিবেশন খুব গম্ভীর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হল এবং এই সংস্কারের পরিকল্পনা অনুসারে যে নিয়মগুলি করা

হয়েছিল সে সম্পর্কে আংশিক হতাশা প্রকাশ করা হল। সংস্কারের সুন্দর পরিকল্পনাটিকে যে নিয়মগুলি নষ্ট করছিল তারই বিরুদ্ধে এই হতাশা। কংগ্রেসকে সবচেয়ে বেশি যা হতাশ করেছিল তা হল সাম্প্রদায়িক নির্বাচন নীতি এবং প্রচণ্ড এবং খোলাখুলি ভাবে মুসলমানদের বেশি সুবিধে করে দেয় এমন নিয়ম।

কংগ্রেস এই ব্যাপারে "মহামান্য সম্রাটের মুসলমান ও অ-মুসলমান প্রজাদের মধ্যে অন্যায়, বিদ্বেষমূলক ও হীন বিভেদ সৃষ্টিকারী" নীতির কঠোর সমালোচনা করেন। এই প্রস্তাব উত্থাপন করে সুরেন্দ্রনাথ দুঃখ প্রকাশ করেন যে ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের ইণ্ডিয়া কাউন্সিলস্ অ্যাক্টের অন্তর্ভুক্ত নিয়মকানুন সংস্কার পরিকল্পনাটিকে বলতে গেলে ধ্বংস করে ফেলেছে। তিনি বলেন : "পরিকল্পনাটিকে ধ্বংস করল কে? কে এই আশাব্যঞ্জক পরীক্ষাকে নৈরাশ্যজনকভাবে বিফল করার জন্য দায়ী? এর জন্য দায়ী হল আমলাতন্ত্র। এটা হল আমরা এই সুবিধেগুলো আদায় করার জন্য যা করেছি তার জন্য আমলাতন্ত্রের এই প্রতিশোধ গ্রহণ।[৯০] তিনি অত্যন্ত তীব্রভাবে পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী সৃষ্টির বিরোধিতা করেন। ভোট দেবার নানারকম বাধা নিষেধ সমালোচনা করেন এবং বে-সরকারী লোকেরা সংখ্যায় বেশি থাকবে এটিকে একটি সূক্ষ্ম মিথ্যা বলে প্রমাণ করেন। তাঁর জীবন স্মৃতিতে তিনি এই সংস্কারগুলিকে বলেছিলেন, "সামান্য উন্নতি।" "ভারতবর্ষের কারুরই এই ভুল বিশ্বাস ছিলনা যে এর দ্বারা অনেক কিছু হবে।"

কংগ্রেস আন্দোলনের সামনের সারিতে যাঁরা ছিলেন তাঁরা সর্বদাই এক সম্প্রদায়ের সঙ্গে আর এক সম্প্রদায়ের মধ্যে ভেদাভেদ না রেখে এক যুক্ত ভারত গড়ে তুলবার চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন। তাঁরাই সেই ভিত্তি স্থাপন করে গিয়েছিলেন যা পরে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছিল। তাই,

৯০। হাউ ইণ্ডিয়া রট ফর ফ্রীডম।

তাঁরা যখন দেখলেন দেশের সদ্যোজাত সংবিধানের ভেতর দিয়ে পার্থক্য বজায় রাখার চেষ্টা হল, তখন স্বাভাবিক ভাবেই তাঁরা দারুণ হতাশ হলেন।

সুরেন্দ্রনাথ, ভারতবর্ষের সর্ব জাতের ঐক্য বিশ্বাস করতেন। তাঁর কর্ম জীবনের প্রথম থেকেই তিনি হিন্দু এবং মুসলমানের মধ্যেকার সামগ্রিক স্বার্থ সম্পর্কে জোর দিয়ে আসছিলেন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেসের জন্মের কয়েক মাস আগে বেঙ্গলীর একটি সম্পাদকীয়তে এরকম লেখা হয়েছিল: "অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে আমরা লক্ষ্য করছি যে ভারত সরকার আমাদের একই দেশের অধিবাসী মুসলমানদের উন্নতির দিকে দৃষ্টি দিয়েছেন। আমরা সব সময়েই বলেছি—এবং এখনও সে মত পরিবর্তন করবার কোনো কারণ ঘটেনি—তা হল, ভারতবর্ষের উন্নতি বলতে কেবলমাত্র হিন্দুর উন্নতি নয়, বা মুসলমানের উন্নতি নয়—এর অর্থ হল দুই সম্প্রদায়েরই উন্নতি, জ্ঞানে, সংস্কৃতিতে এবং আরো উচ্চগুণে যার ফলে দেশ মহান হয়।"[৯১] সামগ্রিকভাবে দেখতে গেলে, তিনি বলেন, মোগল শাসন ন্যায়পরায়ণ এবং উপকারী ছিল। তিনি ঐ নিবন্ধে অতীতের সমস্ত রকম তিক্ততার যা অবশিষ্ট আছে তা ভুলে যাওয়ার জন্য আবেদন করেছিলেন। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে তিনি বেঙ্গলীর পাতায় ন্যাশনাল মহামেডান অ্যাসোসিয়েশন-এর জাতীয় কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত মেনে না চলা স্থির করাতে ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

তাঁর সমগ্র আত্মজীবনীতে হিন্দু মুসলমান অনৈক্য সম্পর্কে এবং ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের সাম্প্রদায়িক নির্বাচন প্রবর্তনের কথা লেখা হয়েছে ক্ষোভের সঙ্গে। এটা সুবিদিত যে মুসলমান সাম্প্রদায়িকতা বৃটিশ শাসকদের প্ররোচনায় এই শতাব্দীর প্রথমভাগে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। সার সইয়দ আহমেদএর নেতৃত্বে মুসলমানদের প্যাট্রিয়টিক অ্যাসোসিয়েশন কংগ্রেসকে হিন্দু কংগ্রেস মনে করে এর কাছেও ঘেঁষতেন না। সুরেন্দ্রনাথের

৯১। 'দি মহামেডান অ্যাডভান্সমেন্ট', দি বেঙ্গলী, জুলাই ২৫, ১৮৮৫ দ্রষ্টব্য।

মতানুসারে বঙ্গভঙ্গের ফলে সাম্প্রদায়িকতার অশান্তি আরো ধারালো হয়ে ওঠে।

১৯১০ খৃষ্টাব্দে নতুন কাউন্সিলগুলি সৃষ্টি হয়। প্রথম সভাতেই বড়লাট ঘোষণা করেন যে, যে সমস্ত ব্যক্তি তিন আইনের আওতায় বন্দী হয়েছেন এবং যাঁরা কোনো বৈপ্লবিক কাজকর্মে লিপ্ত ছিলেন না তাঁদের মুক্তি দেওয়া হবে।

নতুন আইন অনুসারে কোনো বরখাস্ত সরকারী কর্মচারীর পক্ষে লেজিস্লেটিভ কাউন্সিলে নির্বাচন প্রার্থী হওয়া নিষিদ্ধ করা হল। বাংলার লেফটেন্যাণ্ট গভর্নর এবং সুরেন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত বন্ধু, সার এডোয়ার্ড বেকার কাউন্সিলে সুরেন্দ্রনাথের প্রবেশ সম্পর্কে যে বাধা ছিল তা দূর করলেন সরকারের প্রধানতম ব্যক্তি হিসেবে ক্ষমতা তাঁর যে ছিল তার সাহায্যে। এ ছিল বাস্তবিক সুরেন্দ্রনাথকে বন্ধু হিসাবে পরোক্ষভাবে নিমন্ত্রণ করা—যাতে তিনি কাউন্সিলে ঢুকে তাকে সাফল্যমণ্ডিত করতে পারেন। ব্যক্তিগতভাবে সুরেন্দ্রনাথের পক্ষে এই আমন্ত্রণ রক্ষা না করা কঠিন ছিল, কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সেটা ছিল তাঁর নীতিগত কর্তব্য। তিনি বলতেন, "যতক্ষণ না প্রদেশ বিভাগকে পরিবর্তিত করা হচ্ছে ততক্ষণ আমাদের ব্যাপারে থেকোনা।" সে অবস্থায় তিনি কেমন করে, যখন বাংলাদেশের ঘা তখনো শুকোয়নি, কাউন্সিলে ঢুকবেন? পূর্ব বাংলার জনসাধারণ, যাঁরা ঐ নতুন প্রদেশের কাউন্সিল বর্জন করেছেন, তাঁরা কি ঐ ব্যাপারে চরম হতাশ হবেনা? এ ছাড়াও সুরেন্দ্রনাথের অনেক নরমপন্থী সহকর্মী ঐ একই রকম অযোগ্য হয়ে পড়েছেন সংশোধনের নিয়ম অনুসারে। তিনি কেমন করে তাঁদের ফেলে রেখে একা চলবেন কাউন্সিল সীটের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে? তিনি অত্যন্ত ভদ্রভাবে সার এডওয়ার্ড-এর আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে দেশের প্রথম কাউন্সিল বর্জনকারাদের মধ্যে অন্যতম হলেন। পরে কংগ্রেসের নতুন নেতৃত্বে এই নীতি অতি উৎসাহের সঙ্গে গৃহীত হয়।

## সপ্তদশ অধ্যায়

### অনড় ঘটনা নড়লো

ইতিমধ্যে সুরেন্দ্রনাথের অদ্ভুত এক অভিজ্ঞতা হল। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে লণ্ডনের ইম্পিরিয়াল প্রেস কনফারেন্সে সুরেন্দ্রনাথ আমন্ত্রিত হন। ঐ অধিবেশনের উদ্দেশ্য ছিল সাম্রাজ্যের মধ্যেকার সাংবাদিকদের সাম্রাজ্য এবং সাধারণ বিষয়ে কিছু বলবার সুযোগ করে দেওয়া। সুরেন্দ্রনাথকে ভারতীয় খবরের কাগজের একমাত্র প্রতিনিধি মনোনীত করা হয়, ইঙ্গভারতীয় কাগজগুলির সঙ্গে পার্থক্য করা হয়, বলা হয়, ঐ সময়কার রাজনৈতিক আবহাওয়া স্মরণ রেখে সুরেন্দ্রনাথের উচিত ছিল ঐ আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করা, কেননা এতে উল্টো বুঝবার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ ভেবেছিলেন ঐ নিমন্ত্রণ ভারতীয় সংবাদপত্রের প্রতিষ্ঠা এবং গুরুত্বকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্যই। দ্বিতীয়ত এতে তাঁর পক্ষে সাম্রাজ্যের সাংবাদিকদের কাছে ভারতবর্ষের তরফের বক্তব্য, বিশেষ করে প্রদেশ বিভাগ সম্পর্কিত বিষয়টি বুঝিয়ে বলার সুযোগ বলে মনে হয়েছিল। তিনি বঙ্গভঙ্গ রোধ করবার ব্যাপারে যুদ্ধ বিরতিতে মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না, যদিও সরকার থেকে দাবি করা হচ্ছিল এ ঘটনা অনড়।

প্রথম দিনের অধিবেশনে সংবাদ টেলিগ্রাফে পাঠানোর মূল্য কমানো নিয়ে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। সুরেন্দ্রনাথ এটিকে সমর্থন করেন এজন্য যে এরফলে বৃটিশ খবরের কাগজে ভারতীয় সংবাদ আরো বেশি স্থানপতে পারবে। অধিবেশনের দ্বিতীয় দিনের আলোচ্য বিষয় বস্তু ছিল, "খবরের কাগজ এবং সাম্রাজ্য", আর এটি বিতর্কলক মূহয়ে পড়েছিল। ইজিপ্টের ভূতপূর্ব প্রো-কন্সাল, লর্ড ক্রোমার ভারতবর্ষের খবরের কাগজ সম্পর্কে

একটা বেফাঁস উক্তি করে ফেলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন ভারতীয় খবরের কাগজের অসংযত বক্তব্যের সঙ্গে ভারতবর্ষের হিংসামূলক কাজ কর্মের সম্পর্ক খুঁজে বার করা যায়। তিনি ভারতীয় প্রতিনিধিকে জিজ্ঞেস করেন, "কোনো কোনো দেশীয় সংবাদপত্রে সন্দেহাতীত ভাবে যেসব অসংযত রচনা প্রকাশিত হচ্ছে তার সঙ্গে জঘন্য ধরনের যেসব অত্যাচার সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হচ্ছে সেগুলোর সত্যিকারের কোনো সম্পর্ক আছে কিনা ......"। আরো বলা হয় যে, "এরকম সম্পর্ক প্রমাণ করা যায়।"[৯২] সুরেন্দ্রনাথ এই আহ্বানের জবাব দিতে ওঠেন। লর্ড ক্রোমারের প্রশ্নের উত্তরে তিনি জোরের সঙ্গে বলেন, "না", এবং আরো বলেন যে তিনি অপ্রয়োজনীয় তর্ক বিতর্কের মধ্যে যাবেন না, তিনি "প্রতীচ্যের আত্মসংযম পালন"[৯৩] করবেন। এই উত্তরে বেশ জোরের সঙ্গে তাঁকে প্রশংসা করা হয়। অত্যন্ত শান্ত, মর্যাদাপূর্ণ কিন্তু জোরালো গলায় তিনি বলেন যে খবরের কাগজের মত আশীর্বাদকে ভারতীয়রা অপব্যবহার করেনি। অরাজকতামূলক কাজকর্ম সম্পর্কে তিনি বললেন: "আমরা সকলেই ঐ সব অরাজকতার নিন্দা করি। আমার ভারতীয় সহকর্মীরা এবং আমি আমাদের কাগজে যতখানি জোরের সঙ্গে সম্ভব এ বিষয়ে বিরোধিতা করেছি......আর কাউকে আঘাত দিতে চাইনা একথা বলে, কিন্তু অরাজকতা এসেছে পশ্চিম থেকে, পূব থেকে নয়।"[৯৪] এটি লর্ড ক্রোমারের কথার উপযুক্ত জবাব হয়েছিল। এই বক্তৃতা খুব প্রশংসিত হয়।

অধিবেশনের চতুর্থ দিনে সুরেন্দ্রনাথ সাংবাদিকতা ও সাহিত্য নিয়ে বক্তৃতা দিলেন। লর্ড মরলি সভাপতি হিসেবে সাহিত্যের সঙ্গে সাংবাদিকতর তুলনা করে তাঁর বিখ্যাত বক্তৃতাটি দেন।

প্রতিনিধিদের প্রাদেশিক ভ্রমণে সুরেন্দ্রনাথ স্ট্যাটফোর্ড অন এভন, অক্সফোর্ড ও ম্যাঞ্চেস্টার সমেত অনেকগুলি জায়গা ভ্রমণ করেন। শেষোক্ত

৯২। বার, প্ল্যাটফরম্ অ্যাণ্ড পালপিট, আগষ্ট ১৯১৮ দ্রষ্টব্য
৯৩। ঐ
৯৪। ঐ

জায়গায় সুরেন্দ্রনাথ একটি মধ্যাহ্নভোজে ভারতীয়দের আশা আকাঙ্খা, সাম্রাজ্যের মধ্যে থেকে স্বায়ত্ত শাসন লাভ সম্পর্কে খুব জোরালো ভাষায় বক্তৃতা করেন। বক্তৃতাটি লোকেদের খুব ভাল লেগেছিল। একজন সংবাদপত্র প্রতিনিধি যিনি সুরেন্দ্রনাথের পাশে বসেছিলেন, বলেন, "মিস্টার ব্যানার্জি, ভারতবর্ষে যদি আপনার মত ২০০ জন লোক থাকে তাহলে কালই আপনাদের হাতে স্বায়ত্ত শাসনভার দিয়ে দেওয়া উচিত।" সুরেন্দ্রনাথ উত্তর দিলেন: "ভারতবর্ষে আমার মতো লোক ২০০ জনের দ্বিগুণ আছেন।"[৯৫] ভারতবর্ষের ব্যাপারে সর্বদা বন্ধুত্বভাবাপন্ন নয়, এমন কাগজ, 'ম্যাঞ্চেস্টার কুরিয়ার' তাঁর বক্তৃতা সম্পর্কে মন্তব্য করলেন যে, তা যেন বিদ্যুতের চমকের মত ঝলসে উঠল।

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন সুরেন্দ্রনাথকে তার অনারারি সেক্রেটারি হিসেবে ভার দিয়েছিল, ইংল্যাণ্ডে বঙ্গভঙ্গকে পরিবর্তন করবার সপক্ষে জনমত গড়ে তুলতে। ঐ ভ্রমণের সময় তাঁর এই ধারণা জন্মেছিল যে, প্রভাবশালী এবং সুবিবেচক লোকদের মধ্যে সকলেই বঙ্গভঙ্গকে সমর্থন করেন না। লর্ড মরলির একজন বড় বন্ধু লর্ড কোর্টনি এবং ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়েন এর সম্পাদক সি. পি. স্কট প্রমুখ ব্যক্তিগণ ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। প্রেস কনফারেন্স এর কাজ শেষ হয়ে গেলে সুরেন্দ্রনাথ সর্বান্তঃকরণে বৃটিশ জনগণের কাছে বঙ্গভঙ্গজনিত অন্যায় সম্পর্কে অবহিত করবার কাজে নিজেকে নিয়োজিত করলেন। তিনি বেশ কয়েকটি সভায়, যে সমস্ত সভায় বৃটেনের প্রতিনিধি স্থানীয় লোকেরা উপস্থিত ছিলেন, বক্তৃতা করেন। সে বক্তৃতাগুলির শক্তি এবং জোরালোভাবে বুঝিয়ে বলার ক্ষমতা বিশেষভাবে প্রশংসা অর্জন করে। ভারতীয় অধিবাসী কর্তৃক প্রদত্ত একটি নৈশ ভোজ সভায় তিনি র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ড, সার হেনরি কটন এবং ম্যাকারনেস্ এর সামনে বক্তৃতা দেন এবং এতে তাঁরা গভীর ভাবে প্রভাবিত হন। পরে তিনি সার উইলিয়াম ওয়েড্ডারবার্নএর

৯৫। এ নেশন ইন মেকিং

প্রাতঃকালীন আহার সভায় বঙ্গভঙ্গ এবং দ্বীপান্তর সম্পর্কে বলেন। ওয়েডডারবার্ন ছিলেন ভারতের একজন বড় বন্ধু। ঐ সভায় নিমন্ত্রিত সার চার্লস ডিল্‌কে, ম্যাকডোনাল্ড এবং সার হেনরি কটনও দ্বীপান্তরের খুব জোর নিন্দা করেন। হিউম এরপর তাঁর স্মৃতি থেকে বলেন।

এই সময় দারুণ একটি শোকাবহ ঘটনা ঘটে, সুরেন্দ্রনাথ যে জন্য কাজ করছিলেন তারপক্ষেও ঘটনাটি শোকাবহ হয়ে ওঠে। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের ১লা জুলাই ন্যাশানাল ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের একটি সভায়, সেক্রেটারি অব স্টেট ফর ইণ্ডিয়ার রাজনৈতিক পরামর্শদাতা সার উইলিয়াম কারজন-ওয়াইলি এবং ডক্টর লালকাকাকে ধিংরা নামে একজন ভারতীয় ছাত্র গুলি করে হত্যা করে। এই ঘটনায় বৃটিশ জনসাধারণ খুব আঘাত পায় এবং প্রচণ্ড বিরূপতার সৃষ্টি হয়। এই ঘটনার ফলে যে খারাপ আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়েছিল। তা দূর করতে সুরেন্দ্রনাথ ভারতীয় ছাত্র সমাজের সঙ্গে পরামর্শ করে তৎক্ষণাৎ একটা চিঠি বৃটেনের সমস্ত খবরের কাগজে প্রকাশ করবার জন্য পাঠিয়ে দেন, সেই চিঠিতে ঐ অপরাধের ব্যাপারে তাঁর অসমর্থন এবং অপরাধটি অসঙ্গত বলে মত প্রকাশ করেন। এর পরই সুরেন্দ্রনাথ একটি সভায়, প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য যে, ধিংরা ছিল ভারতবর্ষের বিরাট ষড়যন্ত্র জালের মধ্যেকার একজন, তার প্রতিবাদ করেন। বিচারে এর পর স্পষ্ট হয় যে ধিংরা নিজের থেকেই ঐ কাজ করে।

সর্বদাই সুরেন্দ্রনাথ বিনা বিচারে দ্বীপান্তরিত বন্দী নেতাদের মুক্তির জন্য আবার ভেবে দেখার কথা বলেছেন। তিনি এই ব্যাপারে লর্ড মরলির সঙ্গে দেখা করেন কিন্তু সফল হন না। সার উইলিয়ামকে হত্যা করার ফলে বৃটিশ সন্দেহ গভীর হয়েছিল বলে মনে হয়।

একজন বিখ্যাত রাজনীতিজ্ঞ, পার্লামেণ্টের সভ্য সার চার্লস ডিল্‌কের সভাপতিত্বে ক্যাক্সটন হলে সুরেন্দ্রনাথ বৃটিশদের ভুল বোঝাবুঝি যাতে না হয় সেজন্য সার উইলিয়াম এবং ডক্টর লালকাকার হত্যার নিন্দা করেন,

তারপর তিনি দুটি সমস্যা, স্বায়ত্ত শাসন এবং প্রদেশ বিভাগ নিয়ে বিশেষ করে বললেন। এই বক্তৃতাটি জোরালো, সংযত এবং গম্ভীরতায় হয়েছিল অসাধারণ। তিনি বললেন যে মরলি-মিণ্টো সংস্কারগুলি একেবারেই অপ্রতুল। তিনি বললেন, "পরিকল্পনাটিতে বেশি কিছু থাকা তো দূরের কথা, আমি বলব যেখানে অর্থশক্তির ব্যাপার সেরকম অনেক ক্ষেত্রে আমাদের আশা পর্যন্ত পূরণ করতে সমর্থ হয়নি।"[৯৬] তিনি, সরকারী বক্তব্য যে, বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে ভাটা পড়ে গেছে, তার দৃঢ় প্রতিবাদ করে বলেন : "লর্ড মরলি বলেন বঙ্গভঙ্গ ব্যাপারটা পাকাপাকি হয়ে গেছে। তাহলে আমি আমার দেশবাসীর হয়ে বলব যে আমরা এটিকে পাকাপাকি হয়ে গেছে বলে একেবারেই মানিনা। আমরা একটি সুনিশ্চিত ভুলকে মেনে নিতে পারিনা......মেনে নিতে পারিনা জনসাধারণের অনুভূতির উপর অন্যায়।"[৯৭] তিনি পুলিস রাজের সাংঘাতিক সমালোচনা করেন, সমালোচনা করেন দমনের, স্বেচ্ছাচারমূলক দ্বীপান্তরের, এবং তিনি একথা বলতে ভুলে যাননি এগুলি সমস্তই লর্ড মরলির মত উদারনৈতিক লোকের সভাপতিত্বে যে শাসন চলছে সেই শাসনেই হচ্ছে।

ভারতের একজন বন্ধু, লর্ড স্টীডের বাড়িতে বহু জাতের লোক সমাবেশে সুরেন্দ্রনাথের এক সাক্ষাৎকার হয়। তাঁকে নাটকীয়ভাবে জিজ্ঞাসা করা হয় যে যদি তাঁকে মৃত্যু দণ্ডে দণ্ডিত হতে হয় এবং ঘাতকের কুঠার যদি আর মাত্র দু মিনিটের মধ্যে তাঁর ঘাড়ে পড়তে উদ্যত হয় তাহলে তাঁর মৃত্যুকালীন বাণী কি হবে? সুরেন্দ্রনাথ এই দাবিগুলি করেন : (১) বঙ্গভঙ্গ কে বদলানো ; (২) দ্বীপান্তরিত দেশপ্রেমিকদের মুক্তি দেওয়া এবং যে আইন বাংলাদেশে হেবিয়াস্ করপাস্‌কে বাতিল করেছে সেই আইনকে তুলে দেওয়া ; (৩) সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তি : (৪) ভারতীয়দের করের উপর তাদের নিয়ন্ত্রণ ; (৫) কানাডার কায়দায় ভারতবর্ষের একটা সংবিধান।

---

৯৬। বার, প্ল্যাটফরম্ অ্যাণ্ড পালপিট দ্রষ্টব্য

৯৭। ঐ

তাঁকে যখন জিজ্ঞেস করা হয় তিনি কেন বঙ্গভঙ্গকে একেবারে বাতিল করতে না চেয়ে বদলাতে চান, সুরেন্দ্রনাথ তখন বলেন : "আমার তো ইচ্ছে বাতিল করা, কিন্তু আমি এটা বুঝতে পারি যে লর্ড মরলির কাছে সময় হবার আগেই তাঁর মতামত জোর করে চেয়ে ফেলায় তিনি এমন একটি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যা থেকে তাঁকে এখন আর পিছিয়ে যেতে বলা সম্ভব নয়। আমি বাস্তববাদী মানুষ, আমি বাতিল করতে চাইনা, বদলাতে চাই।" তিনি এটা স্বীকার করেন যে এই প্রস্তাবিত বদলে বিহার একটি স্বতন্ত্র প্রদেশ হক, কিন্তু বাংলাভাষাভাষী দুটি অংশ "লর্ড কার্জন এর তরবারিতে অস্বাভাবিকভাবে যাদের বিছিন্ন করা হয়েছে" তাদের যুক্ত করতেই হবে। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে সুরেন্দ্রনাথের ইংল্যাণ্ড সফর চমৎকার সাফল্য অর্জন করেছিল। তিনি বৃটিশ জনসাধারণের উপর বেশ প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। মিঃ স্টেড এর কথায়, "সাম্রাজ্যের আর কোনো সংবাদপত্রের সম্পাদক তাঁর চাইতে স্পষ্টতায়, শক্তিতে, ভদ্রতায় এবং ব্যক্তি মাধুর্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন না।"[৯৮]

তাঁর বক্তৃতার এবং সাক্ষাৎকারের অনেকখানি জুড়ে থাকত প্রদেশ বিভাগের পরিবর্তন এবং স্বায়ত্ত শাসন। তিনি এই দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে ভারতবর্ষে ফিরে আসেন যে বঙ্গভঙ্গ বেশি দিন পাকাপাকি থাকবে না, যদিও লর্ড মরলি উল্টো কথা বলছেন। তিনি এও দেখে এসেছেন যে ইংল্যাণ্ডে খুব জোর এবং ক্রমবর্ধমান এই ভাব জন্মাচ্ছে যে ভারতবর্ষ কিছু পরিমাণ স্বায়ত্ত শাসন করবার উপযুক্ত হয়েছে। সুরেন্দ্রনাথ আশা ছাড়বেন না, কেননা, তিনি হলেন "সারেণ্ডার নট", কখনো নতি স্বীকার করেন না। তিনি বলেন, "জনসাধারণকে নিয়ে যাঁর কারবার তাঁকে ধৈর্যশীল এবং আশাবাদী হতেই হবে। আমার তাই অভিজ্ঞতা, আর আমি সেই অভিজ্ঞতা আমার দেশবাসীকে দান করছি।"[৯৯]

---

৯৮। এ নেশন ইন মেকিং
৯৯। ঐ

১৯১০ খৃষ্টাব্দে লর্ড মিন্টো যাবার পর বড়লাট হয়ে আসেন লর্ড হার্ডিঞ্জ। ফরেন অফিসের পদ থেকে তিনি এলেন খোলা মন নিয়ে যা ছিল ভারতবর্ষের আমলাতন্ত্রের বদ্ধ মনের ঠিক বিপরীত। সুরেন্দ্রনাথ এবং তাঁর সহকর্মীরা ভাবলেন যে নতুন বড়লাটকে প্রদেশ বিভাগ সম্পর্কে জনসাধারণের চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন, এই কারণে কলকাতার টাউন হলে একটি সভা ডাকলেন। এরমধ্যে নতুন বড়লাটের সঙ্গে দেখা করবার জন্য সুরেন্দ্রনাথ একটা জরুরী নিমন্ত্রণ পেলেন। লর্ড হার্ডিঞ্জ বললেন যে জনসভা করার প্রয়োজন নেই, তিনি বাংলাদেশের নেতাদের মতামত একটি স্মারক লিপির মাধ্যমে পেলে তা থেকেই বিবেচনা করবেন। সুরেন্দ্রনাথ তাতে রাজি হলেন এবং প্রস্তাবিত টাউন হল সভা হলনা। সুরেন্দ্রনাথ অম্বিকাচরণ মজুমদারের সাহায্যে একটি স্মারকলিপির খসড়া তৈরি করলেন, সেটিকে গোপনে প্রচার করলেন এবং বাংলাদেশের ২৫টি জেলার মধ্যে ১৮টি জেলার প্রতিনিধিগণ তাতে স্বাক্ষর দিলেন। এটি বড়লাটের কাছে ১৯১১ খৃষ্টাব্দের জুন মাসের শেষাশেষি নাগাদ পেশ করা হল। বঙ্গভঙ্গের পরিবর্তন পঞ্চম জর্জ কর্তৃক ১৯১১ খৃষ্টাব্দের ১২ই ডিসেম্বর দিল্লীর দরবারে ঘোষণা করা হল। বেশ বোঝা যায় যে ঐ স্মারকলিপিটি লর্ড হার্ডিঞ্জকে গভীরভাবে প্রভাবান্বিত করেছিল, তিনি বিশ্বাস করলেন যে যদি দুটি খণ্ড বাংলায় শান্তি আনতে হয় তাহলে বঙ্গভঙ্গ, যাকে বাঙ্গালীরা অন্যায্য এবং গভীর অন্যায় বলে মনে করে, তাকে বদলানো প্রয়োজন। সেই একই সময়ে ঘোষণা করা হল যে রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লী নিয়ে যাওয়া হবে।

সেদিন বেঙ্গলী অফিসের সামনে প্রচুর লোক ভীড় করে রইলেন দিল্লী থেকে ভাল সংবাদ কিছু পাবার আশায়। কিন্তু সন্ধ্যা পর্যন্ত কোনো সংবাদ এল না। আশা এবং উদ্বেগের বদলে সৃষ্টি হল প্রচণ্ড হতাশা। সুরেন্দ্রনাথ একটি সম্পাদকীয় বলে গেলেন, কেউ লিখে নিল, তাতে বঙ্গভঙ্গকে না বদলানোর জন্য গভীর অসন্তোষ প্রকাশ করলেন, আর সেই

সঙ্গে জনগণকে বললেন আন্দোলন চালিয়ে যেতে। প্রবন্ধ লিখবার পরই তিনি টেলিফোনে সংবাদ পেলেন যে বঙ্গভঙ্গকে বদলানো হয়েছে।

তৎক্ষণাৎ সংবাদটি ছড়িয়ে পড়ল। সুরেন্দ্রনাথকে তো সমস্ত লোক একেবারে ঘিরে ফেলল, জোর করে তাঁকে একটা গাড়িতে চড়িয়ে গোল দীঘিতে নিয়ে এল, সেখানে এসে তিনি দেখলেন সেই রাত্রের অন্ধকারে আনন্দে লোকেরা খুব হৈ-হল্লা করছে। তাঁর নেতৃত্বে যে আন্দোলন ছ বছর ধরে না থেমে, না দাঁড়িয়ে দমন নীতিকে অগ্রাহ্য করেও চলেছিল, তার ফল এতদিনে পাওয়া গেল। সুরেন্দ্রনাথের পক্ষে এটা ছিল একটা ব্যক্তিগত বিজয়, আর শান্তিপূর্ণ প্রতিরোধেরও বিজয়, যা তাঁরই নেতৃত্বে সুপরিচালিত হয়েছিল। সুরেন্দ্রনাথ দুঃখ করলেন যে বঙ্গভঙ্গকে অনেক আগেই বদলানো যেত। তাহলে বাংলাদেশে বৈপ্লবিক পরিস্থিতি যেরকম হয়ে উঠেছিল ততখানি হতনা। তাঁর মতে আন্দোলনের গোড়ায় ছিল বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাব। তিনি বললেন, বঙ্গভঙ্গ আইন বদলানো হয়েছিল অত্যন্ত দেরিতে, আর বৃটিশ নীতি সর্বত্রই এই বিলম্ব দোষে দুষ্ট।

তাঁর এই বিশাল জয়ের মুহূর্তে সুরেন্দ্রনাথ তাঁর প্রিয়তমা স্ত্রীকে হারালেন। তাঁর স্ত্রী ১৯১১ খৃষ্টাব্দের ২৩শে ডিসেম্বর মারা গেলেন।

বঙ্গভঙ্গকে বদলানো হলে কাউন্সিল প্রবেশ সম্পর্কে সুরেন্দ্রনাথ যে নিষেধাজ্ঞা নিজের উপর আরোপ করেছিলেন তার শেষ হল। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে তিনি বাংলার লেজিস্‌লেটিভ অ্যাসেম্ব্লি এবং ইম্পিরিয়াল লেজিস্‌লেটিভ অ্যাসেম্ব্লি এই দুটিরই সভ্য মনোনীত হলেন। বেঙ্গল কাউন্সিলে প্রবেশ করবার যে বাধা ছিল তা সার এডওয়ার্ড বেকার কর্তৃক ইতিমধ্যেই অপসারিত হয়েছিল, কিন্তু ইম্পিরিয়াল কাউন্সিলে সেই সিভিল সার্ভিস থেকে বরখাস্ত হওয়ার ব্যাপারে যে বাধা ছিল যদিও তা তখন প্রাচীন ইতিহাস তবু তা থেকেই গিয়েছিল। এর উপরে ছিল বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়কার তাঁর কার্যকলাপ যার ফলে সরকারী মনোভাব তাঁর উপর বিরূপ ছিল। তাঁর সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়া সুরু হল, এবং

ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি থেকে বেঙ্গলীর পুরনো খণ্ডগুলি খুব মনোযোগের সঙ্গে পড়ে দেখা হতে লাগল তারমধ্যে রাজদ্রোহিতা আছে কিনা।

যদি বেঙ্গল কাউন্সিলে ঢুকতে তাঁর বাধা না হয় তাহলে ইম্পিরিয়াল কাউন্সিলে ঢুকতে তাঁর বাধা কোথায়? কিন্তু রাজনৈতিক প্রতিকূল ধারণা নানা আঁকাবাঁকা পথ ধরে চলে। কোন কোন সরকারী মহল এটা ভেবে উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন যে এরফলে আবার নতুন করে আন্দোলন সুরু হয়ে যাবে। যাই হক, শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটার সুরাহা হয়েছিল আর সুরেন্দ্রনাথ ১৯১৩ সালের ফেব্রুয়ারীতে ইম্পিরিয়াল লেজিস্‌লেটিভ কাউন্সিলের সভ্য হলেন। সম্ভবত লর্ড হার্ডিঞ্জের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার ফলে সুরেন্দ্রনাথের পথের বাধা দূর হয়।

আইন সভাতে সুরেন্দ্রনাথ জনসাধারণের উপকারের জন্য বহুরকম আবেদন করেছেন, তিনি নির্ভীক অথচ নিরপেক্ষভাবে সরকারের প্রতিক্রিয়াশীল নীতির সমালোচনা করে গঠনমূলক পরামর্শ দিতেন। তিনি আইন সভায় প্রথমেই একটা প্রস্তাব উত্থাপন করে বলেন যে, অপরাধের ব্যাপারে, বিচার এবং শাসন বিভাগ পৃথক করা হক। এটা কোনো নতুন দাবী নয়। জনসাধারণের কাছে এ প্রশ্নটি এর আগেই উত্থাপিত হয়েছিল এবং কংগ্রেস এই ব্যাপারে খুবই করেছিল। যদিও এই প্রস্তাবটি সরকারী গরিষ্ঠ ভোটে অগ্রাহ্য হয়, তবুও এরফলে শাসকদের উপর গভীর ছাপ রাখে এবং পরে ভারত সরকার সেক্রেটারি অব স্টেটের কাছে এই বিষয়ে একটা বিবরণী পেশ করেন।

অন্যান্য যেসব ব্যাপারে তিনি প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন সেগুলো হল: খবরের কাগজ সংক্রান্ত আইন, শিক্ষা, স্থানীয় স্বায়ত্ত্ব শাসনের সম্প্রসারণ, অন্তরীণদের ব্যাপার নিয়ে একটা উপদেষ্টা কমিটী তৈরী এবং মণ্টেগু চেম্‌স্‌ফোর্ড সংস্কার প্রস্তাবাবলী। এটা স্মরণ রাখতে হবে যে মরলি মিণ্টো মন্ত্রণাগুলির চরিত্র ছিল উপদেশমুলক। সরকার খুসিমত সেই বে-সরকারী মতামতকে অগ্রাহ্য করতে পারতেন, তা সে মত যতই না কেন

সর্বসম্মত ভাবে প্রকাশ হক বা জনমতের যত সমর্থনই সেই মতের পেছনে থাকুক। সরকার কখনোসখনো দু একটা সামান্য ব্যাপারে বে-সরকারী মতের সমর্থনে কাজ করতে সম্মতি দিতে বাধ্য হয়েছেন।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে সুরেন্দ্রনাথ একটি প্রস্তাবে বলেন যে প্রতিটি প্রদেশে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড এবং স্থানীয় বোর্ডের সভাপতি যাঁরা হবেন তাঁদের মনোনীত হতে হবে। এ ব্যাপারে লর্ড রিপনের স্মরণীয় প্রস্তাব সত্ত্বেও, স্থানীয় শাসনের উন্নয়ন অবহেলা এবং অনাদরে খুব ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। এই সমস্ত স্বায়ত্ত্ব শাসনের ব্যাপারে জনগণকে খুব কমই সত্যিকারের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। সুরেন্দ্রনাথের প্রস্তাব পরাজিত হয় কিন্তু পরে সরকার তাঁর মত মেনে নেন এবং তার একটা বিবরণী সেক্রেটারি অব স্টেটকে পাঠানো হয়।

১৯১৬-১৭ খৃষ্টাব্দের বাজেট আলোচনা কালে সুরেন্দ্রনাথ তাঁর বক্তৃতায় দেখিয়ে দেন যে আবগারী শুল্ক বেড়ে চলার সঙ্গে সঙ্গে মদ্যপান এবং অন্যান্য নেশার পরিমাণও সাংঘাতিক ভাবে বেড়ে চলেছে। অস্ত্র আইন সম্পর্কে তিনি বলেন ভারতীয় এবং ইউরোপীয়দের বন্দুকের লাইসেন্স দেবার ব্যাপারে একই রকম নীতি থাকা উচিত। তিনি অবদমিত শ্রেণীর অবস্থার উন্নতির জন্য কাজকর্মকে সমর্থন করেন। জাপান কিরকম যন্ত্রশিল্পে বিরাট উন্নতি করেছে তা তিনি বিশেষ করে উল্লেখ করে বলেন যে এই দেশেও যন্ত্র শিল্পায়ন করা উচিত।

১৯১৬ খৃষ্টাব্দে সুরেন্দ্রনাথ ইম্পিরিয়াল লেজিস্‌লেটিভ কাউন্সিলের সীটটি হারান, কিন্তু ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে আবার তার সভ্য হন। উক্ত কাউন্সিলে সুরেন্দ্রনাথ একটা বিরাট কাজ করেছিলেন, আর তা হল তিনি একটি উপদেষ্টা কমিটী নিয়োগ করতে চেয়ে একটি প্রস্তাব করেছিলেন, সেই কমিটীতে উপযুক্ত সংখ্যক ভারতীয় থাকবেন, যাতে তাঁরা ভারতরক্ষা আইনে এবং ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের তিন আইনে যে সমস্ত ব্যক্তিকে দ্বীপান্তরে পাঠানো হয়েছে তাঁদের ব্যাপার নিয়ে পরামর্শ দিতে পারেন।

একটি বিতর্কের পর ঐ প্রস্তাব সরকার কর্তৃক মূলত গৃহীত হয় এবং একটি কমিটী গঠিত হয়। সভ্যদের মধ্যে ছিলেন মিঃ জাস্টিস বাঁচক্রফট এবং সার নারায়ণ চন্দ্রভারকর। এই সুবিধেটি দেওয়া হয়েছিল সম্ভবত ক্রমবৃদ্ধিমান চরমপন্থীদের ঠেকানোর জন্য, এটি জনমতকে শান্ত করেছিল।

ইম্পিরিয়াল লেজিস্‌লেটিভ কাউন্সিলে বাজেট আলোচনা কালে সুরেন্দ্রনাথ একবার ১৯১১ খৃষ্টাব্দের ২৫শে আগষ্টের সরকারী বিবরণীর উল্লেখ করেছিলেন—এই বিবরণীতে কেবল যে বঙ্গভঙ্গকে বদলানোর কথা ছিল তা নয়, আশীর্বাদ স্বরূপ প্রাদেশিক স্বায়ত্ব শাসন দেওয়ার কথাও ছিল, আর ছিল প্রাদেশিক স্বায়ত্ব শাসনের অংশ স্বরূপ প্রদেশগুলির অর্থনৈতিক স্বাধীনতা। তৎকালীন অর্থমন্ত্রী, সার উইলিয়াম মায়ার তাঁকে একজন "ধৈর্যহীন আদর্শবাদী" বলে উল্লেখ করেন। সুরেন্দ্রনাথ সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেন যে তিনি নিঃসন্দেহে একজন আদর্শবাদী, কিন্তু ধৈর্যহীন নন এবং অবাস্তবচারীও নন, আর তাঁর বহু আদর্শের অনেকগুলি পূর্ণ হয়েছে, বা হবে।

## অষ্টাদশ অধ্যায়

## মণ্টফোর্ড রিপোর্ট এবং চরমপন্থীদের সঙ্গত্যাগ

১৯১৪ খৃষ্টাব্দে প্রথম মহাযুদ্ধ বাধল আর ভারতবর্ষের রাজনীতিতে গুরুতর পরিবর্তন দেখা দিল। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে ইম্পিরিয়াল লেজিস্‌লেটিভ কাউন্সিলের সীট হারানোর পর সুরেন্দ্রনাথ যুদ্ধের জন্য লোক সংগ্রহের কাজে নিজেকে লাগিয়ে দিলেন। তিনি অনেক জায়গায় ভ্রমণ করলেন এবং ত্রিশটিরও বেশি জনসভায় বললেন যে আত্মরক্ষার শিক্ষা গ্রহণ না করলে স্বাধীনতার কোনো অর্থই থাকেনা। তাঁর প্রচেষ্টায় বেশ ফল হয়েছিল। বাংলাদেশের সম্ভ্রান্ত শ্রেণী থেকে ৬০০০ হাজার এর উপর লোক পাওয়া গিয়েছিল সৈন্য বাহিনীতে যোগদানের জন্য। এবারে তাঁর এক নতুন অভিজ্ঞতা হল. তাঁর জীবনে এই প্রথম তিনি বড় বড় সরকারী অফিসারের সঙ্গে একই মঞ্চ থেকে পেলেন সমস্ত রকম সৌজন্যমূলক ব্যবহার।

ইংল্যাণ্ড ঘোষণা করেছিল যে সে যুদ্ধ করছে পৃথিবীর স্বাধীনতা, সুবিচার এবং অধিকার রক্ষার জন্য। ভারতবর্ষ তাতে পিছিয়ে থাকেনি, ইংল্যাণ্ডের যুদ্ধের কারণটিকে সেও নিজের বলে গ্রহণ করেছিল এবং স্বেচ্ছায় ইংল্যাণ্ডের বোঝা বয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করতে চেয়েছিল। এমনকি যুদ্ধ বাধবার কিছু পরই মুক্ত টিলক পর্যন্ত যুদ্ধের কাজে সাহায্য করতে সচেষ্ট হলেন। বৃটিশ রাজনীতিজ্ঞরা ভারতবর্ষের এই স্বতঃস্ফূর্ত ভাব প্রকাশের জন্য খুব তারিফ করলেন। ভারতবর্ষ যুদ্ধের জন্য একশো মিলিয়ন পাউণ্ড উপহার দিল, আর সাহায্যও করল অন্য অনেক ভাবে। ভারতবর্ষ এক অদ্ভুত আনুগত্য দেখাল, কিন্তু তার বদলে সরকারের ভারতরক্ষা আইন, যাতে বিনা বিচারে দ্বীপান্তরে পাঠানোর প্রচণ্ড ক্ষমতা

দেওয়া হল সরকারকে—এই পুরস্কারটি ঠিক আশা করা যায়নি। আনুগত্য অ-পুরস্কৃত থাকার ফলে অসন্তোষের সৃষ্টি হল।

এই সময়কার রাজনৈতিক ইতিহাস পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বলবার প্রয়োজন নেই। এই সময়কার ইতিহাসের প্রধান ঘটনাগুলি হল ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে মিসেস অ্যানি বেসান্টএর রাজনীতিতে যোগদান, টিলকের পুনরাবির্ভাব এবং হোম-রুল লীগ আন্দোলন। নরম এবং চরমপন্থীদের মধ্যেকার বিরোধ দূর করবার জন্য মিসেস বেসান্টএর প্রচেষ্টা আংশিক সফলতালাভ করেছিল আর তারই ফলে ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেসের যুক্ত অধিবেশন হয়েছিল। সমানভাবে উল্লেখযোগ্য যে ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে করাচীতে যে কংগ্রেস-মুসলীমলীগ ঐক্যের সূচনা হয়েছিল তা ১৯১৬ খৃষ্টাব্দের লক্ষ্ণৌ চুক্তিতে পরিণত হয়। ভারতীয় রাজনীতি তখন চলছে আমূল বদলের ভেতর দিয়ে। নরমপন্থীরা তখনো কংগ্রেসে উঠতির দিকে। কিন্তু ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে দুজন বড় বড় নেতা গোখলে এবং ফিরোজ শা মেহটার মৃত্যু হওয়াতে নরমপন্থী নেতৃত্ব বেশ উল্লেখযোগ্য ভাবে সঙ্কুচিত হয়ে পড়ল। পুরনো আমলের নেতাদের মধ্যে নাম করবার মত রইলেন একমাত্র সুরেন্দ্রনাথ। ইতিমধ্যে টিলক, মিসেস বেসান্ট, চিত্তরঞ্জন দাশ প্রমুখ নতুন নেতাদের সাহায্যে চরমপন্থীরা জেগে উঠল। তাঁদেরই ভেতর দিয়ে স্বায়ত্ত্ব শাসনের জন্য দেশের দাবী কার্যকর ভাবে সোচ্চার হয়ে উঠল, পুরনো নেতারা এঁদের সঙ্গে পেরে উঠলেন না। এটা ঠিকই, বাংলাদেশে চিত্তরঞ্জন দাশের উত্থান অন্তত সুরেন্দ্রনাথের পক্ষে খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়াল। তাঁর নেতৃত্বে চ্যালেঞ্জ এল চিত্তরঞ্জন দাশের কাছ থেকে এবং তাঁর প্রশ্নাতীত শ্রেষ্ঠত্ব থেকে এর ফলে চরম পতন ঘটল। ক্রমাগতই নরমপন্থী নেতৃত্ব জনসাধারণের আশা এবং আকাঙ্খার সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারছিলনা। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় বোম্বাই কংগ্রেসের কথা, এটি মূলতঃ নরমপন্থী, এস. পি. সিন্‌হা সভাপতি হিসাবে যে ভাষণটি দিয়েছিলেন তা চরমপন্থীদের ভাল লাগেনি কেননা বক্তৃতাটিতে ছিল রক্ষণশীলতার সুর। লক্ষ্ণৌর যুক্ত কংগ্রেসে যেখানে টিলক এবং খারপাড়ে,

অত্যন্ত হৃদ্যতার সঙ্গে সুরেন্দ্রনাথ ও রাসবিহারী ঘোষের সঙ্গে মিলিত হলেন, তার স্থায়িত্ব বেশিদিন রইলনা। রাজনৈতিক গভীরে আরো অন্যান্য সব শক্তি কাজ করছিল যা ফেটে পড়তে বেশি দেরি হলনা। সরকারীপক্ষ এবং চরমপন্থীদের মধ্যে স্যাণ্ডউইচ হয়ে নরমপন্থীদের অবস্থা খারাপ হয়ে দাঁড়াল। এই সময় থেকে সুরেন্দ্রনাথের রাজনৈতিক উচ্চস্থান থেকে পতন সুরু হল।

মিসেস অ্যানি বেসাণ্ট এর সঙ্গে যদিও সুরেন্দ্রনাথের রাজনীতিগত বিরোধ ছিল তবু তিনি তাঁকে বেশ উচ্চ প্রশস্তি করেন এই ভাবে: "......তাঁর বাগ্মিতা, তাঁর সরল ব্যক্তিত্ব, তাঁর নিরলস পরিশ্রম করবার ক্ষমতা এবং তাঁর সংগঠন ক্ষমতা খুব তাড়াতাড়িই প্রভাব বিস্তার করেছিল। ন্যাশান্যালিস্ট পার্টির ভেতরকার নানারকম উপদলের মধ্যে ঐক্য আনবার ব্যাপারে তাঁর যথেষ্ট হাত ছিল।"[১০০] কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ মনে করেন যে তাঁর হোমরুল লীগের প্রতিষ্ঠার ফলে নরম এবং চরম পন্থীদের পুনর্মিলনের পর আবার বিচ্ছেদ ঘটে। তিনি বা অন্য অনেক ভূতপূর্ব কংগ্রেস সভাপতি এতে যোগ দেননি। এরফলে তাঁকে বেশ কিছু জনপ্রিয়তা হারাতে হয়েছিল। যাই হক, যখন তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস হল যে হোমরুল লীগ প্রতিষ্ঠার ফলে কংগ্রেসের লাভের চেয়ে ক্ষতিই বেশি হবে, তিনি তখন তাঁর নীতিকেই আঁকড়ে রইলেন। লোকেরা তাঁকে এ ব্যাপারে শাসাতে লাগলেন এই বলে যে যদি তিনি হোমরুল লীগে যোগ না দেন তাহলে তাঁকে ইম্পিরিয়াল লেজিস্‌লেটিভ কাউন্সিলের নির্বাচনে ভোট দেওয়া হবেনা। সুরেন্দ্রনাথ এ ব্যাপারে বলেছেন, "আমার জন জীবনে কেউ আমাকে ভীতি প্রদর্শন করতে পারেনি, কিংবা ক্ষমতা মৃদু হাসি হেসে আমাকে ভুলিয়ে নিয়ে যেতে পারেনি।"[১০১] যখন মিসেস অ্যানি বেসাণ্টকে অন্তরীণ করা হল তখন সুরেন্দ্রনাথ দুটি প্রতিবাদ সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন এবং তাঁর শক্তিশালী কণ্ঠে তার প্রতিবাদ করেছিলেন।

১০০। এ নেশন ইন মেকিং
১০১। ঐ

এরপর এল শান্তিপূর্ণ উপায়ে প্রতিরোধের প্রশ্ন। শান্তিপূর্ণ উপায়ে প্রতিরোধের কথা জোরালো হয়ে উঠল তিনটি কারণে। প্রথম কারণ, তখনকার রাজনীতি স্বায়ত্ত্ব শাসনের দাবিতে যেভাবে চলছিল তাতে বুদ্ধিজীবীরা চূড়ান্ত হতাশ হয়ে নতুন পথের সন্ধান করছিলেন। দ্বিতীয় কারণ, স্বায়ত্ত্ব শাসন আন্দোলন এক নতুন উৎসাহের সঞ্চার করেছিল। শেষ কারণ হল মিসেস বেসাণ্ট অন্তরীণ হওয়ায় শান্তিপূর্ণ প্রতিরোধের ডাকে চটপট সাড়া পড়ে গিয়েছিল। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের জুলাইতে কংগ্রেসের বোম্বাই এর সভায়, সুরেন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে এই প্রশ্নের প্রচুর আলোচনা করা হয়। শান্তিপূর্ণ প্রতিরোধের সমর্থক ছিলেন বেশ শক্তিশালী অংশ, অবশ্য তার বিরোধীও অনেকে ছিলেন। শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটিকে কয়েক মাসের জন্য স্থগিত রাখা হয়। সুরেন্দ্রনাথ, যিনি বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় শান্তিপূর্ণ প্রতিরোধ পরিচালনা করেছেন, তাঁর মত হল যে শান্তিপূর্ণ প্রতিরোধ সফল করবার জন্য যে প্রবল জনমত প্রয়োজন তা সেই মুহূর্তে ছিলনা। এরমধ্যে মিসেস বেসাণ্ট এর অন্তরীণের প্রতিবাদ জানানোর জন্য কলকাতায় রাসবিহারী ঘোষের সভাপতিত্বে একটি সভা সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ হয়। বোম্বাই থেকে সুরেন্দ্রনাথ তাড়াতাড়ি কলকাতায় চলে এলেন। সুরেন্দ্রনাথের পরিচালনায় একটা পরামর্শ সভা হল। সরকারী আদেশ অমান্য করে সভা করার সপক্ষে প্রবল মত থাকা সত্ত্বেও একটি প্রতিনিধিদল—যার মধ্যে রইলেন সুরেন্দ্রনাথ এবং চিত্তরঞ্জন দাশ, গভর্নর লর্ড রনাল্ডশের কাছে গিয়ে সভাটিকে নিষিদ্ধ করে যে আদেশ দেওয়া হয়েছে সেটিকে তুলে নিতে বলেন। গভর্নরের কথাবার্তা থেকে বোঝা গেল যে, সাম্প্রতিক হোমরুল লীগের সভায় যে বেশ গরম গরম ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে তারই জন্য সরকার টাউন হলের সভা নিষিদ্ধ করেছেন—কেননা তাঁরা ভয় পাচ্ছিলেন ঐরকম কিংবা আরো কড়া ভাষা ঐ সভায় ব্যবহৃত হবে। প্রতিনিধিরা গভর্নরকে এ ব্যাপারে নিশ্চিত হতে বললেন যে সভার কাজ পরিমিত ভাবেই পরিচালিত হবে, তবে এ বিষয়ে কোনো প্রতিশ্রুতি দিলেন না। এরফলে সভা নিষিদ্ধ করার আদেশটি

তুলে নেওয়াতে তাঁরা সমর্থ হলেন। সুরেন্দ্রনাথ এবং তাঁর সহকর্মীরা এরফলে চরমপন্থীদের কাছ থেকে খুব একচোট সমালোচনার সম্মুখীন হলেন, কিন্তু সুরেন্দ্রনাথের মতে সরকারের সঙ্গে যে সংঘর্ষ হতে যাচ্ছিল তা দূর করা গিয়েছিল আর বিধিসঙ্গতভাবে সভা করার অধিকার এইভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

সুরেন্দ্রনাথের নিজের সভাপতিত্বে ঐ সভাটি হয়। সময় তখন বদলাচ্ছে অ-সহযোগ আন্দোলন তখনও দূরে কিন্তু চারিদিকে চাঞ্চল্য এবং আলোড়ন সুরু হয়ে গিয়েছে। সুরেন্দ্রনাথ চরমপন্থীদের আন্দোলন থেকে নিজেকে দূরে রাখলেও সে আন্দোলনের অর্থ তিনি খুব ভাল ভাবেই বুঝতে পারলেন।

১৯১৭ খৃষ্টাব্দের কলকাতা কংগ্রেস অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচন নিয়ে আর এক গোল বাধল। মিসেস বেসাণ্টকে অন্তরীণ রাখার জন্য তাঁকে প্রেসিডেণ্ট হিসাবে নির্বাচন করার জন্য একটা আন্দোলন হল। চিত্তরঞ্জন দাশও ছিলেন তাঁর পক্ষে। প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর নেতা হিসাবে সুরেন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন হমাদাবাদের রাজাকে সভাপতি মুকরতে, কিন্তু অভ্যর্থনা কমিটী মিসেস বেসাণ্টকে সভাপতি করতে চেয়েছিলেন। এরমধ্যে আরো কয়েকটি প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটী মিসেস বেসাণ্টকে সমর্থন করলেন। শেষ পর্যন্ত তিনিই সভাপতি হলেন। সুরেন্দ্রনাথ মনে করেন যে এই তিক্ত তর্কাতকির ফলে কংগ্রেসের কর্মীদের মধ্যে নতুন করে বিভেদ সৃষ্টি হয়। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের কংগ্রেস, "ভারতবর্ষে একটি নতুন দলের সৃষ্টি করেছিল, যা নরমপন্থী হিসাবে সুরু হয়ে পরে উদারনৈতিক দলের রূপ নিয়েছিল, আর এই কংগ্রেসেই প্রথম বয়স্ক রাজনীতিজ্ঞরা সভার কার্যকলাপের উপর কর্তৃত্ব হারিয়ে ফেলেছিল।"[১০২] কংগ্রেসের মঞ্চে শেষবারের মত উঠে দাঁড়িয়ে সুরেন্দ্রনাথ শেষ মহান বক্তৃতা দিলেন তাঁর প্রিয় বিষয় স্বায়ত্ত্ব শাসন নিয়ে। এই সময় সি. আর. দাশ কর্তৃক তিনি

১০২। লাইফ অ্যাণ্ড টাইমস্ অব সি. আর. দাশ—পি. সি. রায়

বাংলার নেতৃত্বপদ থেকে অপসারিত হয়েছেন। লক্ষ্ণৌ-এর ঐক্য কেবল একটা জোড়া তালির ব্যাপার বলে প্রমাণিত হল, আর ন্যাশনালিস্ট পার্টির ছুটি উপদল, নরম এবং চরমপন্থী চিরকালের জন্য আলাদা হয়ে গেল।

এই সময়কার সবচেয়ে বড় নাটকীয় ঘটনা ঘটে ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে যখন ভারতবর্ষের সেক্রেটারী অব ষ্টেট, মিঃ মণ্টেগু সংস্কারগুলি ঘোষণা করেন। এর পরই সমান নাটকীয় আর একটি ঘোষণা করেন যে তিনি ভারত পরিদর্শনে আসবেন। এই ব্যাপারটা একেবারে নতুন, সাধারণ আমলাতান্ত্রিক কাজকর্মের বিপরীত, লোকেরা একে স্বাগত জানাল, অনেক আশা লোকের বুকে জাগল, কিন্তু সমস্ত আশা অবশ্য পূর্ণ হয়নি শেষ পর্যন্ত। মণ্টেগু চেমসফোর্ড প্রস্তাবগুলি, যা কিনা অনেক সময়ে মণ্টফোর্ড প্রস্তাব হিসেবে পরিচিত, "দায়িত্বশীল সরকার" গঠন করার কথা ভেবেছিল, প্রথমে অত্যন্ত কম মাত্রায়, কেবলমাত্র প্রদেশগুলিতে। ভারত সরকার অবশ্য দায়ী থাকবেন ইংল্যাণ্ডের পার্লামেণ্টের কাছে, সেক্রেটারী অব ষ্টেটের মাধ্যমে। আসলে ভারত সরকারের পক্ষে ব্যাপারটা প্রদেশগুলিতে যখন দ্বৈত-শাসন চালু করা হয়েছিল তখনকার মতই রইল। সংস্কারগুলি যে ভিত্তিতে হবে তার নীতি নির্ধারিত হবে—প্রধানত স্থানীয় শাসনকার্য নিয়ন্ত্রিত হবে যতদূর সম্ভব জনসাধারণের দ্বারা, আর প্রদেশগুলিতে যে দায়িত্ব দেওয়া হবে তা দ্বৈত-শাসনের কায়দায়।

বহু ঐতিহাসিক মণ্টেগুর এই প্রচেষ্টাকে এবং তাঁর ভারতবর্ষের প্রতি সহানুভূতিকে প্রশংসা করেছেন। বলা হয় ভারতবর্ষ মণ্টেগুর কাছে ছিল আবেগে পরম প্রিয়। তিনি ভারতবর্ষে সদলবলে এসেছিলেন নভেম্বরে, আর ছ মাস ধরে সমস্ত দেশ ঘুরে লোকেদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করেছেন, লোকেদের জেরা করেছেন। যাঁদের প্রচণ্ডভাবে জেরা করা হয় তাঁদের মধ্যে সুরেন্দ্রনাথ ছিলেন অন্যতম। মিঃ মণ্টেগু বলেছেন: "আমরা তখন ভারতবর্ষের রাজনীতির সত্যিকারের বিশাল ব্যক্তিদের সঙ্গে মুখোমুখি হয়েছি……বৃদ্ধ সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, বাংলাদেশের পুরনো অভিজ্ঞ ব্যক্তি, অভিভাষণটি পড়ে শোনালেন, তা সুন্দরভাবে

লেখা হয়েছিল, পড়াও হয়েছিল তেমনি ভাবে······দিনের বাকী সময়টা কেটে গেল সাক্ষাৎকারে। প্রথমে এলেন সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ। ক্রমাগত কথা বলছেন, বাক্যবাগীশ, পরিশ্রমী, কিন্তু একবারও নরম হবার বা আপসের ভাব ছিল না। তিনি সবচেয়ে কম যা গ্রহণ করতে রাজি তা হল কংগ্রেসের পরিকল্পনা।"[১০৩]

১৯১৮ খৃষ্টাব্দের জুলাইতে মণ্টেগু চেমস্ফোর্ড রিপোর্ট প্রকাশিত হবার পর যে দারুণ আলোড়ন উপস্থিত হয়েছিল তা সুবিদিত। চরমপন্থীরা এটিকে সম্পূর্ণভাবে বাতিল করে দিলেন। টিলক এটিকে বললেন, "একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয়।" মিসেস বেসাণ্টও এটিকে সমর্থন করলেন না। কংগ্রেসীদের মধ্যে এ ব্যাপারে প্রচণ্ড মতবিরোধ দেখা দিল। যদিও কেউই পুরোপুরি সন্তুষ্ট হলেন না তবু অনহুমোদনের মধ্যেও মাত্রা পার্থক্য রইল। কেউ হয়ত বা চাইলেন এটিকে পুরোপুরি অগ্রাহ্য করতে, কেউবা কেবল একটু অদল বদল করে গ্রহণ করতে রাজি হলেন।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দের ভারত সরকার আইন যার মধ্যে মণ্টফোর্ড সংস্কারের প্রধান প্রধান বিষয়গুলির অন্তর্ভুক্তি ঘটেছিল, সেগুলি এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করা যেতে পারে। এই সংস্কারগুলি চেয়েছিল, আস্তে আস্তে স্বায়ত্ব শাসন সংস্কারগুলির সম্প্রসারণ হবার সঙ্গে সঙ্গে দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে এবং সেজন্য শাসনের সমস্ত বিভাগে আরো বেশি করে ভারতীয়দের সংস্পর্শে আসতে হবে।

সাংবিধানিক ক্ষেত্রে ভারত সরকারের অবস্থার কোনো হেরফের ঘটলনা, সেক্রেটারী অব ষ্টেটের উপর খবরদারি এবং নিয়ন্ত্রণ করবার ক্ষমতা রয়েই গেল। কেন্দ্রে আইনসভা হল দ্বিকাক্ষিক, সেখানে সভ্যদের আরো বেশি ক্ষমতা দেওয়া হল, এরফলে সভ্যদের তর্কে বাধা দেবার, অতিরিক্ত প্রশ্ন করবার, প্রস্তাব করবার অধিকার হল। কেন্দ্রীয় বাজেটের কিছু

১০৩। অ্যান ইণ্ডিয়ান ডায়েরী দ্রষ্টব্য

অংশ যার উপর কোনো ভোটাভুটি চলবেনা এছাড়া বাকী খরচগুলি করতে গেলে ভোট দেওয়া হবে তবে বড়লাটের সেটাকে ইচ্ছে করলে বাতিল করবার ক্ষমতা রইল। আসলে, আইনসভার সঙ্গে প্রশাসকদের কোনো সম্পর্কই রইলনা, প্রায় সমস্ত ব্যাপারেই প্রশাসকদেরই কথা শেষ কথা হয়ে রইল।

প্রাদেশিক ক্ষেত্রে আইনটি সরকারকে দু ভাগে ভাগ করল, অর্থাৎ ব্যাপারটি হল দ্বিকাক্ষিক। এরমধ্যে কিছু বিষয় রইল সংরক্ষিত, আর অন্য কিছু ছেড়ে দেওয়া হল। প্রথমটির ক্ষেত্রে গভর্নর নিজের মনোনীত একজিকিউটিভ কাউন্সিলের সাহায্যে শাসন করবেন, আর দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে গভর্নর নিজের মনোনীত মন্ত্রীদের সাহায্যে শাসন চালাবেন। গভর্নর তাই কেবলমাত্র আইন মাফিক কর্তা রইলেন না, তাঁর নানারকম বিশেষ দায়িত্ব রইল, আর তাঁর মন্ত্রীদের অমান্য করবার ক্ষমতাও রইল।

প্রাদেশিক কাউন্সিলগুলিকে বেশ বড় করা হল– এর সভ্যদের শতকরা ৭০ জন নির্বাচনের মাধ্যমে আসবেন, আর ৩০ জনকে মনোনীত করা হবে। তাঁরা প্রশ্ন করবার অধিকারী হলেন, অতিরিক্ত প্রশ্ন করবার ক্ষমতা অর্জন করলেন, এমনকি বাজেটকে বাতিল করার ক্ষমতাও রইল, যদিও গভর্নরের ক্ষমতা রইল আবার সেটাকে চালু করা।

বাংলা কংগ্রেসের প্রাদেশিক কমিটির একটি বিশেষ অধিবেশনে ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে নরমপন্থীরা সংস্কারগুলিকে গ্রহণের ব্যাপারে নিজেদের এক অসহায় অবস্থায় দেখতে পেলেন। সুরেন্দ্রনাথ এবং চিত্তরঞ্জন দাশের মধ্যেকার পার্থক্যটা আবার প্রধান হয়ে দাঁড়াল। প্রথম জন যেখানে রিপোর্টটিকে গ্রহণ করবার পক্ষে, দ্বিতীয় জন, চিত্তরঞ্জন, যিনি মণ্টেগুকে বলেছিলেন যে দায়িত্বশীল সরকার এবং সম্পূর্ণ দায়িত্বশীলতার মাঝামাঝি কিছু থাকতে পারেনা, এই সংস্কারগুলি যথেষ্ট নয় বলে মত প্রকাশ করেছিলেন। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে বিশেষ ভাবে আহুত কংগ্রেসের উপর ভার পড়ল শেষ সিদ্ধান্ত নেবার। অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটী এবং প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিগুলি ইতিমধ্যে সকলেই চিত্তরঞ্জন দাশের মতই চিন্তা সুরু করেছেন।

চিত্তরঞ্জন নিজেই স্থান হিসেবে বোম্বাই এবং সভাপতি হিসেবে মিঃ হাসান ইমামকে মনোনীত করবার ব্যাপারে একটি সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ এবং তাঁর প্রধান নরমপন্থী সহযোগিগণ ঐ বিশেষ কংগ্রেস অধিবেশনে যোগ দেননি, তিনি ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের নভেম্বরে নরমপন্থী দলের এক সভা করলেন বোম্বাইতে। সুরেন্দ্রনাথ সেই সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন। ভাঙ্গন একেবারে পুরো হবার আগে মিলনের জন্য কিছু চেষ্টা করা হয়েছিল কিন্তু তা সফল হয়নি। অনেকদিন থেকেই এই ফাটল হবে বলে মনে হচ্ছিল, এখন তা সম্পূর্ণ হল।

সুরেন্দ্রনাথ, যিনি কংগ্রেসকে নিজের রক্তবিন্দু দিয়ে গড়ে তুলেছিলেন বলা যায় তাঁর পক্ষে এটি হল একটি বেদনাময় অভিজ্ঞতা। দুটি দলের মধ্যে বিরোধ ছিল মৌলিক—দেশের স্বাধীনতার ব্যাপারে। সুরেন্দ্রনাথ বলেন: "কংগ্রেস যত বড় দলই হকনা কেন, আসলে এটা কোন একটি লক্ষ্যে পেঁাছবার উপায় মাত্র। লক্ষ্য ছিল স্বাধীনতা। আমরা লক্ষ্যের খাতিরে উপায়টিকে বিসর্জন দিলাম।"[১০৪] আসলে নরমপন্থীরাই সংস্কার প্রস্তাবগুলিকে রক্ষা করলেন এবং সুরেন্দ্রনাথ এ ব্যাপারে সন্দেহাতীত ভাবে বেশ বড় রকমের ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। বিশেষ অধিবেশনটিতে সংস্কারগুলি সম্পর্কে কংগ্রেস অসন্তোষ প্রকাশ করেছিল, কংগ্রেস লীগ পরিকল্পনাটির সপক্ষে ঘোষণা করেছিল যে সাম্রাজ্যের মধ্যে থেকে স্ব-শাসনের কমে ভারতীয়দের আশা পূর্ণ হবে না, এবং মণ্টেগু চেমস্‌ফোর্ড রিপোর্টে ভারতীয়দের সম্পর্কে যে ভারতীয়দের দায়িত্বশীল সরকার সম্পর্কে ইঙ্গিত আছে তার প্রতিবাদ করেন।

কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ কেন মণ্টফোর্ড পরিকল্পনাটিকে সমর্থন করতে গেলেন? একি চাকুরির মিষ্টি মিঠাই এর লোভে? সুরেন্দ্রনাথের সমগ্র জীবনে আমরা নির্ভুল প্রমাণ পেয়েছি যে তাঁর চরিত্র ছিল অদমনীয়, স্বাধীন —কেউ কখনো কল্পনাও করতে পারেন না তাঁকে ভুলিয়ে বা ভয় দেখিয়ে বাধ্য করতে পারে।

১০৪। এ নেশন ইন মেকিং

মণ্টেগু চেমস্‌ফোর্ড পরিকল্পনা গ্রহণ করে এটাকে সুরেন্দ্রনাথ তাঁর সমগ্র জীবন ধরে যে সমস্ত কথা ভেবেছেন, তাঁর যেসব ব্যাপারে বিশ্বাস, যা তিনি তাঁর বহু বক্তৃতায় এবং 'এ নেশন ইন মেকিং' বইটিতে বুঝিয়ে বলেছেন, তাই পরীক্ষা করতে চেয়েছিলেন। তিনি সরলভাবে স্বীকার করেছেন যে তাঁর লক্ষ্য বরাবরই ছিল বিধিবদ্ধভাবে আন্দোলন চালিয়ে সাম্রাজ্যের মধ্যে থেকে স্ব-শাসন। তাঁর প্রথম দিককার রাজনৈতিক জীবন ছিল আপোসহীন অবিরাম আন্দোলন। কিন্তু যখন মণ্টেগু চেমস্‌ফোর্ডের পরিকল্পনা এলো, তখন তাঁর বিচার অনুসারে সরকারী নীতিতে নিশ্চিত ভাবে অগ্রগতির লক্ষণ দেখা গিয়েছিল আর যখন তাঁর কাছে দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠার কাঠামো তৈরির ব্যাপারে সহযোগিতা চাওয়া হয়েছিল তখন অসহযোগিতা হত অবিজ্ঞজনোচিত এবং দেশপ্রেমিকের অনুপযুক্ত। এইভাবে তিনি যুক্তি দেখিয়েছিলেন। চরমপন্থীদের মতে মণ্টফোর্ড প্রস্তাবগুলি জাতীয় লক্ষ্য সত্যিকারের দায়িত্বশীল সরকার বলতে যা বোঝায় তা থেকে অনেক দূরে ছিল। তাঁরা বললেন যে ভারতবর্ষ দায়িত্বশীল সরকারের উপযুক্ত, প্রস্তাবগুলিতে যা প্রচ্ছন্ন রয়েছে তা ঠিক নয়, টিলকের মতে এই প্রস্তাবে "দায়িত্বশীল সরকার রয়েছে মাত্র এক আনা পরিমাণ", চিত্তরঞ্জন দাশ দাবি করলেন সত্যিকারের দায়িত্বশীল সরকার পাঁচ বছরের মধ্যে চাই, এবং তা তখুনি প্রতিজ্ঞা করতে হবে। একদিকে চরমপন্থীরা এই পরিকল্পনার বিরুদ্ধে দারুণ বিরোধিতা করছিলেন, আর অন্যদিকে ইঙ্গভারত এটিকে ভাল চোখে দেখছিলেন না। একটি তৃতীয় দল এই পরিকল্পনাকে বানচাল করবার চেষ্টা করছিলেন, তাঁরা হলেন লর্ড সিডেন হ্যাম, এবং তাঁর মত নাছোড়বান্দা লোকজন। সুরেন্দ্রনাথ বললেন যে সংস্কারগুলি থেকে যত সামান্যই পাওয়া যাক না কেন, যদি দেশের উপকারে তা লাগাতে হয় তাহলে তা গ্রহণ করতেই হবে এবং কাজেও লাগাতে হবে।

সুরেন্দ্রনাথ এবং তাঁর সহকর্মীরা এই কারণেই পরিকল্পনাটিকে স্বাগত জানিয়েছিলেন, কেননা তাঁরা অনুভব করেছিলেন যে যখন সরকারকে

সাহায্য করা কর্তব্য তখন তা না করা হলে সেটাকে দেশপ্রেম বলা যায় না। তাঁরা সকলেই সংস্কারগুলির সীমিত ক্ষমতা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন এবং সে সম্পর্কে কোনো বিরাট মোহ ছিলনা। কিন্তু তাঁরা মনে করেছিলেন যে যত সামান্যই হকনা কেন, সেটা গ্রহণ করবার পর আরো বেশি সুবিধা পাবার জন্য দাবি করা যাবে এবং এইভাবে আস্তে আস্তে স্ব-রাজ্যের লক্ষ্যে পৌঁছুনোর পথে অনেকখানি এগিয়ে যাওয়া যাবে। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের ২০শে আগষ্টের ঘোষণায় সেটাকেই সুনিশ্চিত করেছে। অন্য কথায় বলতে গেলে, সুরেন্দ্রনাথ এবং তাঁর সহকর্মীরা মিঃ মণ্টেগু এবং বৃটিশ সরকারের প্রতি অখণ্ড বিশ্বাস আরোপ করেছিলেন। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের অমৃতসরের কংগ্রেস অধিবেশনে গান্ধীজী চিত্তরঞ্জন দাশের ঘোষণা, যে সংস্কারগুলি হল, "অসন্তোষজনক, অপ্রতুল এবং হতাশাপূর্ণ"[১০৫] এই প্রস্তাবের উপর যে সংশোধন প্রস্তাব আনেন সেটারও বক্তব্য এইরকমই ছিল। এমনকি চিত্তরঞ্জনও শেষ পর্যন্ত গান্ধীজীর বক্তব্য, যাকে বলা যায় প্রতিবেদনশীল সহযোগিতা—যদিও নরমপন্থীরা কংগ্রেস থেকে এই ব্যাপারেই বেরিয়ে চলে গেছে। কংগ্রেসের ধর্ম এবং সুরেন্দ্রনাথের উদারনৈতিক চিন্তাধারার মধ্যে কোনো বিরাট কিছু পার্থক্য ছিলনা। ১৯২০ সাল পর্যন্ত কংগ্রেসের লক্ষ্য ছিল সাম্রাজ্যের অন্তর্গত অন্যান্য স্বায়ত্ব শাসিত দেশগুলির মত অবস্থায় পৌঁছুনো, কিন্তু তারপর এই লক্ষ্য বদলে হয় সমস্ত রকম শান্তিপূর্ণ এবং আইন সঙ্গত উপায়ে আন্দোলন করে স্বরাজ লাভ। নরমপন্থী এবং জাতীয়তাপন্থীদের মধ্যে পার্থক্য এই ছিল যে প্রথমোক্তদের মত শেষোক্তদের বৃটিশদের উপর অখণ্ড বিশ্বাস ছিলনা। এই দুই রাজনৈতিক দলের মধ্যে এই পার্থক্যটাই বিরাট হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

সংস্কারগুলি সম্পর্কে সুরেন্দ্রনাথের মত টিলকের "সংবেদনশীল সহযোগিতা"র বা "সম্মানজনক সহযোগিতা" যা কিনা পরে চিত্তরঞ্জন তাঁর

১০৫। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, এইচ. এন. দাশগুপ্ত (বিল্ডার্স অব মর্ডান ইণ্ডিয়া সীরিজ)

শেষ জীবনে গড়ে তোলেন, তা থেকে এমন কিছু বিশেষ পার্থক্য ছিলনা। ফরিদপুরে ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের মে মাসের বাংলা প্রাদেশিক সম্মেলনে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন যে অভিভাষণ দিয়েছিলেন তাতে প্রমাণ হয় যে তখন তাঁর সুর অনেক নরম হয়েছে, তিনি কমনওয়েলথে থাকা মেনে নিয়েছেন, মেনে নিয়েছেন সম্মানজনক সহযোগিতাও। তিনি বলেছিলেন : "আমার মনে হয় ভারতবর্ষের মঙ্গলের জন্য, কমনওয়েলথ এর মঙ্গলের জন্য এবং পৃথিবীর মঙ্গলের জন্য ভারতবর্ষ কমনওয়েলথ-এর ভেতরে থাকবার স্বাধীনতার জন্য চেষ্টা করবে, ফলে মানবত্বকে সেবা করা সম্ভব হবে।"[১০৬] পুনরায় বলেছেন, "যদি সত্যিকারের দায়িত্ব জনসাধারণকে দেওয়া হয় তাহলে সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা না করার কোনো কারণ নেই।"[১০৭] পি. সি. রায়, যিনি দেশবন্ধুর জীবনের শেষের দিকে ঘনিষ্ঠ ছিলেন, বলেন যে মৃত্যুর কিছুদিন আগে চিত্তরঞ্জন তাঁকে বলেছিলেন যে তিনি মণ্টেগুর পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করতে রাজি, যদি অবশ্য মন্ত্রীদের সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে তাঁদের কাজ করতে দেওয়া হয়।"[১০৮]

কংগ্রেস ১৯১৯ সালের সংস্কারগুলিকে পরিত্যাগ করে এবং অসহযোগের পথ গ্রহণ করে। কয়েক বছর পর ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে, মতিলাল নেহরু এবং চিত্তরঞ্জন সংস্কারগুলিকে রূপায়ণে ক্রমাগত বাধা দেবার জন্য স্বরাজ্য দল গঠন করেন। কিন্তু পরে দেখা গেল ক্রমাগত বাধা দানের নীতি নেতিবাচক এবং এতে কোনো লাভ হচ্ছে না। পরে স্বরাজ্য দল ভেঙ্গে যায় এবং এর বেশ কিছু উৎসাহী সভ্য সহযোগিতা সুরু করে দেন। স্বরাজ্য দলের সভ্যদের মধ্যে রাজকুমার স্বরূপ চিত্তরঞ্জন দাশের মধ্যে যে পরিবর্তন হয়েছিল তার উল্লেখ আগেই করা হয়েছে।

---

১০৬। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, এইচ. এন. দাসগুপ্ত ( বিল্ডার্স অব মর্ডান ইণ্ডিয়া সীরিজ )

১০৭। ঐ

১০৮। লাইফ অ্যাণ্ড টাইমস্ অব সি. আর. দাশ, পি. সি. রায়।

আগে যা বলা হচ্ছিল তার সূত্র ধরে আবার বলা হচ্ছে। সংস্কারগুলি নিয়ে যে তর্ক বিতর্কের ঝড় ও উত্তাপ সৃষ্টি হয়েছিল তারই মধ্যে সুরেন্দ্রনাথ কংগ্রেসকে পরিত্যাগ করেন। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের ১লা নভেম্বর তারিখে বোম্বাইতে নরমপন্থীদের একটি সমাবেশ হয়, সুরেন্দ্রনাথ তার সভাপতি হন এবং ন্যাশনাল লিবারেল ফেডারেশন অব ইণ্ডিয়ার সূত্রপাত সেখানে হয়। সুরেন্দ্রনাথ তাঁর সভাপতির অভিভাষণে "নরমপন্থী" কথাটা বাতিল করে "ন্যাশনালিস্ট দলের মধ্য অংশ" নামটা ব্যবহার করতে বলেন। তিনি নরমপন্থীদের যা বিশ্বাস তা এইভাবে লিপিবদ্ধ করেন : "আমরা হলাম বিবর্তনের বন্ধু, বিপ্লবের শত্রু। আমরা বিপ্লবকে ঘৃণা করি আমাদের নিজেদের এবং সরকারের প্রয়োজনে। আমাদের ধর্ম হল সম্ভবপর সমস্ত ক্ষেত্রেই সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করে চলা, আর যখন মাতৃভূমির চরম প্রয়োজনে বিরোধিতা করা প্রয়োজন তখন বিরোধিতা করা।......কেবলমাত্র বিরোধিতা করার জন্যই বিরোধিতা করাকে আমরা নিন্দা করি।" ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের ২০শে আগষ্ট তারিখের মণ্টেগুর বাণীকে তিনি বলেন, "আমাদের মহত্তম সনদ" এবং বৃটিশের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের এটা "অসাধারণ স্মরণীয় এই ব্যতিক্রম।" তিনি সাবধান করে বলেন সংস্কারগুলিকে যে কোনোভাবে কেটে বাদ দেওয়া হলে তার পরিণাম হবে ভয়ঙ্কর।

নিউ ইণ্ডিয়াতে প্রকাশিত এবং বোম্বে ক্রনিক্‌ল-এ ১১ই নভেম্বর ১৯১৮ পুনর্মুদ্রিত "নরমপন্থীদের অগ্রগতি" নামে একটি প্রবন্ধে মিসেস বেসাণ্ট পুরনো আমলের কংগ্রেসীদের দেশের সঙ্গে এগিয়ে না চলার জন্য সমালোচনা করেছিলেন। তিনি তাতে লিখেছিলেন সুরেন্দ্রনাথকে বড় বলা হয় হয় তাঁর পুরনো আমলের কাজের জন্য, "কিন্তু সেই পথ পরিত্যাগ করেছেন।" এই মন্তব্য করা হয়েছিল নরমপন্থীদের বোম্বাই সম্মেলন সম্পর্কে।

# উনবিংশ অধ্যায়

## নরমপন্থী প্রতিনিধিদের ইংল্যাণ্ড যাত্রা

ইম্পিরিয়াল লেজিস্‌লেটিভ কাউন্সিলে মিঃ মণ্টেগু তাঁর সংস্কার প্রস্তাবগুলির পুরো সমর্থন পেয়েছিলেন, পরে নরমপন্থীরা তাঁকে সমর্থন করায় তাঁর প্রতিষ্ঠা আরো বেড়ে গিয়েছিল।

ইম্পিরিয়াল লেজিস্‌লেটিভ কাউন্সিলে সুরেন্দ্রনাথ কাউন্সিলের বে-সরকারী প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি কমিটী গঠন করবার প্রস্তাব করেন, যে কমিটী সংস্কার সম্পর্কীয় রিপোর্টটি বিচার করে দেখবেন এবং সরকারকে সেইমত সুপারিশ করবেন। তাঁর বক্তৃতায় তিনি বললেন যে সংস্কারগুলি সম্পর্কীয় রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে শাসকদের দৃষ্টিভঙ্গীর বেশ উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেছে এবং ভারতীয়দের দৃষ্টিভঙ্গীও সরকারের প্রতি সমানভাবে বদলানো প্রয়োজন। "মানিয়ে চলা হল জীবনের নিয়ম- তা সে ব্যক্তিগতই হক বা দলবদ্ধভাবেই হক। মানিয়ে চলাই জীবন আর তা না করলেই মৃত্যু।" এই প্রস্তাব উত্থাপন করে তিনি এবং তাঁর নরমপন্থী সহযোগীরা সংস্কারগুলি সম্পর্কে কি ভাবেন তা স্পষ্ট করে বললেন। তিনি বললেন: "আমি প্রস্তাবিত সংস্কারগুলি সম্পর্কে বলতে চাই যে এগুলি যেরকম সাধারণত চলছিল তার তুলনায় প্রগতিশীল, না, আরো বেশি বলব, দায়িত্বশীল সরকারের পথে এগিয়ে যাবার স্পষ্ট পদক্ষেপ...... ভারতবর্ষের সঙ্গে বৃটেনের সম্পর্কের ইতিহাসে ১৯১৭ সালের ২০শে আগষ্টের বাণীর মত শোভন বাণী আর কখনো শোনা যায়নি...... পরিকল্পনাটি উন্নতি সাপেক্ষ, বদলানো দরকার, বাড়ানো দরকার......এর উপর আমরা গড়ে তুলতে চাই, আমরা এর অন্তর্নিহিত বক্তব্যের সঙ্গে

সঙ্গতি রেখে গড়তে চাই, বদলাতে চাই, বাড়াতে চাই।"[১০৯] তিনি আরো বলেন, যে ঐ রিপোর্টটি, "আমাদের শাসকদের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তনের একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ এবং আমি এটা বলতে সাহসী হচ্ছি যে আমাদের দেশের সরকারের প্রতি আমাদের নিজেদেরও দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন হওয়া প্রয়োজন।" তিনি বলতে থাকেন : "মাই লর্ড, আমাদের দেশের ইতিহাসে আমরা একটি মনস্তাত্বিক মুহূর্তে এসে পেঁাছেছি। আমাদের এখন একটা পথ বেছে নিতে হবে। ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে আমাদের সাবধানতা এবং যত্নের ওপর। আমরা ভবিষ্যৎকে তৈরিও করতে পারি, ধ্বংসও করতে পারি। আমি আমার দেশবাসীর কাছে আবেদন করছি তাঁরা যেন সাহসের সঙ্গে, বিবেচনার সঙ্গে, আত্ম সংযমের সঙ্গে, তার সঙ্গে জাতীয় জীবনের সবচেয়ে বড় গুণ যা সেই দেশপ্রেমে নিজেদের উৎসর্গ করে ভবিষ্যৎকে গড়ে তুলুন।"[১১০]

লর্ড চেমস্‌ফোর্ড যিনি সভাপতিত্ব করছিলেন, এই প্রস্তাবকে দুভাগে ভাগ করে ভোট আহ্বান করেন। প্রস্তাব সমগ্রভাবেই গৃহীত হল। ঐ দিন সন্ধ্যায় বড়লাট সুরেন্দ্রনাথকে ডেকে পাঠালেন এবং তাঁকে কমিটীর সভাপতিত্ব করতে বললেন যে কমিটী তৈরি সুরেন্দ্রনাথ নিজেই প্রস্তাব করেছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ রাজি হওয়ায় কমিটীর চেয়ারম্যান নিযুক্ত হলেন। অন্যান্য সুপারিশগুলির মধ্যে এই কমিটী কেন্দ্রেও দ্বৈত শাসন সুপারিশ করেন। তিনি বললেন : "যদি প্রদেশে দ্বৈত শাসন কার্যকর এবং সম্ভবপর হয় তাহলে কেন্দ্রেও সৈন্য বাহিনী এবং দেশীয় রাজ্যগুলি ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে দ্বৈত শাসন করে দেখা উচিত।"[১১১] সংস্কারগুলি সম্পর্কে তিনি যতবার কিছু বলেছেন সেগুলির মধ্যে সুরেন্দ্রনাথ বহুবার এই ব্যাপারে জোর দিয়েছেন।

১০৯। প্রসিডিংস অব দি ইণ্ডিয়ান লেজিস্‌লেটিভ কাউন্সিল— সেপ্টেম্বর ১৯১৮ দ্রষ্টব্য।

১১০। ঐ

১১১। এ নেশন ইন মেকিং

নাগরিক অধিকার কমিটীর সভ্য হিসাবে, লর্ড সাউথবরোর সভাপতিত্বে সুরেন্দ্রনাথ বহুস্থান ভ্রমণ করেন, কিন্তু কোথাও তিনি বর্জন করবার মত কিম্বা খবর না দেবার মত মনোভাব দেখেননি। সরকারী কমিটীর সভ্য হিসাবে, একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাজ করা তাঁর পক্ষে বাস্তবিক এটা একটা নতুন ধরনের অভিজ্ঞতা। সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে প্রতিনিধি প্রেরণের নীতি যখন একবার মেনে নেওয়া হয়েছে তখন আর তা নিয়ে দ্বিধা করা চলেনা। কিন্তু অনুপাত নির্ধারণে কমিটী মোটামুটি লক্ষ্ণৌ এর চুক্তি অনুসরণ করেছিল। শিখদের জন্য একটি পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী সৃষ্টি করা হয়েছিল উর্ধতন কর্তৃপক্ষের আদেশে। একই রকমভাবে, জমিদারদের জন্য একটা আলাদা নির্বাচকমণ্ডলী সৃষ্টির প্রশ্ন উঠল। ব্যক্তিগতভাবে সুরেন্দ্রনাথ এরকম "বিশেষ অধিকারভুক্ত শ্রেণী" সৃষ্টির বিরোধী ছিলেন, কিন্তু উর্ধতন কর্তৃপক্ষ অন্যরকম সিদ্ধান্ত করেছিলেন, ফলে কমিটী তা মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিল। এগুলি এবং এরকম আরো সব প্রশ্নের ব্যাপারে ছিল কমিটীর উপর ভার, কিন্তু সমস্যাগুলি ছিল জটিল এবং বহু, ফলে কাজগুলো ছিল কঠিন।

এখানে সুরেন্দ্রনাথের রাওলাট বিল সম্পর্কে মনোভাব কি ছিল তা বলা অপ্রাসঙ্গিক হবেনা। তখন যুদ্ধ শেষ হয়ে আসছে এবং অসাধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ভারতরক্ষা আইনের মেয়াদও শেষ হয়ে আসতে আমলারা দেশের আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য একই ধরনের ক্ষমতার জন্য বায়না ধরলো—যদিও তার রূপ হবে পৃথক। রাউলাট কমিটীর রিপোর্ট অনুসারে ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারীতে ইম্পিরিয়াল লেজিস্‌লেটিভ কাউন্সিলে ভারতীয় সদস্যদের প্রচণ্ড বিরোধিতা সত্ত্বেও দুটি বিল উত্থাপিত হয়, এবং শেষ পর্যন্ত গৃহীতও হয়। রাজনৈতিক চেতনা সম্পন্ন ভারতীয়দের কাছে এটি প্রচণ্ড আঘাত স্বরূপ এবং বৃটিশ শাসকদের শাসনের শূন্যগর্ভতা প্রকাশ করে। এর ফলে দেশব্যাপী যে কাণ্ড ঘটতে থাকল ক্রমান্বয়ে তা আর বলার প্রয়োজন নেই। সুরেন্দ্রনাথ, যিনি এই বিলগুলিকে মনে করতেন

"অসহযোগের জন্মদাতা", কাউন্সিলে এই বিলটির বিরুদ্ধে প্রাণপণ যুদ্ধ করেন।

দুটি বিলের একটি ক্রিমিন্যাল ল ( এমারজেন্সি পাওয়ার্স ) বিলটি সম্পর্কে হোম মেম্বর, সার উইলিয়াম ভিনশেণ্ট সেই চিরপরিচিত বিপ্লবীদের কার্যকলাপ এবং দৌরাত্ম্যের কথা বলেন। তিনি অন্য বিলটি ক্রিমিন্যাল ল ( অ্যামেণ্ডমেন্ট ) সম্পর্কেও ঐ একই অভিযোগ করেন। প্রথম বিলটিকে খুব জোরালোভাবে সমালোচনা করে সুরেন্দ্রনাথ বলেন: "এটাকে চেপে রেখে কোনো লাভ নেই যে বিলটি ভারতীয় জনসাধারণের মনে প্রচণ্ড উদ্বেগ এবং আতঙ্কের সৃষ্টি করেছে, আর আমার মতে এর যথেষ্ট কারণও রয়েছে। ভয় হচ্ছে যদি এই বিলটি গৃহীত হয় তাহলে আমাদের রাজনৈতিক কার্যকলাপ পঙ্গু হয়ে যাবে আর সাধারণ জীবনযাত্রা গতিহীন হয়ে পড়বে।"[১১২] তিনি একথা জোর দিয়ে বলেন যে এরকম বিল আনবার স্বপক্ষে কোনো রকম যুক্তি দেখানো হয়নি। তিনি বলেন যে এর ফলে প্রচণ্ড আন্দোলন সৃষ্টি হবে, যেমন হয়েছিল লর্ড কার্জন এর অবিবেচনা-প্রসূত ভুল নীতি প্রয়োগের সময়। তিনি তাই এই বিলটির একটি সংশোধনী প্রস্তাব পেশ করলেন, বললেন যে স্থানীয় সরকারের কাছে, হাইকোর্টে এবং জনসাধারণের প্রতিষ্ঠানের কাছে এই বিলটি সম্পর্কে মতামত নেওয়া হক। দ্বিতীয় বিলটি সম্পর্কেও তিনি বললেন, জনসাধারণের মন থেকে উদ্বেগ এবং আতঙ্ক দূর করতে হলে এর পরিবর্তন প্রয়োজন। কিন্তু তবু সরকার সমালোচনা এবং প্রতিবাদ সত্ত্বেও বিল অনুযায়ী সব করতে লাগলেন। সুরেন্দ্রনাথের ভবিষ্যদ্বাণী পুরো মিলে গেল এর পরের ঘটনাবলীতে।

নরমপন্থী দলের প্রতিনিধি হয়ে সংস্কারগুলির কতখানি গ্রহণযোগ্য, আর কোথায় কোথায় সেগুলির সম্প্রসারণ প্রয়োজন তা দলের হয়ে জানবার জন্য সুরেন্দ্রনাথ ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডে যান। এই দলে ছিলেন শ্রীনিবাস শাস্ত্রী, সি. ওয়াই. চিন্তামণি এবং আরো কয়েকজন। পরে এই দলে যোগ

১১২। প্রসিডিংস অব দি ইণ্ডিয়ান লেজিস্‌লেটিভ কাউন্সিল, ১৯১৮-১৯১৯ দ্রষ্টব্য।

দেন তেজ বাহাদুর সাপরু। লর্ড সেলবোর্ন-এর সভাপতিত্বে যুক্ত পার্লামেন্টারি কমিটীর সামনে প্রতিনিধিদল তাঁদের বক্তব্য পেশ করেন। ইংল্যাণ্ডে এসে সুরেন্দ্রনাথ দেখলেন টিলকের চরম মতামত এখন নরম হয়েছে এবং এমনকি মিসেস বেসাণ্ট পর্যন্ত সংস্কারগুলিকে গ্রহণযোগ্য মনে করছেন। তাঁর মতামতের সঙ্গে এখন নরমপন্থীদের মোটামুটি এক মত। সুরেন্দ্রনাথ যে কমিটীতে মণ্টেগু একজন সভ্য ছিলেন সেই কমিটীর সামনে তাঁর বক্তব্য জানালেন। বহু সাক্ষীকে পরীক্ষা করা হয়, এমনকি কংগ্রেসের টিলক, তেজ বাহাদুর সাপরু এবং বিঠলভাই জে. প্যাটেলেরও সাক্ষী নেওয়া হয়েছিল। একটা ব্যাপারে ভারতীয় সাক্ষীরা খুবই জোর দিয়েছিলেন, সেটা হল কেন্দ্রকে দায়িত্ব দেওয়া। যে সমস্ত বিভাগকে হস্তান্তর করার কথা সেগুলোর জন্য আলাদা তহবিলের প্রস্তাব কমিটীর কাছে গ্রহণযোগ্য হয়নি। এরকম একটা নিয়ম চালু হলে, তহবিলের অপ্রতুলতার ফলে হস্তান্তরিত বিভাগগুলির অসুবিধেগুলি দূর হত—কিন্তু নতুন আইনে যে সমস্ত মন্ত্রী হলেন, সুরেন্দ্রনাথও তাঁদের মধ্যে একজন, পরে তাঁরা সেই অসুবিধেগুলোর সম্মুখীন হলেন। রাজস্বের বেশির ভাগই সংরক্ষিত বিভাগগুলির জন্য বরাদ্দ করা হয়েছিল।

মণ্টফোর্ড রিপোর্টে প্রস্তাব করা হয় যে প্রস্তাব কার্যকর করবার পাঁচ বছর পর একটি পার্লামেণ্টারি কমিশন ভারতবর্ষে আসবেন কি রকম কাজকর্ম হচ্ছে দেখবার জন্য; এই ব্যাপার নিয়েও আলোচনা হয়। এই সময়টা পার্লামেণ্টে আইন করে বাড়িয়ে দশ বছর করা হয়। জয়েণ্ট কমিটীর সামনে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে বহু সভ্য আগেকার প্রস্তাব মত পাঁচ বছর সময় করতে চাইলেন, কিন্তু কমিটী তা নাকচ করে দেন। সুরেন্দ্রনাথ বললেন যে এই সিদ্ধান্তটি খুব বুদ্ধিমানের মত হয়নি, কেননা দশ বছর অনেক সময়—এত সময় ভারতবর্ষের লোকেদের আত্মাকে শান্ত করা সম্ভব হবে না। তাঁর মতে পাঁচ বছর পর দ্বৈত শাসনের সমাপ্তির সম্ভাবনা থাকলে জনমত শান্ত থাকবে। দ্বৈত শাসনের ব্যাপারটা একটা ঝুঁকিপূর্ণ পরীক্ষার সমান—এমনকি সুরেন্দ্রনাথ ইংল্যাণ্ড গিয়ে

দেখেছিলেন সমগ্র বৃটেনের জনসাধারণ এ ব্যাপারে একমত ছিলেন না। কিন্তু তিনি অনুভব করেছিলেন যে দায়িত্বশীল সরকার যখন এর চরম লক্ষ্য এবং বৃটিশ সরকার তা কেবল ধীরে ধীরেই দিতে প্রস্তুত, এছাড়া অন্য উপায় কিছু ছিলনা।

যখন ভারতীয় নেতারা জয়েণ্ট কমিটীর সামনে একটি শান্ত পরিবেশে টেমস্ নদীর দৃশ্য চোখে পড়ে এমন একটা ঘরে সাক্ষ্য দিচ্ছিলেন, ভারতবর্ষ তখন জালিয়ানওয়ালা বাগের হত্যাকাণ্ডের পর প্রচণ্ড অশান্ততার মধ্যে তোলপাড় হচ্ছিল। সমগ্র ভারতবর্ষ তখন তীব্র বেদনায়, চাঞ্চল্যে এবং ঘৃণায় জর্জর। কংগ্রেস এবং নরমপন্থী এই দুই নেতৃবৃন্দই যাঁরা সাম্রাজ্যের রাজধানীতে আলোচনারত, স্বাভাবিক ভাবেই পাঞ্জাব এবং দেশের অন্যান্য স্থানে তার প্রতিক্রিয়ার ফলে এ ব্যাপারে গুরুতর ভাবে অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন। একটি জনসভা করা হয় আর নরম-পন্থীরা মিঃ মণ্টেগুর সঙ্গে একাধিকবার আলোচনা করেন। সুরেন্দ্রনাথ দাবি করেন যে এই ভয়াবহ অন্যায়ের খোলাখুলি তদন্তের জন্য জোর করেন নরমপন্থীরাই। সুরেন্দ্রনাথ বলেছেন যে এ ব্যাপারে, "চরম এবং নরম পন্থীদের মধ্যে সম্ভবত কিছু খুঁটিনাটি ব্যাপার ছাড়া আর কোনো পার্থক্যই ছিলনা।"[১১৩] কেউ কেউ বলে থাকেন যে জালিয়ানওয়ালা বাগের শোচনীয় ব্যাপারে যতখানি জোরালোভাবে প্রতিবাদ করার প্রয়োজন ছিল ততখানি প্রতিবাদ সুরেন্দ্রনাথ করেননি। কিন্তু তাঁর আত্মজীবনীতে "পাঞ্জাবের ও ডায়ার-এর ধ্বংস নীতির" বিরুদ্ধে চরম বিরোধিতার প্রমাণ পাওয়া যায়। জালিয়ানওয়ালা বাগের ভয়াবহ ঘটনায় "ভারতবর্ষে যে প্রবল আগুন জ্বলে উঠেছিল তা প্রশমিত হতে বহু বছর কেটে যাবে।" তিনি বলেছেন যে এই ঘটনাগুলির ফলে "সংস্কারগুলির চরিত্র লোকের কাছে জঘন্য ভাবে প্রতিভাত হল।" তিনি আরও বললেন, "পাঞ্জাব সরকারের কার্যকলাপের ফলে যে ঘৃণার ভাব হল তা সমগ্র ভারতে সমান

১১৩। এ নেশন ইন মেকিং

ভাবে ছড়িয়ে পড়ল, এবং ইংল্যাণ্ডে প্রবাসী ভারতীয়দের মধ্যেও তা ফুটে উঠল। এটা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে সেক্রেটারি অব ষ্টেটের এই ব্যাপারের ঘোষণায় তাঁর নিন্দা তেমন সম্পূর্ণ হয়নি, বিরক্তিও ঠিকমত প্রকাশ পায়নি। হাউস অব লর্ডসের আলোচনার ফলে ব্যাপার আরো চরমে দাঁড়ালো……যাঁরা জন শাসন করেন তাঁরা রাষ্ট্রের বড় বড় ব্যাপারে ভুল করলে কি হতে পারে এ থেকে তার শিক্ষা নেওয়া উচিত।"[১১৪]

ইংল্যাণ্ডে থাকবার সময় সুরেন্দ্রনাথ আরো দুটি ব্যাপারের সংশ্রবে আসেন। প্রথম ক্ষেত্রে, সেক্রেটারি অব ষ্টেট তাঁকে ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের লোক দ্বারা গঠিত কমিটির একজন সভ্য করে নেন। ঐ সভ্যেরা তখন ইংল্যাণ্ডে ছুটিতে ছিলেন। তাঁরা তখন ঐ দেশে স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন প্রতিষ্ঠানগুলিকে পরীক্ষা করে দেখছিলেন ভারতবর্ষের ব্যাপারে সেরকম কিছু করা যায় কিনা। কমিটিতে তিনিই ছিলেন একজন বে-সরকারী সভ্য। এই বাবদ তাঁকে প্রচুর ঘুরতে হয়েছিল। এতে তাঁর যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল তাতে পরে তিনি স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনের মন্ত্রী হলে তখন বেশ কাজে এসেছিল। তাঁর প্রস্তাবগুলির অন্যতম ছিল প্রতিটি প্রদেশে একটি করে স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন পরিষদ গঠন করা, কিন্তু ভারতবর্ষের সমস্ত প্রাদেশিক সরকারই তার বিরোধিতা করেন। দ্বিতীয়ত মিঃ মণ্টেগুর কাছে তিনি একটি আর্জি নিয়ে যান তা হল বৃটিশ কলোনীতে যেসব ভারতীয় বাস করেছিলেন তাঁদের স্থান কোথায় তা নিরূপণ করা। সেই সময় এই ব্যাপারটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। মিঃ মণ্টেগু বেশ সহৃদয়তার সঙ্গে তাঁর বক্তব্যের উত্তর দেন। অবশেষে, ইংল্যাণ্ডে প্রবাসী মুসলমানদের একটি সভায় খিলাফত প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করেন।

---

১১৪। এ নেশন ইন মেকিং

## বিংশ অধ্যায়

## স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন মন্ত্রীরূপে

সুরেন্দ্রনাথ ভারতবর্ষে ফিরে আসবার কিছুদিন পরই অমৃতসর কংগ্রেস সংস্কারগুলি সম্পর্কে গান্ধী-দাশ আপোস হয়, প্রধান প্রস্তাবের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয় যে পূর্ণ দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্যন্ত জনসাধারণ শর্তসাপেক্ষ এটিকে সমর্থন করবে। রাজনীতি কি অদ্ভুত এবং হতবুদ্ধিকর পথে চলে তার প্রমাণ অমৃতসরে "চিত্তরঞ্জন দাশ যখন বাধা দেওয়া এবং প্রত্যাখ্যান করার দিকে ঝুঁকেছিলেন, এমনকি একে অসহযোগও বলা যায়, তখন গান্ধী সহযোগিতার প্রচার গুরু ছিলেন। হ্যাঁ, তিনি তাই ছিলেন।"[১১৫]

কিন্তু তখন সব কিছুই বদলে যাচ্ছিল তাড়াতাড়ি। পাঞ্জাব গোলযোগের বে-সরকারী তদন্ত কমিটী এক বাক্যে পাঞ্জাবের জঘন্য অত্যাচারের বিরুদ্ধে রায় দেন। কিন্তু সরকার তাঁদের বক্তব্যকে এবং হাণ্টার কমিটীর সংখ্যা লঘু রিপোর্ট ( যে কমিটি পাঞ্জাবের এবং অন্য কয়েকটি প্রদেশের গোলযোগের ব্যাপারে তদন্তের জন্য নিযুক্ত হয় ), সরকার অগ্রাহ্য করেন এবং ডায়ারকে নির্দোষ বলে ঘোষণা করেন। এমনকি কোনো কোনো বৃটিশ মহলে জেনারেল ডায়ার এর সপক্ষে আন্দোলনও হয়। এইসব ব্যাপারে গান্ধীর মত এবং পথ সম্পূর্ণ বদলে যায়। তিনি বৃটিশ শাসকদের সম্পর্কে সম্পূর্ণ মোহমুক্ত হয়ে পড়েন, এবং নতুন ধরনের অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ করার সিদ্ধান্ত করেন।

১৯২০ খৃষ্টাব্দে কলকাতার বিশেষ কংগ্রেস অধিবেশনে গান্ধীর অসহযোগ কর্মসূচী সাময়িকভাবে গৃহীত হল। এখন চিত্তরঞ্জন দাশ নতুন

১১৫। হিস্টরি অব কংগ্রেস, সীতারামাইয়া কৃত।

আইনসভা বর্জনের বিরোধী ছিলেন না, তিনি ভেতর থেকে বাধা দেবার সপক্ষে ছিলেন। কিন্তু গান্ধীজীর ইচ্ছেরই শেষ পর্যন্ত জয় হল। ঐ বছরের শেষে সাধারণ কংগ্রেস অধিবেশনে ঐ সিদ্ধান্তকে মেনে নেওয়া হয়। কিন্তু নতুন আইন সভায় নির্বাচন হবার পর আর নতুন করে আইনসভা বর্জন করার প্রশ্ন উঠলনা। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে গান্ধীজী সাম্রাজ্যের প্রতি তাঁর আনুগত্য প্রকাশ করেছিলেন। এমনকি ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে তিনি রাউলাট আইন এবং তার ফলে যে সমস্ত ব্যাপার ঘটেছিল তাতেও বৃটিশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন নি। কিন্তু ১৯২০ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি, পাঞ্জাবের জঘন্য ব্যাপারের পর বৃটিশদের প্রতি তাঁর বিশ্বাস সম্পূর্ণভাবে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যায়, আর তখনি তাঁর বৈপ্লবিক জন আন্দোলন সুরু করবার এবং তারই সঙ্গে হিন্দু মুসলমান ঐক্যের চেষ্টা করবার সুবর্ণ সুযোগ ঘটে।

অসহযোগের এই রকম আবহাওয়ায় সংস্কারগুলি চালু করা হয়। সময়টা চালু করার পক্ষে তাই তেমন সুবিধের হয়নি। উদারনৈতিকদের ক্ষমতা তখন কমে গিয়েছে। সি. ওয়াই. চিন্তামণির কথা অনুসারে জানা যায় যে ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে উদারনৈতিকরা কংগ্রেস থেকে যে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে তা প্রথমে কিন্তু বরাবরের জন্য করা হয়নি।[১১৬] কিন্তু পরের ঘটনাবলী, কংগ্রেসের অসহযোগ আন্দোলন সুরু করা এই বিভেদকে সম্পূর্ণ করেছিল।

অসহযোগ আন্দোলনে তখন দারুণ গতি সঞ্চার হচ্ছে। আইনসভা, আদালত এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বর্জন, এই তিন বর্জন সুরু হল। আইন সভাগুলিকে নোংরা এবং অপবিত্র বলে মনে করা হতে লাগল। জনগণের উৎসাহ আগুণের মত জ্বলে উঠল। বিরাট জন উত্থানের চিহ্ন দেখা যেতে লাগল। যে সমস্ত লোক "অপবিত্র" আইনসভায় যোগ দিতে ইচ্ছে করেছিলেন, কিংবা আরো খারাপ—যাঁরা নতুন আইনে আইন সভায় যোগ দিয়েছিলেন তাঁদের কার্যকলাপকে প্রচণ্ড আপত্তি এবং অপছন্দ করা

১১৬। ইণ্ডিয়ান পলিটিক্স সিন্স মিউটিনি।

হতে লাগল। উদার পন্থীদের প্রচণ্ড সমালোচনা করা হতে লাগল—এমনকি গালাগালও দেওয়া হতে লাগল। তখন পর্যন্ত যাঁরা দেশের সম্মানিত এবং প্রবীণ কূটনীতিজ্ঞ এবং দেশের হয়ে যাঁরা কথা বলতেন, আঙ্গুল দিয়ে সংস্কারের দিকে দেখিয়ে দিলেন। তখন যদিও এর ফলাফল বোঝা যায়নি, তবে এরই ফলস্বরূপ পরে পূর্ণ দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছিল। সুরেন্দ্রনাথ সংবাদপত্রের মাধ্যমে এই ব্যাপারটা দেশের লোককে বিশেষ করে বোঝাতে চেষ্টা করেছিলেন, মঞ্চ এবং লেজিস্লেটিভ কাউন্সিল থেকেও তিনি একথা বলছিলেন। কিন্তু দেশ তখন আরো শক্তিশালী বাণী শুনেছে—সে বাণী দেশের অন্তঃস্থলে প্রবেশ করেছে—সে বাণী হল মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর। অসহযোগের ঢেউ সুরেন্দ্রনাথের চারদিক থেকে এসে ধাক্কা দিচ্ছে, কিন্তু তখনো সুরেন্দ্রনাথ আলাদা হয়ে রইলেন, স্রোতের সঙ্গে সাঁতার কাটতে চাইলেন না, নিজের বিশ্বাসে দৃঢ় রইলেন, তাঁর নতুন কংগ্রেসী নেতৃত্ব থেকে যত পার্থক্যই থাকুক তাতে তাঁর আপত্তি ছিলনা।

ভারত সরকারের ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের আইন অনুযায়ী নির্বাচনে ব্যারাকপুর সাব ডিবিশনের মিউনিসিপ্যালিটিগুলির কেন্দ্র থেকে তিনি বেঙ্গল লেজিস্লেটিভ কাউন্সিলে বিনা বিরোধিতায় নির্বাচিত হন। কংগ্রেসের অসহযোগের জন্য নতুন আইন সভায় উদারনৈতিকরা প্রথম তিন বছর নির্বিবাদে অধিষ্ঠিত রইলেন। আইনসভা বর্জন আন্দোলনটি তেমন সাফল্য লাভ করেনি। প্রচুর সাহসী এবং যোগ্য ব্যক্তি গান্ধীজীর ইচ্ছেকে সম্মান দেবার জন্য সরে দাঁড়ালেন, কিন্তু আরো অনেকে ছিলেন যাঁদের বেশ কয়েকজন ছিলেন উদারনৈতিকদের চাঁই, বিভিন্ন প্রদেশের আইন সভায় ঢুকে পড়লেন। এটা দেখা গেল যে কংগ্রেসের আইনসভা বর্জনের ফলে আইন সভার মধ্যে অনেক সুযোগ সন্ধানী ঢুকে পড়েছিল। গভর্নর লর্ড রনাল্ডসে এখন সুরেন্দ্রনাথকে মন্ত্রী হবার জন্য প্রস্তাব করেন—এই আইনে যে তিন জন মন্ত্রী নেবার কথা সেই তিনজনের একজন হিসেবে। এই প্রস্তাব অপ্রত্যাশিত ছিলনা। সুরেন্দ্রনাথকে তাঁর খুশিমত মন্ত্রীত্বের বিভাগ গ্রহণ করতে বলা হল। সুরেন্দ্রনাথ এই প্রস্তাব গ্রহণ

করলেন এবং তিনি শিক্ষা এবং স্বায়ত্ত শাসন এই দুটি বিষয় বেছে নিলেন। তবে এই দুটি বিষয় এক সঙ্গে গ্রহণ করাতে অফিসের কাজের অসুবিধে হলে তাঁকে স্বায়ত্ত শাসনের সঙ্গে মেডিক্যাল ডিপার্টমেণ্টও জুড়ে দেওয়া হল। তাঁর সহকর্মীরা ছিলেন পি. সি. মিত্র এবং নবাব আলি চৌধুরী। আসলে তিনিই গভর্নরের অনুরোধে মিত্রের নাম প্রস্তাব করেছিলেন। চৌধুরী অসহযোগ আন্দোলন বিরোধী একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেছিলেন তাই তাঁকে মন্ত্রীসভায় গ্রহণ করা হয়েছিল। সুরেন্দ্রনাথ বলেছেন যে চৌধুরী এবং অন্যান্য মন্ত্রীদের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক ভালই ছিল, কিন্তু সাম্প্রদায়িক ব্যাপারগুলি নিয়ে খুব জোর মত পার্থক্য হল। মনে হত যেন চৌধুরী এবং সুরেন্দ্রনাথ দুজনের সঙ্গে আকাশ পাতাল তফাৎ। মিত্র এবং চৌধুরী এঁরা দুজনেই ছিলেন সহনশীল এবং ধর্মনিরপেক্ষ, এঁরা শেষ পর্যন্ত সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্ব বিলোপ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু চৌধুরী ছিলেন আপোস বিরোধী। সুরেন্দ্রনাথ যেখানে ছিলেন যুক্ত বঙ্গের পৃষ্ঠপোষক, চৌধুরী সেখানে ছিলেন প্রদেশ বিভাগের উগ্র সমর্থক। সাম্প্রদায়িক বিষ শাসন বিভাগে একবার প্রয়োগ করার পরই তা গভীরে প্রবেশ করেছিল।

১৯২১ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে, সুরেন্দ্রনাথ মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করবার প্রাক্কালে তাঁকে নাইট সম্মানে ভূষিত করা হয়। সুরেন্দ্রনাথ নাইট সম্মান এবং মন্ত্রীত্ব এই দুটোই গ্রহণ করেন। অনেকে দুঃখ করেছিলেন এই বলে যে সুরেন্দ্রনাথ আর নেতা নন্—কোটের উপর একটা সম্মান সূচক ফিতে পরার লোভে তিনি নেতৃত্ব হারালেন।

৩৬ বছর ধরে সুরেন্দ্রনাথ যে ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি ছিলেন, ১৯২১ খৃষ্টাব্দে তিনি তার সভাপতি হলেন। তিনি অ্যাসোসিয়েশনের সৃষ্টিকর্তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত তিনি ঐ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এখন থেকে ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন লিবারেল ফেডারেশন-এর একটি একক সংস্থা হিসেবে পরিগণিত হল।

লিবারেল ফেডারেশন তার পুরনো ধারায় চলতে লাগল—এর আবেদন কয়েকজন লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ রইল, কিন্তু গান্ধীজী জনতার কাছে এসে তাঁর বক্তব্য জানালেন। উদারপন্থীরা ( লিবারেল ) অসহযোগ বিরোধী ছিলেন—তাঁরা একেবারে অক্ষরে অক্ষরে আইন সঙ্গত উপায়ে চলবার পক্ষপাতি ছিলেন। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজের জাতীয় উদারপন্থী ফেডারেশনের অভ্যর্থনা সমিতি বলেছিলেন, "অসহযোগ আন্দোলনের বিপদ এখনো প্রচণ্ড রয়েছে" এবং তাঁরা ক্ষমতাশালী এবং বড় বড় লোকের কাছে পুরনো আমলের হিউম, দাদাভাই, ওয়েডারবার্ন, গোখলে এবং মেহ্ তাদের আমলের ঐতিহ্য অনুযায়ী চলতে আবেদন জানালেন। এ যেন ছিল অগ্রগতিকে পিছিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা। অসহযোগের ঢেউ তখন এসে আঘাত করছে, এমনকি শেষ পর্যন্ত চিত্তরঞ্জন দাশও গান্ধীজীর পথে চলতে সুরু করলেন। এরই সঙ্গে চলতে লাগল অ-সহযোগীদের উপর পীড়ন। সরকার তখন তার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে এই আন্দোলন দমন করছিল। কারাগারে সহস্র সহস্র লোককে তখন নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। নেতাদেরও রেহাই দেওয়া হচ্ছিলনা। এই পীড়ন কংগ্রেসের মনোবলকে কমানোর বদলে বাড়িয়েই দিচ্ছিল। এই পরিবেশে মন্ত্রীরা মণ্টেগু আইন অনুসারে কাজ সুরু করলেন।

১৯২১ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসের ৪ তারিখে নতুন মন্ত্রী সভা সৃষ্টি হয়। একজিকিউটিভ কাউন্সিলর এবং মন্ত্রীরা সিংহাসন কক্ষে শোভাযাত্রা সহকারে যান এবং শপথ বাক্য পাঠ করেন, একটি টেবিলের চারিধারে মন্ত্রণা সভায় বসেন—গভর্নর তার সভাপতি হন। গম্ভীর ছোট্ট এই অনুষ্ঠানের পর সকলে যে যাঁর অফিসে চলে যান। এইভাবে সুরেন্দ্রনাথের তিন বছরের মন্ত্রী জীবন সুরু হয়।

মন্ত্রীরা এরকম কাজ আগে করেননি—আর সেক্রেটারিয়েটের আবহাওয়ার সঙ্গেও তাঁদের পরিচয় ছিলনা। স্মৃতিকাহিনীতে সুরেন্দ্রনাথ তাঁর এই সময়কার একটা পরিপূর্ণ চিত্র রেখে গিয়েছেন। তিনি স্বীকার করেছেন যে তাঁর ইউরোপীয়ান সেক্রেটারিরা এবং অন্যান্য আমলা, তাঁর

কাছে বলতে গেলে সবাই, সাহায্য এবং সহযোগিতা করেছেন। এর মানে এই নয় যে তাঁর সঙ্গে আমলাদের কখনো মত পার্থক্য হয়নি। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ বলেছেন সেগুলো ছিল অল্প সময়ের জন্য। আমলারা ছিলেন তাঁদের কাজের অভিজ্ঞতায় পাকা, সুরেন্দ্রনাথের এ ব্যাপারে কোনো অভিজ্ঞতাই ছিলনা, তাঁর ছিল জনসাধারণের সেবা করার অভিজ্ঞতা। কিন্তু তাঁর কোমল মনোভাব এবং সদিচ্ছার ফলে তিনি তাঁর চারিদিকে বিশ্বাস এবং সহযোগিতার আবহাওয়া সৃষ্টি করেছিলেন। তিনি বিশেষ করে তাঁর সেক্রেটারি ও'মালি নামের একজন আইরিশ ভদ্রলোকের কথা উল্লেখ করেছেন। এঁর ছিল কেল্‌টিক জাতির বৈশিষ্ট্য, উন্মুক্ত হৃদয়। এছাড়া ছিলেন স্বাস্থ্য বিভাগের কর্তা ডক্টর বেণ্টলি। সুরেন্দ্রনাথ স্বাস্থ্য বিভাগের প্রধান এঞ্জিনিয়ার উইলিয়াস্‌ সম্পর্কেও বেশ প্রশংসা করেছেন।

সেক্রেটারিয়েটের ভেতরের আবহাওয়া যদিও ছিল সহযোগিতাপূর্ণ, বাইরের তা ছিল শত্রুতাপূর্ণ। খবরের কাগজগুলো ভর্তি থাকত অসহযোগিতার মনোভাবে। সুরেন্দ্রনাথ জনসাধারণের সঙ্গে আন্তরিকভাবে সংযোগ রেখে চলতেন, এবং নেতার যেমনভাবে ব্যবহার করা উচিত তেমন ভাবেই তিনি ব্যবহার করতেন। তিনি ছিলেন ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি এবং ব্যারাকপুর মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান। কিন্তু জনসাধারণের ভাবভঙ্গী তখন সম্পূর্ণ বদলে গেছে। তিনি এবং তাঁর মন্ত্রীদের বলা হত, "বাদামী রঙের সাহেব।" তাঁর সভায় আগের মত আর ভীড় হতনা।

বার্কের বক্তব্য, যে রাজনৈতিক অসন্তোষ দূর করতে হলে মানিয়ে নেওয়াই কর্তব্য, সেই বক্তব্য অনুসারে সুরেন্দ্রনাথ তখন এমন একটা কাজ করলেন যা তখনকার দিনে ছিল নতুন এবং অভাবিত। ১৯২১ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে তিনি একটি প্রেস কনফারেন্স ডেকে খবরের কাগজের মাধ্যমে জনসাধারণকে বললেন যে কিভাবে সরকার নীতি নির্ধারণ করবার জন্য জনমত জানতে চান। কিন্তু স্বদেশী খবরের কাগজগুলো এ ব্যাপারে কোনো উৎসাহই দেখালো না। একই ভাবে কলকাতা মিউনিসিপ্যাল বিল এবং বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল বিলের ব্যাপারে তিনি যাঁদের আগ্রহ তাঁদের প্রতিনিধিদের নিয়ে সভা করলেন এবং তাঁদের সহযোগিতা চাইলেন।

জনমতের পরামর্শ নেবার নীতি গ্রহণ করবার পর তিনি সমস্ত বাংলা দেশ ঘুরে তাঁর কর্তৃত্বাধীন সমস্ত বিভাগগুলি সম্পর্কে মতামত সংগ্রহ করবার চেষ্টা করতে লাগলেন। কোনো কোনো জায়গায় তাঁকে অসহযোগীদের বাধা দেবার কৌশলের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। ঘটনার বিপরীতমুখী প্রবাহে তিনি সেই বরিশালে গেলেন মন্ত্রী হয়ে যেখানে তিনি পনের বছর আগে প্রচণ্ড বঙ্গভঙ্গ বিরোধী হিসাবে গিয়ে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন এবং শাস্তি পেয়েছিলেন। কিন্তু এখন ঘটনার গতি অন্যরকম। যে এমারসনকে বরিশালে সেখানকার ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে সুরেন্দ্রনাথকে গ্রেপ্তার করতে হয়েছিল এখন তাঁকেই ঢাকা বিভাগের কমিশনার হিসাবে বরিশালে গিয়ে স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসন মন্ত্রীকে সাহায্য করতে ছুটতে হল।

সুরেন্দ্রনাথ যেখানেই যান সেখানেই অসহযোগীরা হরতাল ডাকে। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য এসব মোটেই গ্রাহ্য না করে প্রচুর ব্যক্তিগত ত্যাগ ও খরচ করতে লাগলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল জনসাধারণের স্বাস্থ্য ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকার ব্যাপারে তাঁদের সহযোগিতা পাওয়া। সরকার নীতি গ্রহণ করতে পারে, কর্মপন্থাও নির্ধারণ করতে পারে, কিন্তু সাফল্য শেষ পর্যন্ত নির্ভর করে জনসাধারণের সহযোগিতার উপর। এই প্রথম স্বাস্থ্য বিভাগ থেকে বেশ কিছু টাকা বরাদ্দ করা হল ম্যালেরিয়া বিরোধী সমবায় সমিতি এবং কালাজ্বর সভার জন্য।

স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসন মন্ত্রী হিসাবে সুরেন্দ্রনাথ অনেকগুলি ব্যাপারে কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন। এক সময় তিনি স্থানীয় সমিতিগুলি থেকে সরকারী সমস্ত প্রভাব দূর করতে চেয়েছিলেন। মন্ত্রী হিসাবে তিনি প্রথমেই এই নীতি, যার জন্য সর্বদা তিনি আন্দোলন করে এসেছেন, প্রবর্তন করবার জন্য উঠে পড়ে লাগলেন। ম্যাকেঞ্জি আইনকে তিনি নতুন কলকাতা মিউনিসিপ্যাল আইনের সাহায্যে বানচাল করেছিলেন। ফলে এই সংস্থাটি প্রভূত ভাবে গণতান্ত্রিক হল। যাতে প্রদেশের সর্বত্র স্থানীয় সভাগুলিকে নতুনভাবে গড়া যায় সেজন্য তিনি বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল বিলটি প্রবর্তন করতে সমর্থ হন।

কলকাতা মিউনিসিপ্যাল আইনটি সম্পর্কে বলা হয়েছে, "এটা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভারতবর্ষে স্থানীয় স্বায়ত্ত্ব শাসনের ব্যাপারে বড় কাজের অন্যতম।"[১১৭] নবম অধ্যায়ে এ ব্যাপারে এর আগেই বলা হয়েছে যে লর্ড কার্জনের সরকার ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে অগণতান্ত্রিক আইনটি সুরেন্দ্রনাথের এবং অন্যান্যদের প্রচণ্ড বিরোধিতা সত্ত্বেও পাস করান। উদ্দেশ্য ছিল যে চেয়ারম্যানের কর্তৃত্বকে বড় করা এবং করপোরেশনকে কম ক্ষমতা দেওয়া। সেই সময় সুরেন্দ্রনাথ এটিকে বড়ই অদ্ভুত ব্যাপার বলে মন্তব্য করেছিলেন। তিনি তখন বলেছিলেন: "এই বিলের দায়িত্ব যে সম্মানীয় মন্ত্রী মহোদয়ের উপর রয়েছে তিনি এমন কথাও বলেছেন যে তিনি যে ক্ষমতা মিউনিসিপ্যাল শাসকদের হাতে দিতে প্রস্তুত, সেটুকুও তিনি করপোরেশনকে দিতে চান না। যদি এসব আইন করার ঐ অর্থ হয় তাহলে করপোরেশন আইনের প্রহসনের প্রয়োজন কি? এটিকে সরকারের কোনো বিভাগে পরিণত করলেই তো হয়?"[১১৮] এইবার তাঁর সময় এসেছে কলকাতার লোকদের প্রতি ভয়ানক অন্যায়ের প্রতিবিধান করবার। আইন সভার ১৯২১ সালের নভেম্বর মাসে মিউনিসিপ্যাল বিল সংশোধন সম্পর্কে বললেন: বাইশটি বছর এল এবং গেল……আমি এই ভবিষ্যদ্বাণী করতে সাহসী হয়েছিলাম যে সে দিন বেশী দূরবর্তী নয় যখন আমার জন্ম হয়েছিল যে শহরে, স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন প্রতিষ্ঠার ফলে সেই শহরের প্রভূত উপকার হবে। সেই সময় এখন উপস্থিত। সেই দিন আজ এসেছে। সেই দিন দেখবার জন্য আমি বেঁচে রয়েছি। আমি ভগবানের কাছে নতজানু হয়ে ধন্যবাদ জানাই।"[১১৯]

নতুন বিলটির উদ্দেশ্য ছিল করপোরেশনকে ভোটদাতার সংখ্যা বাড়িয়ে আরো গণতান্ত্রিক করে তোলা। সুরেন্দ্রনাথ পুরনো আইনের

---

১১৭। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ—এইচ. এন. দাশগুপ্ত প্রণীত ( বিল্ডার্স অব মর্ডান ইণ্ডিয়া সীরিজ )
১১৮। প্রসিডিংস অব দি কাউন্সিল অব লেফ্‌টেন্যাণ্ট গবর্নর অব বেঙ্গল, ১৮৯৯
১১৯। এ নেশন ইন মেকিং

গঠনতন্ত্র অংশটি সংশোধন করে নতুন করে তোলেন। মিউনিসিপ্যালটির ব্যাপারগুলির নিয়ন্ত্রণের প্রায় সম্পূর্ণ অধিকার রইল করদাতাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের উপর—যাঁরা আরো বেশী লোকেদের দ্বারা নির্বাচিত হলেন। করপোরেশনের মধ্যে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সংখ্যা রইল পাঁচ ভাগের চার ভাগ, ফলে কলকাতা করপোরেশনের রাজস্ব, যা ছিল তৎকালীন বাংলাদেশের রাজস্বের প্রায় পাঁচ ভাগের একভাগ, এঁরাই নিয়ন্ত্রণ করবার অধিকারী হলেন। ঠিক হল একজন প্রধান কর্মসচিব থাকবেন, যিনি মেয়রের কথা মত কাজ করবেন, আর মেয়র হবেন প্রতিনিধিদের স্পীকার। এই বিলের আর একটা প্রধান বিষয় হল শহরতলীর অংশ যোগ করে কলকাতার সীমানাকে বাড়িয়ে কলকাতা করপোরেশনের অন্তর্ভুক্ত করা। যেহেতু এই প্রশ্নটি ছিল বিতর্কমূলক, সুরেন্দ্রনাথ স্থির করেছিলেন যে এ ব্যাপারে সীমান্ত নির্ধারণ কমিটীর কথা মতো কাজ করাই সঙ্গত হবে এবং তিনি নিজে এমন একটি কমিটী বিশেষ করে এই কারণে গঠনও করেছিলেন। সেই কতদিন আগে সুরেন্দ্রনাথ কলকাতা যে দ্রুত বেড়ে যাবে তা বুঝতে পেরেছিলেন।

বিলটিকে একটি বিশেষভাবে গঠিত কমিটীর কাছে পাঠানোর সময় সুরেন্দ্রনাথ বললেন যে স্বায়ত্ত শাসনের স্থানীয়, প্রাদেশিক এবং সাম্রাজ্য সম্পর্কিত বিষয়গুলি একটি সম্পূর্ণ প্রাণবন্ত ব্যাপার হওয়া আবশ্যক এবং "আমাদের স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলির ক্ষমতা আরো বাড়িয়ে এর ভিত্তিকে জোরদার করতে হবে।"[১২০] এই বিলটি ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে গৃহীত হওয়ায় সুরেন্দ্রনাথের জীবনের বহু স্বপ্নের একটি রূপ পেল।

তখনকার আমলে যা অবস্থা ছিল এগুলি তা থেকে অনেক ভাল হল। কিন্তু বিলের একটি অংশকে সমালোচনার সম্মুখীন হতে হল—সেটা হল এই বিলে সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্বকে মেনে নেওয়া হয়েছিল। এমনকি ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন, হস্তান্তরিত বিভাগগুলির গঠনমূলক বিষয়গুলিকে সমর্থন করলেও, এই ব্যাপারে সমর্থন করতে পারল না। ব্যক্তিগতভাবে

১২০। প্রসিডিংস অব দি বেঙ্গল কাউন্সিল, ১৯২২

সুরেন্দ্রনাথও সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্বের বিরোধী ছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "এটা নীতিগতভাবে দুর্বল।" এবং "ব্যবহারগতভাবে ক্ষতিকারক।" কিন্তু তিনি আপোস করাকে সমর্থন করেছিলেন সাময়িকভাবে, তা নইলে হয়ত কাউন্সিলে তাঁর পরাজিত হবার এবং বিলটি বাতিল হবার সম্ভাবনা ছিল। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় যে তিনি তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন যে স্বরাজ্য দল একই নীতিকে মেনে নিয়েছিলেন এবং পরে চিত্তরঞ্জন দাশ হিন্দু মুসলমান চুক্তিতে একই নীতি গ্রহণ করেছিলেন। ঐ চুক্তিতে অন্যান্য বিষয়গুলির মধ্যে ছিল, যুগ্ম জনসংখ্যা অনুযায়ী কাউন্সিলে প্রতিনিধি পাঠানো হবে এবং মুসলমানদের বিশেষ প্রতিনিধিত্ব দিতে হবে যতদিন না চাকুরী ক্ষেত্রে মুসলমানদের সংখ্যালঘুত্বের অবসান হয়। একবার সাম্প্রদায়িক নীতিকে স্বীকার করবার পর সুরেন্দ্রনাথই হন বা দেশবন্ধু দাশই হন এর জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসা কারুর পক্ষেই সম্ভব হয়নি।

কলকাতার নতুন মিউনিসিপ্যাল আইন, যেটি বিরাট পৌর প্রতিষ্ঠানকে অধিকতর ভোটদাতার সাহায্যে উদারতর এবং গণতান্ত্রিক করে তোলে, তা সুরেন্দ্রনাথের নিজের হাতে গড়া। কিন্তু এর পরে যে প্রথম গণতান্ত্রিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল তাতে চিত্তরঞ্জন দাশের নেতৃত্বে স্বরাজ্য দল করপোরেশনকে অধিকার করল। পঁচাত্তর জনের মধ্যে প্রায় পঞ্চান্ন জনই স্বরাজ্য দল থেকে নির্বাচিত হলেন এবং প্রথম মেয়র নির্বাচিত হলেন চিত্তরঞ্জন দাশ। এই অসাধারণ বিজয়ের ফলে স্বরাজ্য দল এবং এর প্রতিষ্ঠাতা নেতা জনসাধারণের কাছে নতুনভাবে উজ্জ্বল হয়ে উঠলেন এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও নতুনভাবে প্রাধান্য পেলেন। এটা কিন্তু মনে রাখতে হবে যে এই যে ব্যাপারটা হল এটা কিন্তু হল সুরেন্দ্রনাথের স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনের জন্য প্রচণ্ড উৎসাহ এবং তাঁর সমস্ত জীবনের কাজের ফলে।

সুরেন্দ্রনাথ তাঁর আত্মজীবনীতে অবশ্য অনুযোগ করেন যে স্বরাজ্য দল ক্ষমতায় আসবার পর তারা এটিকে দলগত স্বার্থে ব্যবহার করে। তাঁর মতে এটা অন্যায়। সুরেন্দ্রনাথ পৌর ব্যাপারের সঙ্গে রাজনীতি মেশানোর

বিরোধী ছিলেন। এছাড়া তিনি চিত্তরঞ্জন দাশের মেয়র নির্বাচিত হওয়া উচিত মনে করেননি, কেননা পৌর শাসনের ব্যাপারে চিত্তরঞ্জন দাশের কোনো অভিজ্ঞতা ছিলনা। তাঁর মতে, মেয়রের মত বড় পদে যাবার যোগ্যতা তাঁরই যিনি পৌর ব্যাপারে কাজ করে অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন।

সুরেন্দ্রনাথ তাঁর বিরাট কর্মজীবনে যে নীতি অত্যন্ত উন্মাদনার সঙ্গে কাজে রূপান্তরিত করতে চেয়েছিলেন সেটি হল সরকারী কাজগুলির ভারতীয়করণ। তাঁর প্রথম জীবনে যে তিনি জাতি বিদ্বেষের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন সেটি ছিল ব্যক্তিগত ব্যাপার। সুরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন যে স্বায়ত্ত শাসনের ক্ষেত্রে আরো ফলপ্রসূভাবে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব যদি শাসন ক্ষেত্রে আরো বেশি ভারতীয় নিয়োগ করা যায়। এখন তিনি নিজেই যখন মন্ত্রী হয়েছেন, এ ব্যাপারে তাঁর কিছু করার সুযোগ হয়েছে। কিন্তু এগুতে হবে সাবধানে, কেননা এ ব্যাপারে অনেক বাধা, আর এ ব্যাপারের সঙ্গে যাদের স্বার্থ জড়িত তাদের কাছ থেকে বাধা পাবার বিশেষ সম্ভাবনা। অবশ্য ভারতীয়করণের ফলে যাতে কোনোক্রমেই কর্মদক্ষতা না কমে সে বিষয়ে তাঁর লক্ষ্য ছিল। আসলে কর্মদক্ষতাই ছিল তাঁর প্রধান দ্রষ্টব্য। কলকাতা করপোরেশনকে গণতান্ত্রিক করবার আগে চেয়ারম্যানের পদে একজন ইউরোপীয়ান সরকারী কর্মচারী থাকতেন। কিন্তু যখন চেয়ারম্যান পেইন ১৯২১ খৃষ্টাব্দে ছুটিতে গেলেন, সুরেন্দ্রনাথ সাহস করে সিভিল সার্ভিসের একজন ভারতীয় সদস্য, জে. এন. গুপ্তকে সাময়িক ভাবে ঐ পদে নিয়োগ করেন। পরে তিনি, যখন গুপ্ত কোনো কোনো মহল থেকে বিরোধিতার সম্মুখীন হলেন এবং স্বাস্থ্য খারাপ এই অজুহাতে ছুটি নিলেন তখন আরো একটু অগ্রসর হয়ে ঐ পদে একজন বে-সরকারী লোক, এস. এন. মল্লিককে নিযুক্ত করলেন। মল্লিক, করপোরেশন এবং কাউন্সিল এই উভয়েরই নির্বাচিত প্রতিনিধি ছিলেন, আর ছিলেন একজন দক্ষ আইনবিদ। পৌর প্রতিষ্ঠানের এই উচ্চপদে মল্লিকের অসাধারণ সাফল্য জন সাধারণের প্রশংসা অর্জন করে—এমনকি সুরেন্দ্রনাথের বিরোধীরাও তাঁকে প্রশংসা করেন।

সুরেন্দ্রনাথ স্বাস্থ্য বিভাগে ঐ একই নীতি গ্রহণ করতে বদ্ধপরিকর হন এবং এই ব্যাপারে একটা পরিকল্পনা তৈরি করেন যেটি সেক্রেটারি অব ষ্টেট প্রায় সম্পূর্ণই গ্রহণ করেন। তাঁরই চেষ্টায় মেডিক্যাল সার্ভিসের ভারতীয়করণ সম্ভব হয়। তিনি কলকাতার মেডিক্যাল কলেজে কয়েকজন বিশিষ্ট চিকিৎসককে অবৈতনিকভাবে নিয়োগ করেন। স্বাস্থ্য ব্যাপারে প্রদেশের ভয়াবহ দুরবস্থার প্রতিকারকল্পে তিনি বাংলাদেশে চিকিৎসা শিক্ষার জন্য চিকিৎসা শিক্ষা বিদ্যালয় খুলবার নীতি গ্রহণ করেন। তিনি একটি গঠনতান্ত্রিক প্রশ্ন তোলেন এবং সেটিকে তাঁর কাজে লাগান। ভারতীয় মেডিক্যাল সার্ভিসের নিয়োগকারী ছিলেন ভারত সরকার—যদিও তার জন্য টাকা দিতেন বাংলা সরকার। সুরেন্দ্রনাথের বক্তব্য এই ছিল যে যেহেতু তাঁর উপর স্বাস্থ্য বিভাগটির ভার দেওয়া হয়েছে, সেহেতু এই বিভাগের নিয়োগ ব্যাপারে তাঁরই নিয়ন্ত্রণ থাকবে, যদিও অবশ্য ভারত সরকারের উপদেশ দেবার ক্ষমতা থাকবে। এই বিষয়টিতে প্রায় সম্পূর্ণভাবেই তাঁর মত মেনে নেওয়া হয়েছিল।

সম্রাটের মন্ত্রী হওয়াতে সুরেন্দ্রনাথকে কোনো কোনো মহল থেকে প্রচুর বিরুদ্ধ সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। এর অনেকখানিই হয়েছিল অসহযোগ আন্দোলনের ব্যাপারে এবং সংস্কারগুলির বিরুদ্ধে জনসাধারণের বিরোধিতার ফলে। তবে সমালোচনার অন্তত একটি অংশের কোন অর্থ ছিলনা। যখন ১৯২২ খৃষ্টাব্দের অক্টোবরে উত্তরবঙ্গে একটা ভয়াবহ বন্যা এসে প্রচণ্ড ক্ষতি সাধন করেছিল, তখন তিনি জনসাধারণের জন্য দুঃখ বোধ করেননি, এরকম অভিযোগ করা হয়েছিল। সরকারের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে সুরেন্দ্রনাথ তখন ছিলেন দার্জিলিং এ। বন্যার জন্য সাহায্যদান ছিল সংরক্ষিত বিষয়, এর উপর সুরেন্দ্রনাথের কোনো কর্তৃত্ব ছিল না। কিন্তু তবু, ৭৪ বছর বয়সের বৃদ্ধ তিনি, বন্যা কবলিত সেই বিরাট অঞ্চলে প্রচণ্ড রোদে এবং ধ্বংসের মধ্যে কুড়ি মাইল ভ্রমণ করে দার্জিলিং এ ফিরে এসে গুরুতরভাবে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। সমালোচকরা জনসাধারণের দুঃখের প্রতি সুরেন্দ্রনাথের এই স্বতঃস্ফূর্ত সমবেদনার কথা ভুলে গেলেন।

দ্বৈত শাসন কেমন করে চলতো? এটা একটা শক্ত প্রশ্ন, আর এ ব্যাপারে মতানৈক্য হতে বাধ্য। অনেকের এই মত যে দ্বৈত শাসন ব্যর্থ হয়েছিল কেননা এর মধ্যে গঠনতান্ত্রিক বৈষম্য ছিল। শাসনের ক্ষেত্রে দুটি সম্পূর্ণ অসংশ্লিষ্ট বিভাগ হবার ফলে সংহতিপূর্ণ শাসন সম্ভব হতনা, এমনকি এরফলে মনোমালিন্য এবং সংঘর্ষও হত। একজিকিউটিভ কাউন্সিলররা ছিলেন আমলাতন্ত্রের লোক, আর মন্ত্রীরা ছিলেন জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধি, এঁরা উভয়েই একরকম ভাবে চলতে পারতেন না। আসলে মন্ত্রীদের অবস্থা ছিল দুর্বল। গভর্নরের ছিল সর্বময় কর্তৃত্ব। মন্ত্রীদেরও রাজনৈতিক বাস্তবতার জন্য গভর্নর এবং আমলাদের উপর সমর্থনের জন্য নির্ভর করতে হত। সবচেয়ে যেটা খারাপ ছিল তা হল এই যে যেখানে জাতিকে গড়ে তোলার ভার ছিল মন্ত্রীদের উপর সেখানে টাকা পয়সা নিয়ন্ত্রিত হত অর্থ বিভাগের দ্বারা এবং এটিকে নিয়ন্ত্রিত করতেন একজিকিউটিভ কাউন্সিলর। মন্ত্রীদের তৈরি সত্যিকারের ভাল ভাল পরিকল্পনা এভাবে অকর্মণ্য হয়ে যেত।

দ্বৈত শাসনের এই ত্রুটি বিচ্যুতিগুলি আগে যে অনুমান করা যায়নি তা নয়। দ্বৈত শাসনের এই সমালোচনায় এই শাসন ব্যবস্থা গ্রহণের আগেই এর দুঃখজনক দিকের স্পষ্ট সম্ভাবনার ইঙ্গিত করা হয়েছিল। মন্ত্রীরা কোনো কোনো দিকে প্রয়োজনীয় কাজ করেছিলেন, যদিও দুঃখজনক ভাবে তা ছিল সীমাবদ্ধ।

সুরেন্দ্রনাথ দ্বৈত শাসনের বিরাট সাফল্য হয়েছে এমন দাবি করেননি। তিনি এর নানা ত্রুটি এবং সীমাবদ্ধতার কথা ভাল করেই জানতেন। লিবারেল ফেডারেশনের পক্ষ থেকে তিনি যুক্ত পার্লামেণ্টারি কমিটীকে বলেছিলেন যে এটা "আদর্শ" ব্যবস্থা নয় তবে পরিস্থিতি যা সে হিসেবে এই ব্যবস্থা "সম্ভবপর" আর "এটার সুরুতেই একটা দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা আছে এবং পরে আস্তে আস্তে এটা দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠা করতে পারবে বলে ভরসা হয়।"[১২১] সুরেন্দ্রনাথ দ্বৈত শাসনকে এভাবেই

১২১। এ নেশন ইন মেকিং

দেখেছেন। তিনি অবশ্য বিশ্বাস করতেন না যে দ্বৈত শাসন ব্যর্থ হয়েছে অন্তত বাংলাদেশে তো নয়ই। এটা সত্যি কথা যে অন্য জায়গায় মন্ত্রীরা একেবারে হতাশায় ভেঙ্গে পড়েছিলেন। কিন্তু স্মৃতি কথায় তাঁর বক্তব্য পড়ে মনে হয় তাঁর অভিজ্ঞতা ছিল অন্যরকম। ব্যাপারটির মধ্যে কতকগুলি অসুবিধে স্বাভাবিক ভাবেই বিরাজ করছিল। বাইরে তখন অসহযোগের প্রচণ্ড ঢেউ ধাক্কা দিচ্ছে, মন্ত্রীদের প্রতি ঘৃণা এবং গালাগালি বর্ষিত হচ্ছে, এমন কথা তাঁদের বিরুদ্ধে বলা হচ্ছে যার জন্য তাঁরা বিন্দুমাত্র দায়ী নন্। সরকারেও বিরাট বাধার সম্মুখীন তাঁরা ; অর্থের ঘাটতি। সংস্কারের নিয়ম অনুযায়ী প্রাদেশিক সরকারগুলিকে বেশ কয়েকটি প্রতিবন্ধকতার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়, আর মেস্টন অ্যাওয়ার্ডের দরুণ পরিস্থিতির কোনই উন্নতি হয়নি।

মণ্টেগু-চেমসফোর্ডের সংস্কারগুলি কেন্দ্র এবং প্রদেশের মধ্যে বিষয়গুলিকে ভাগ করে দেয়, যার ফলে কেন্দ্রের প্রচণ্ড অর্থের ঘাটতি হয়। এই কারণে লর্ড মেস্টনের তত্ত্বাবধানে একটা কমিটী গঠন করা হয় যার লক্ষ্য হয় কেন্দ্র এবং প্রদেশগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক সম্পর্ক নিরূপণ করা। মেস্টন অ্যাওয়ার্ডে প্রদেশগুলিকে কেন্দ্রকে বাধ্যতামূলকভাবে কতকগুলি নিয়মানুযায়ী অর্থ দেবার প্রস্তাব করা হয়। ফলে, যেসব বিভাগ দেশকে গড়ে তোলে এমন হস্তান্তরিত বিভাগের অধিকাংশই দায়িত্বশীল মন্ত্রীদের হাতে দেওয়া হয় এবং এগুলিরই অর্থাভাব দেখা দেয়। সরকারী এবং বেসরকারী এই দুই ক্ষেত্র থেকেই মেস্টন অ্যাওয়ার্ডের প্রচুর বিরোধিতা করা হয়। সুরেন্দ্রনাথ অভিযোগ করলেন যে মেস্টন অ্যাওয়ার্ড এর ফলে বাংলাদেশের ওপর অর্থনৈতিক দিক থেকে অবিচার করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসন এবং জনস্বাস্থ্যের ব্যাপারে তিনি নানা উল্লেখযোগ্য উন্নতি করেন এগুলি হয়ত জনসাধারণের আশানুরূপ হয়নি, কিন্তু তা সত্ত্বেও আরম্ভের পক্ষে ভাল হয়েছিল। একটা ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল যার উপর ভবিষ্যতের শাসন তৈরি করা যায়। সুরেন্দ্রনাথ বলেন যে আরো বেশি সাহায্য পেলে আরো অনেক কিছু করা যেত দেশকে গড়ে তোলার বিভাগ গুলিতে—যেগুলির ভার ছিল তাঁর এবং তাঁর সহকর্মীদের

উপর। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় কতকগুলি জল সরবরাহ পরিকল্পনা টাকার অভাবে রূপায়িত করা যায়নি। তিনি এটা মানতেন না যে সরষের মধ্যেই ভূত রয়েছে। এমনকি তিনি এটাও দেখেছেন যে গভর্নরেরা এ ব্যাপারে সাহায্য এবং সহযোগিতা করতে প্রস্তুত এবং সমগ্রভাবে বিচার করলে সরকার ছিল দিব্যি একটা সুখী পরিবার। মন্ত্রীরা সংরক্ষিত ব্যাপারগুলি সম্পর্কেও মতামত দিতেন যদিও সরকার তা মানতে বাধ্য ছিলেন না।

দ্বৈত শাসনের ফলে উদারনৈতিকেরা যে সব কাজ করতে সক্ষম হয়েছিলেন, সে সম্পর্কে জ্যাকেরিয়াস বলেন: "কৃতজ্ঞভাবে একথা স্বীকার করতেই হবে যে তাঁরা এই সমস্ত আইন সভাগুলিতে জাতীয় লক্ষ্যগুলিকে ভুলে না গিয়ে একটা বিরাট বড় কাজ করেছিলেন। তাঁরা, যে সমস্ত অভাব অভিযোগ ছিল সেগুলি সম্পর্কে বিরাট প্রচার করেছিলেন এবং তাঁদের সহযোগিতার ফলে বহু সরকারী প্রস্তাবের উন্নতি করা গিয়েছিল। তাঁরা নিজেরাও বহু উন্নয়ন সুরু করেছিলেন এবং তাঁদের কার্যকলাপ এমন ছিল যা যে কোনো পার্লামেন্টের পক্ষেই গৌরবের বিষয় বলে বিবেচিত হতে পারত।"[১২২]

সংস্কারের প্রথম তিনটে বছর ছিল অনেক ঘটনাপূর্ণ, আর নতুন সংস্কার আইন অনুযায়ী দ্বিতীয় নির্বাচন সুরু হবার আগে জাতীয় চিত্রের যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটে গেছে। চৌরি চৌরার ঘটনার পর থেকে অসহযোগ আন্দোলনে ভাটা পড়ে আসছিল। বহু মহলে হতাশার সঞ্চার হয়েছিল কেননা হঠাৎ আন্দোলনকে বন্ধ করে দেবার হুকুম দেওয়া হয়েছিল। রাজনৈতিক দিগন্তে ছিল অনিশ্চয়তা। গান্ধীজীকে গ্রেপ্তার করায় তাঁর স্থান নেবার মত কেউ ছিলনা। দেশের তখন প্রয়োজন একটা নতুন কর্ম-সূচী, এগিয়ে যাবার দিকে একটা ধাক্কা। বহু দেশপ্রেমিক কাউন্সিল বর্জন করার ব্যাপারে সংশয় প্রকাশ করলেন। আরো অনেকে ভাবলেন যে কংগ্রেস কাউন্সিল বর্জন করায় যে সমস্ত লোক তাতে গিয়ে ঢুকেছে তাদের

১২২। রিন্যাসেণ্ট ইণ্ডিয়া

চাইতে ভাল ভাবে তাঁরা কাজ করতে পারতেন। কাউন্সিলে প্রবেশ করবার ব্যাপারে চিত্তরঞ্জন দাশের মতামতের কথা আগেই বলা হয়েছে। তিনি কাউন্সিলে প্রবেশ করবার পক্ষপাতি ছিলেন এবং ভেতর থেকে, "সমানভাবে, ক্রমাগত এবং দৃঢ়ভাবে বাধা" দেবার পক্ষপাতি ছিলেন। এই গোলমেলে পরিস্থিতির ব্যাপারে, অনিশ্চয়তায় এবং হতাশার মধ্যে স্বরাজ্য দল কাউন্সিলে ঢুকবার ব্যাপারে প্রধান নীতি গ্রহণ করলেন। কংগ্রেসেরও প্রস্তাবে এর অনুমতি পাওয়া গেলে ব্যাপারটায় আরো সুবিধে হল। চিত্তরঞ্জন দাশ এবং মতিলাল নেহরুর সঙ্গে কেউ পেরে উঠলেন না, ফলে তাঁরা যা বললেন তাই হল। এক বছরের মধ্যেই এইভাবে কংগ্রেস নিজের দৃষ্টিভঙ্গীতে ফিরে গেল। কংগ্রেস এবং স্বরাজ্য দলের কার্যসিদ্ধির উপায় ছাড়া আর কোনো তফাৎ ছিলনা। তাদের রাজনৈতিক কৌশল হল বাধা দেওয়া। এটাও ছিল অসহযোগ তবে অন্য ভাবে।

## একবিংশ অধ্যায়

## শেষ দিনগুলি

সুরেন্দ্রনাথের এবং তাঁর সহকর্মীদের পুরনো, বিধান-সম্মত নীতিগুলির সবচেয়ে বড় বিরোধিতা এল গান্ধীজীর কাছ থেকে—ভারতের জনগণ এঁরই হাতে আস্তে আস্তে দেশের ভাগ্য ক্রমবর্ধমান ভাবে তুলে দিতে লাগলেন। গান্ধীজী জনসাধারণের সামনে এক নতুন দিগন্ত মেলে ধরলেন। আগেই বলা হয়েছে সুরেন্দ্রনাথ তাঁর কর্মজীবনের প্রথম দিকে শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলন করার চেষ্টা করেছেন, শান্তিপূর্ণভাবে প্রতিরোধ এবং যখনি প্রয়োজন হয়েছে অসহযোগিতাও করেছেন, যদিও তিনি রাজনীতিতে অসহযোগের প্রয়োগে বিশ্বাসী ছিলেন না। কিন্তু গান্ধীজী তাঁর অসহযোগিতার ধারণার মধ্যে নতুন করে জনসাধারণের হৃদয়কে প্রতিষ্ঠা করলেন, একটা এমন নৈতিক চেতনা এনে দিলেন যা তাঁর দেশবাসীর কাছে বৈপ্লবিক বলে মনে হল। যেসব লোক বেদনায় নিপীড়িত ছিল তারা তাঁর মধ্যে দেখতে পেল মুক্তিদাতা দেবতাকে। সুরেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় বাধা এল দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের কাছ থেকে—ইনি ছিলেন আর একজন ক্ষমতাবান ব্যক্তি। যে ক'বছর মাত্র তিনি রাজনীতিতে যোগ দিয়েছিলেন সেই কয়েক বছরেই তিনি কংগ্রেসে এবং দেশের রাজনৈতিক ব্যাপারে বিরাট পরিবর্তন এনে দিয়েছিলেন।

সুরেন্দ্রনাথের আত্মজীবনীর ভেতরে সর্বত্র এবং তাঁর কোনো কোনো বক্তৃতায় অসহযোগ আন্দোলন সম্পর্কে এবং এই আন্দোলনের নেতাদের সম্পর্কে প্রচুর সমালোচনা দেখা যায়। তাঁর মতে চোরি-চৌরার ঘটনার পর যে আন্দোলনকে বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং আরো অন্যান্য কর্মসূচী বাতিল করা হয় তার ফলে এর ব্যর্থতাই প্রমাণ করে। সুরেন্দ্রনাথ আরো

বলেন যে অসহযোগ আন্দোলনের ফলেই ঘৃণা এবং শক্তি প্রয়োগ সুরু হয়, আর বিশেষ করে হয় হিন্দু মুসলমান অনৈক্য।

গান্ধীজীর খিলাফতের ব্যাপার এবং কংগ্রেসের রাজনীতিকে এক করার ব্যাপার সুরেন্দ্রনাথ সমেত অনেক নরমপন্থী নেতা পছন্দ করেননি। সুরেন্দ্রনাথ অনুভব করেছিলেন যে এরফলে এর উদ্দেশ্যটাই পণ্ড হয়ে যাবে এবং ফলে সাম্প্রদায়িক অসন্তোষের সৃষ্টি হবে। প্রথমদিকে নরমপন্থীদের সঙ্গে গান্ধীজীর সংস্কার আইনের ব্যাপারে কোনো তফাৎ ছিলনা। কিন্তু সরকার যখন পাঞ্জাবের ভুলগুলিকে সমর্থন করলেন, তখন গান্ধীজী অবশেষে তাঁর মত পরিবর্তন করলেন। আর তখন তাঁর ব্যক্তিত্বের যাদুমন্ত্রে এবং তাঁর অতুলনীয় নৈতিক তেজ জনসাধারণের হৃদয়কে উদ্দীপনায় ভরিয়ে তুলল। সুরেন্দ্রনাথ এবং গান্ধীজী কখনই ঘনিষ্ট হতে পারেননি। তা সত্বেও গান্ধীজী সুরেন্দ্রনাথকে কংগ্রেসের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে এবং জাতীয়তাবাদের পথ প্রদর্শক হিসাবে মেনে নিয়েছিলেন। "আধুনিক ভারতকে যাঁরা রূপ দিয়েছেন তাঁদের একজন।"[১২৩] বলেছিলেন তিনি।

চিত্তরঞ্জন দাশের সঙ্গে সুরেন্দ্রনাথের মত পাথক্য ছিল একই রকমের বা সম্ভবত আরো বেশী। তিনি চিত্তরঞ্জন দাশের ক্ষমতা, কৌশল এবং বিচার সম্পর্কে অনেক ভাল কথা বলেছেন কিন্তু তাঁর নীতি এবং উপায় সম্পর্কে, বিশেষ করে চিত্তরঞ্জন দাশের "বাধা দেওয়ার" নীতিগুলির প্রচুর সমালোচনা করেছেন। চিত্তরঞ্জন দাশ দেশের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, বিশেষ করে বাংলাদেশে আশ্চর্য দ্রুত গতিতে বড় হচ্ছিলেন, ধীরে ধীরে কিন্তু নিশ্চিতভাবে তিনি সুরেন্দ্রনাথকে, যিনি ছিলেন গান্ধীজীর কথায় "বাংলার উপাস্য",[১২৪] প্রশ্নাতীতভাবে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় নেতার আসন থেকে হটিয়ে দিচ্ছিলেন। মণ্টেগুর ঘোষণার পর থেকে চিত্তরঞ্জন দাশ,

১২৩। বেঙ্গলী, ৯ই আগষ্ট, ১৯২৫

১২৪। আত্মজীবনী

সুরেন্দ্রনাথ সমেত সকল নরমপন্থীদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু আমরা পি. সি. রায়ের কথায় জানতে পারি যে জীবনের শেষ দিকে চিত্তরঞ্জন দাশ সুরেন্দ্রনাথ সম্পর্কে অনেক নরম হয়েছিলেন। তিনি পি. সি. রায়কে এ নেশন ইন মেকিং বইটি তাঁর কাগজ 'ফরোয়ার্ড'-এ সমালোচনা করতে বলেন এবং পরে তাঁকে টেলিগ্রাম করে জানান "সুরেন্দ্রনাথের প্রতি যেন অতি কঠোর"[১২৫] তিনি না হন।

১৯২৩ খৃষ্টাব্দের শরৎকালে দ্বৈত শাসনের পর দ্বিতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। কাউন্সিলে প্রবেশ ব্যাপারে কংগ্রেসের নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ায় স্বরাজ্য দলের এখন আইনসভায় নির্বাচনে দাঁড়ানোয় কোনো বাধা রইলনা। এটা তাঁরা প্রচুর তেজ এবং উৎসাহের সঙ্গে করেন। পণ্ডিত মতিলাল নেহরু এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন একত্রে যুক্ত প্রদেশ ভ্রমণ করেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন বাংলাদেশে খুব তাড়াতাড়ি ঘুরে সকলকে স্বরাজ্য দলকে সমর্থন করতে অনুরোধ করেন এবং লোকেরা তাঁর ডাকে সহৃদয়তার সঙ্গে সাড়া দেয়। নির্বাচনে স্বরাজ্য দল খুব ভালই করে এবং বাংলার আইন সভায় সবচেয়ে বড় দল হিসাবে স্থান পায়। চিত্তরঞ্জন দাশের কৌশলে অন্যান্য দলের কোনো কোনো সভ্য তাঁকে সমর্থন করায় তাঁর দল সংখ্যা গরিষ্ঠ হয়। বড় বড় নেতাদের কেউ কেউ পরাজিত হলে উদারপন্থীরা একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলেন। বাংলাদেশে সুরেন্দ্রনাথের সবচেয়ে বড় পরাজয় হল, তাও তখনকার আমলে প্রায় অজানা কিন্তু স্বরাজ্য দল সমর্থিত ডক্টর বিধানচন্দ্র রায়ের হাতে। নির্বাচনী যুদ্ধে সুরেন্দ্র-নাথের মন্ত্রী হওয়ার বিরুদ্ধেই বক্তৃতা চালানো হল। এইভাবে পরাজয়ের অস্বস্তির মধ্যে একটি বিরাট এবং বিচিত্র কর্মজীবনের অবসান হল। যেন বিশাল একজন বীরের পতন ঘটল।

পঞ্চাশ বছর ধরে সুরেন্দ্রনাথ যে রাজনৈতিক জীবনে প্রধান ছিলেন সেই জন জীবন থেকে তিনি অপসৃত হলেন। কথায় আছে জনমতের

---

১২৫। লাইফ অ্যাণ্ড টাইমস্ অব সি. আর. দাশ। পি. সি. রায় প্রণীত

উপর কখনো বিশ্বাস রাখা যায় না। জনমত যে পরিবর্তনশীল একথা সুরেন্দ্রনাথের মত আর কারুর জানা থাকবার কথা নয়। জনমতের এবং ভাবের পরিবর্তনশীল স্রোতের মধ্যে পাথরের মত দাঁড়িয়ে থেকে তিনি সহজে পাওয়া যায় এমন জনপ্রিয়তা তাঁর সমস্ত জীবনের নীতিকে বিসর্জন দিয়ে পেতে চাননি। তাঁকে সেই তিক্ত ফল গ্রহণ করতেই হল। অন্য এক প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন: "পুরনো দিনের দেবতা, আজকের দানব, নির্দয়ভাবে ধুলোয় পদদলিত।"[১২৬] তাঁর অপরাধের মধ্যে ছিল, যা তিনি নিজেই বলেছেন, সরকারের একজন সদস্য হওয়া। তাঁর বিরুদ্ধে এমন ভাবে আন্দোলন করা হয় এবং এমনভাবে জনমত বদলে যায় যে তাঁর নিয়মমাফিক নীতিগুলির প্রতি আনুগত্যের ফলে তাঁর প্রচণ্ড মূল্য দিতে হয়।

নির্বাচনে তাঁর পরাজয় হলে, সুরেন্দ্রনাথ জনজীবন থেকে অবসর গ্রহণ করলেন এবং তাঁর সমস্ত সময় সাংবাদিকতার কাজে নিয়োগ করলেন, এবং আরো একটা কাজ, যেটা কিনা আরো প্রয়োজনীয়, তিনি তাঁর স্মৃতিকথা, এ নেশন ইন মেকিং লিখতে থাকেন। তিনি ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে বইটি লিখতে সুরু করেন কিন্তু সেটি রাজনৈতিক নানারকম ঝড় ঝাপটায় আর শেষ করা সম্ভব হয় না। ঐ বয়সেও সুস্থ অবস্থায় এবং প্রচণ্ড তীক্ষ্ণ স্মৃতিশক্তির সাহায্যে তিনি দিনের পর দিন ব্যারাকপুরের বাড়িতে পাগল করা মানুষের ভীড় থেকে, গোলমাল এবং হাঙ্গামা থেকে দূরে বসে লিখতে থাকেন। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে এটি প্রকাশিত হবার পর এটি রাজনৈতিক আত্মজীবনীর ক্ষেত্রে একটি ধ্রুপদী সাহিত্যের স্থান লাভ করে। এই বইতে সুরেন্দ্রনাথ তাঁর অননুকরণীয় ভঙ্গীতে কেবল যে তাঁর জীবনের নানাবিধ ঘটনার কথা এবং ধারনার কথা শুনিয়েছেন তা নয়, তিনি এর মধ্যে জাতীয় আন্দোলনের গোড়ার কথা এবং গড়ে ওঠার কথাও জানিয়েছেন। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি মূল্যবান সেইসব লোকেদের সম্পর্কে তিনি লিখেছেন যাঁরা তাঁর আমলে ছিলেন বিখ্যাত, কিংবা অল্পখ্যাত কিন্তু পরের যুগের লোকেরা হয় তাঁদের কথা ভুলে গেছে অথবা

১২৬। এ নেশন ইন মেকিং

তাঁদের অনেক ছোট করে দেখেছে। সুরেন্দ্রনাথ বলেন যে তাঁর বই লেখার "উদ্দেশ্য ছিল দেশপ্রেম সঞ্জাত।" এবং তিনি তাঁর দেশবাসীকে সাবধান করে দিতে চেয়েছিলেন প্রগতির যাত্রার পথে লোভ এবং বাধা-গুলির সম্পর্কে। এই বইতে সুরেন্দ্রনাথের ইতিহাস, রাজনীতি এবং সাহিত্য সম্পর্কে প্রভূত জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়।

এই শক্তিশালী, ঘটনাবহুল জীবন, অসাধারণ বিস্ময়কর কত কি করেছেন কিন্তু শেষ হল পরাজয়ের ভেতর দিয়ে হীন ভাবে, ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের ৬ই আগষ্টে।

# দ্বাবিংশ অধ্যায়

## সার কথা

এরকম একটা বিচিত্র, শক্তিপূর্ণ, যিনি প্রচণ্ড সাফল্য লাভ করেছেন এবং তা সত্ত্বেও শেষের দিকে বিতর্কিত হয়েছেন, এমন জীবনকে বিচার করা খুব সোজা কাজ নয়। এরকম করতে যদি হয় তাহলে কতকগুলো ঘটনার কথা মোটামুটি ভাবে মনে রাখতে হবে। সুরেন্দ্রনাথের রাজনৈতিক জীবন, ভারতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার প্রায় দশ বছর আগে সুরু হয়। তখন রাজনৈতিক চেতনা ছিল অস্পষ্ট এবং সবে তার সূচনা হয়েছে। তিনি ছিলেন সেই কংগ্রেসীদের অন্যতম যে কংগ্রেসীরা এক পুরুষ ধরে উদার-নৈতিক বৃটিশ চিন্তাধারা এবং প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে অনুপ্রেরণা পেয়ে এসেছেন। এই লোকেরা ইংরেজ সভ্যতা, ভাষা এবং রাজনীতিকে বড় করে দেখতেন। তাঁরা ছিলেন বৃটিশদের প্রতি কৃতজ্ঞ কেননা তাঁরা ভারতবর্ষে অনেক কিছু ভালর আমদানি করেছিলেন এবং তাঁদের ছিল বৃটিশ জনসাধারণের উদার মনোভাবের উপর প্রচণ্ড বিশ্বাস। সাম্রাজ্যের মধ্যে স্বায়ত্ব শাসন পাওয়া তাই বহু কংগ্রেসী নেতাদের কাছে উদার-নৈতিকদের প্রস্থানের পরেও ধর্ম ছিল।

সুরেন্দ্রনাথ নিজে তাঁর রাজনৈতিক ধর্ম এবং উপায় সম্পর্কে লিখেছেন: "সুষ্ঠু প্রগতির সঙ্গে দেশ প্রেমের শিক্ষা দিয়েছি। আমি সাম্রাজ্যের মধ্যে চেয়েছি স্বায়ত্ব শাসন এবং তা পাবার জন্য বিধান এবং আইন সঙ্গত পথই একমাত্র পথ বলে মনে করেছি।"[১২৭] তাঁর যুগের নেতাদের মত সুরেন্দ্রনাথেরও বৃটিশ সদিচ্ছার প্রতি বিশ্বাস ছিল। কখনো কখনো তাঁর সেই বিশ্বাসে কঠিনভাবে ঘা লেগেছে। বঙ্গ বিভাগ ছিল একটা

১২৭। এ নেশন ইন মেকিং

সেইরকম ঘটনা। তবু তিনি বিশ্বাস করেছেন, কেউ কেউ হয়ত বলবেন অতি করুণ সে দৃশ্য। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় তিনি মণ্টেগুর সদিচ্ছার প্রতি কোনোরকম সন্দেহ করেননি, সেজন্য সংস্কারের বিরোধিতা করেননি।

সাধারণভাবে বলা যায় তিনি বিধান সঙ্গত উপায় ছাড়া আর কোনো উপায়কে মেনে নেননি—তিনি নিঃসন্দেহাতীত ভাবে জানতেন ঐ উপায়ই শ্রেষ্ঠ। বৈপ্লবিকই হক বা অসহযোগই হক, তিনি অনুভব কয়তেন সেই উপায়গুলি গ্রহণ করলে শেষ পর্যন্ত লাভ নাও হতে পারে। একটা কথা ঠিকই, তখন বৈপ্লবিক উপায় গ্রহণ করে সাফল্যলাভ করা সম্ভব ছিলনা। তিনি বলেন: "বাংলাদেশে বৈপ্লবিক আন্দোলন করে দেখা হয়েছে ·····শেষ পর্যন্ত এটা ব্যর্থ হয়েছে, আর এই দুঃখজনক ঘটনার প্রধান অভিনেতাদের অধিকাংশই, এই পরাজয়কে মেনে নিয়ে শান্তিপূর্ণ নাগরিক হিসেবে বসবাস করছেন ······আধুনিককালে বিপ্লব সম্ভব হয়েছে সুশিক্ষিত এবং সংঘবদ্ধ সৈনিকের সাহায্যে। ভারতীয় বিপ্লবীদের সাহায্য করবেন এমন সৈন্যদল কোথায়?"[১২৮]

সুরেন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ সহযোগিতাও পছন্দ করেননি, সম্পূর্ণ অসহযোগিতাও নয়। যেখানে প্রয়োজন সেখানে বিরোধিতা, সহযোগিতা যেখানে সম্ভব—এই ছিল তাঁর নীতি। তিনি বলেন তিনি ছিলেন অসহযোগিতা ধর্মের "একজন অন্যতম প্রথম পুরোহিত।" বরিশালের শাসকদের কর্মের প্রতিবাদে তিনি কলকাতার অনারারি প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটের এবং ব্যারাকপুরের প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটের পদ ত্যাগ করেন। এর আগে, ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে তিনি অগণতান্ত্রিক মিউনিসিপ্যালিটি আইনের বিরুদ্ধে কলকাতার মিউনিসিপ্যালিটি কমিশনের পদ ত্যাগ করেন। তিনি খুব তেজের এবং সাফল্যের সঙ্গে একটি জনআন্দোলন পরিচালনা করেন—আন্দোলনটি হল প্রদেশ বিভাগের বিরোধিতা,

১২৮। এ নেশন ইন মেকিং

যতদিন না পর্যন্ত কেটে দুভাগ করা প্রদেশকে আবার জোড়া লাগানো হয় ততদিন মন্ত্রীসভায় প্রবেশ করতে অস্বীকার করলেন। কিন্তু তিনি সর্ব সময়ে একইভাবে অসহযোগ করেননি, বিরোধিতা করার খাতিরেই বিরোধিতাও নয়। তাঁর কথায় বলি: "কখনো কখনো এমন পরিস্থিতি হয় যখন আমরা প্রতিবাদ জানানোর জন্য অসহযোগ করব। কিন্তু আমি ক্রমাগত অসহযোগ নীতিকে সর্বতোভাবে বিরোধিতা করি, বিশেষ করে যখন…… সরকার প্রগতির পথে এগিয়ে যেতে রাজি, যদিও যত তাড়াতাড়ি আমরা চাই তত তাড়াতাড়ি তা হচ্ছে না।"[১২৯] সুরেন্দ্রনাথের কাছে অসহযোগ ছিল নেতিবাচক, যার দর্শন হল অস্বীকার করা। তিনি অনুভব করেছিলেন যে অসহযোগ বিশৃঙ্খলা এবং ঘৃণা সৃষ্টি করবে এবং তাতে যে তিক্ততার সৃষ্টি হবে তাতে দেশের উদ্দেশ্যের ক্ষতি হবে। তিনি এটিকে আদর্শগত ভাবে কিংবা সক্রিয় রাজনীতির ক্ষেত্রে কোন মতেই সমর্থন করতে পারতেন না।

সুরেন্দ্রনাথ ভেবেছিলেন যে বিধিসঙ্গত উপায়গুলির প্রতি তাঁর যে আসক্তি তার যথেষ্ট কারণ ছিল। এরফলে যা পাওয়া গিয়েছিল তার সংখ্যাও কম ছিলনা, ছোটোখাটো ব্যাপারও ছিলনা। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে সুরেন্দ্রনাথের কাছে তাঁর শেষ চিঠিতে রমেশ চন্দ্র দত্ত লিখেছিলেন: "আমাদের এই এক পুরুষে আমরা কি আশ্চর্য বিপ্লবই না দেখলাম! একটা জাতির চিন্তাধারা এবং ভাবের কি পরিবর্তনই না হল, আর সেই পরিবর্তন আনতে আপনাকে কি মহান অংশ গ্রহণ করতে হয়েছিল!"[১৩০] দেশের অস্পষ্ট রাজনৈতিক পরিবেশের মধ্যে সুরেন্দ্রনাথের আবির্ভাবের পর থেকে মণ্টেগুর সংস্কারগুলির সময় পর্যন্ত দেশের মধ্যে যা হয়েছিল তাতে আস্তে আস্তে হলেও দেশের সুদূর প্রসারী পরিবর্তন ঘটেছিল—জনমত বিস্তার

১২৯। এ নেশন ইন মেকিং

১৩০। ভারত গৌরব বঙ্কিমচন্দ্র সুরেন্দ্রনাথ (বাংলায়) কমলাদেবী প্রণীত

লাভ করেছিল, স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসনের প্রচার হয়েছিল, খবরের কাগজের কণ্ঠস্বর তীব্রতর হয়েছিল, এমনকি স্বরাজ্যের দিকেও অগ্রগতি ঘটেছিল বলা চলে, আর এসমস্তই পরের আরো বৈপ্লবিক আন্দোলনের ভিত্তি রচনা করে।

এমনকি আস্তে আস্তে উদারনৈতিকদের বিধিসঙ্গত উপায়গুলি আরো ব্যাপক হতে থাকে। গোখ্‌লে বললেন যে বিধিসঙ্গত আন্দোলন প্রায় সবরকমেই হতে পারে কেবল বিদ্রোহ, অপরাধ এবং বাইরের আক্রমণকে সাহায্য সমর্থন করা ছাড়া, অবশ্য এর মধ্যে শান্তিপূর্ণ প্রতিরোধও বাদ দেওয়া হলনা। এইভাবে সুরেন্দ্রনাথ প্রদেশ বিভাগের আন্দোলনের সবচেয়ে প্রধান হয়ে পড়লেন। গোখ্‌লে এই আন্দোলন সম্পর্কে বলেছেন: "জনগণের আবেগের প্রবল অভ্যুত্থান" হল, যা কিনা "আমাদের জাতীয় প্রগতির ইতিহাসে স্মরণীয়"[১৩১] হয়ে রইল। এই আন্দোলনে তিনি শান্তিপূর্ণ প্রতিরোধের কৌশল গ্রহণ করেছিলেন যদিও বিধানসঙ্গত আন্দোলনেই তাঁর ছিল দৃঢ় বিশ্বাস। তিনি ছিলেন বিদেশী দ্রব্য বর্জন এবং স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার করা যাঁরা সুরু করেছিলেন তাঁদের অন্যতম। এই ধারণা কংগ্রেস সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করে এবং পরে গান্ধীজী এটিকে গ্রহণ করেন। কিন্তু তিনি স্কুল কলেজ আইনসভা ইত্যাদি বর্জনকে প্রবলভাবে বিরোধিতা করতেন।

সুরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন যে ভারতবর্ষ যদি সাম্রাজ্য থেকে আলাদা হয়ে যায় তাহলে তা ভারতের পক্ষে মঙ্গলজনক হবে না। তিনি আসলে চাইতেন কমনওয়েল্‌থ এর একটি স্বয়ংশাসিত অংশ হয়ে ভারতবর্ষ অন্যান্য সভ্যদের সঙ্গে একই গোত্রে অধিষ্ঠান করবে এবং তা হবে বৃটিশদের ধারণার অনুরূপ সাংবিধানিক স্বাধীনতা। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বরে তাঁর ইংল্যাণ্ড থেকে ফিরে আসবার পর, তাঁকে কলকাতার রোটারি ক্লাবের পক্ষ থেকে কিছু বলতে অনুরোধ করা হয়—এই ক্লাবটি ছিল প্রায়

১৩১। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে বেনারস কংগ্রেসের সভাপতির অভিভাষণ

সাহেবী ধাঁচে গড়া। তিনি বলেছিলেন: "সাম্রাজ্য আপনাদের, কিন্তু এটা আমাদেরও। আপনারা এটাকে সৃষ্টি করেছেন, আমরা করেছি প্রতিপালন। আপনারা হলেন এর প্রকৃত উত্তরাধিকারী, আমরা হলাম এর প্রতিপালিত সন্তান। আপনাদের এবং আমাদের এখানে একই রকম মূল্য, আর এখানে আমার এবং আমার মহান দলের পক্ষ থেকে আমার বিশ্বাস সম্পর্কে সমস্ত কথা অসঙ্কোচে বলছি।"[১৩২]

সুরেন্দ্রনাথ কেন মন্ত্রী হতে রাজি হয়েছিলেন? তাঁর জীবন এবং কর্মের সম্পর্কে এই প্রশ্নটি সবচেয়ে কঠিন। কেন বহু যুদ্ধের প্রবীণ সৈনিক সরকারের অধীনে একটা সামান্য মন্ত্রী হয়েছিলেন? এ প্রশ্নের জবাব হঠাৎ মিলবে না। তাঁর সম্পর্কে কেউ কেউ অন্যায়ভাবে বলে থাকেন যে মন্ত্রীত্বের এবং নাইট উপাধির লোভের জন্যই তিনি তা করেছিলেন। তাঁর সম্বন্ধে বলা হয়েছে তিনি একজন দলত্যাগকারী, "হারিয়ে যাওয়া নেতা।" যদি ধরেই নেওয়া যায় যে সুরেন্দ্রনাথ চাকচিক্য এবং মোহে পড়ে মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করেছিলেন তাহলে তিনি তো সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা আগে থাকতেই করতে পারতেন, তাহলে খুব সহজেই সরকারের পক্ষে তাঁর সহযোগিতা গ্রহণ করা সম্ভব হত। কিন্তু তিনি তা না করে একজন প্রচণ্ড আন্দোলনকারী হিসেবেই রইলেন, সেটা সরকারী মতে প্রায় রাজদ্রোহিতার নামান্তর ছিল—সেটা করতে করতে হঠাৎ তিনি অনুভব করলেন যে সরকারকে সহযোগিতা করার সময় এসেছে, জাতি গড়ে তোলার জন্য তার প্রয়োজন। অবশ্য তা করা হবে, সেই সময়ে বিদেশী শাসনের মধ্যে যতখানি করা সম্ভব, দৈনন্দিন হীনতা থেকে জনসাধারণকে ততখানি রক্ষা করে।

"আন্দোলন করো, আন্দোলন করো, আন্দোলন করে" এই ছিল তাঁর যুদ্ধের হুঙ্কার। যদিও তিনি বিধান সম্মতভাবে সমস্ত করতে চাইতেন,

১৩২। এ নেশন ইন মেকিং

তা সত্ত্বেও তিনি ছিলেন একগুঁয়ে, নিরলস, আন্দোলনকারী—তা সে মঞ্চেই হক, খবরের কাগজের মাধ্যমেই হক, যখন যেরকম প্রয়োজন তখন তেমন। সেই জন্যই তাঁকে বলা হত যুবক ক্ষেপানোর ওস্তাদ। যখন তিনি বুঝতে পারলেন যে সরকারের সঙ্গে সর্বান্তকরণে সহযোগিতার সময় এসেছে, তিনি তখন তাঁর জনপ্রিয়তা এবং রাজনৈতিক জীবন হারিয়েও সহযোগিতা করলেন। "আমি ভগবান এবং আমার দেশের জনগণের সেবক" সমস্ত জীবন ধরে তিনি এ কথাই বলে গেছেন—এই সঙ্গে তিনি এটা অনুভব করেছেন সংস্কারের ফলে যে সীমিত সুযোগ পাওয়া গেছে তা দিয়ে জনগণের জন্য ভাল কিছু করা যায়। যদি দেশবন্ধু প্রাণবন্ত সহযোগিতার ডাকে সাড়া দিতে পারলেন, আর টিলক যদি পরে কমনওয়েলথ-এর মধ্যে স্বায়ত্ব শাসনের জন্য মত প্রকাশ করতে পেরেছিলেন, তাহলে সেই সময়ের উপযোগী কোনো পরিকল্পনা যেটাকে তিনি ভাল মনে করেছিলেন তা গ্রহণ করাটা খুব অস্বাভাবিক হয়নি বলেই মনে হয়।

নিজেকে বড় করবার জন্য তিনি সরকারী ভবনের সিঁড়িতে গিয়ে হাজির হন নি। জনগণের নিঃস্বার্থ সেবায় আত্মনিয়োগ করার ইচ্ছাই তাঁকে এই নতুন অভিজ্ঞতার মধ্যে নিয়ে গিয়েছিল। তরুণ সুরেন্দ্রনাথের তেজ এবং শক্তি সেই সময় একজন পরিপক্ক ধর্ম প্রচারকের উৎসাহে উৎসাহী করে তুলেছিল। তিন বছর সরকারে থেকে সীমিত ক্ষমতা প্রয়োগ করে এবং ক্রমাগত বাধা পেয়ে গালাগালি সহ্য করে তিনি কি পেয়েছিলেন তা আগেই বলা হয়েছে।

সুরেন্দ্রনাথের সবচেয়ে বড় দান ছিল ভারতীয় ঐক্য সৃষ্টি করে ভারতবর্ষকে একজাতীয়তা দান করা—এর জন্য তিনি নিরলস ভাবে কাজ চালিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি জনসাধারণের জন্য নানারকম কাজ কর্মের ভেতর দিয়ে—সবচেয়ে বেশি যেগুলির জন্য পরিশ্রম করেছিলেন, সেগুলি হল –সিভিল সার্ভিস প্রশ্ন, দেশীয় ভাষায় সংবাদপত্র প্রকাশ

আইন এবং ইলবার্ট বিল আন্দোলন। এগুলির জন্য তিনি সমস্ত ভারতবর্ষ ঘুরে ঘুরে বক্তৃতা দিয়েছেন।

এ সমস্তই তিনি করেছেন যাতে সমস্ত ভারতবর্ষকে একটি সাধারণ রাজনৈতিক মঞ্চে আনা সম্ভব হয়, যাতে একটা সাধারণ কর্মসূচী গ্রহণ করা যায়। কর্মজীবনের সুরু থেকেই তাঁর স্বপ্ন ছিল কি করে সমস্ত ভারতবর্ষকে, যার মধ্যে রয়েছে হতবুদ্ধিকর প্রচণ্ড সংখ্যক ধর্ম, ভাষা এবং সংস্কৃতি. এক সূত্রে এক ছন্দে গেঁথে ফেলা যায়। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের উদাহরণ সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন তিনি। তাঁর সবচেয়ে বড় ইচ্ছে ছিল ভারতবর্ষকে একটা ধর্মনিরপেক্ষ, পার্লামেণ্টারি গণতান্ত্রিক দেশরূপে প্রতিষ্ঠা করা। তাঁর প্রথম দিককার বক্তৃতাগুলিতে জাতীয় চেতনাকে জাগিয়ে তুলবার জন্য সযত্নে বিষয়গুলো তিনি বেছে নিয়েছিলেন। এগুলি ছিল : ভারতীয় ইতিহাস, ভারতীয় ঐক্য, চৈতন্য, মাৎসিনি এবং শিখ। তাঁর তরুণ মনে ইটালির ঐক্যের পুরোহিত মাৎসিনির লেখাগুলি প্রবলভাবে ছাপ দিয়েছিল, আর তিনি ছাত্রদের বিপ্লবের কথা বাদ দিয়ে মাৎসিনির কথা শোনাতেন, আর তার ফলে ভারতবর্ষের ঐক্য আনতে হবে এই বাণীটি মূর্ত হয়ে উঠল। তাঁর মৃত্যুর পর মর্ডান রিভিউ ( ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর সংখ্যায় ) পত্রিকায় লেখা হয়েছিল এইভাবে : "ঐক্যবদ্ধ ভারতবর্ষের লক্ষ্য সম্পর্কে ভারতবর্ষের আর কোনো রাজনৈতিক নেতা এত বেশি বলেননি, লেখেননি।" আধুনিক গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষের আসল এবং প্রয়োজনীয় অংশের অনেক কিছুর জন্যই দায়ী সুরেন্দ্রনাথের দিব্যদৃষ্টি এবং রাজনৈতিক চেতনা।

মাতৃভূমির সেবা করাকে তিনি মনে করতেন, "সবচেয়ে বড় ধর্ম" এবং দেশের জন্য কোনো ত্যাগকেই বড় মনে করতেন না। জনসাধারণের কাছে কর্তব্য যেখানে রয়েছে সেখানে ব্যক্তিগত শোকের স্থান তিনি রাখেননি। এর আগেই বলা হয়েছে কেমন করে তাঁর পুত্রের মৃত্যুর পর সেই শোকের মধ্যেও তিনি ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সভায় বক্তৃতা

দেন। ১৯১১ খৃষ্টাব্দের ২৩শে ডিসেম্বর তাঁর স্ত্রীর মৃত্যু হয়। কিন্তু তিনি ২৬শে ডিসেম্বর কংগ্রেস অধিবেশনে যোগ দেন এবং সেখানে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। তাঁর সমস্ত জীবন ধরেই তিনি জনসাধারণের কাজকর্মে, আন্দোলনে এগিয়ে থেকেছেন। তিনি তেজের সঙ্গে সুস্থ জনজীবনের ধারাকে গড়ে তুলবার চেষ্টা করেছেন। তিনি যে দুবার কংগ্রেসের সভাপতি হয়েছিলেন তা থেকেই বোঝা যায় তাঁর সঙ্গে কংগ্রেসের সম্পর্ক। সভাপতি হন বা না হন তিনি সর্বদাই কংগ্রেসের প্রধান ছিলেন এবং সভার কাজে তিনি যথেষ্ট মূল্যবান সাহায্য করেছেন। তিনি কংগ্রেস সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন যে এটা "জাতির বে-সরকারী পার্লামেণ্ট"। তিনি একথাও বলেছিলেন যে এটা হল "যুক্ত ভারতের কংগ্রেস"—যে কংগ্রেস বিরাট এবং বিচ্ছিন্ন জনসাধারণকে একত্রিত করতে পেরেছে, এবং এক দৃঢ় ঐক্যে আবদ্ধ করেছে। এই বিরাট সাফল্যের জন্য তাঁর প্রচেষ্টা ছিল অসামান্য। সম্ভবতঃ এই কারণেই তাঁর দেশবাসী তাঁর প্রতি সবচেয়ে বেশি কৃতজ্ঞ।

এটা সত্যি কথা যে জাতীয়তাবাদের প্রধান স্রোত থেকে তিনি শেষ পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন—রাজনীতিতে সর্বদাই সৎ মতানৈক্যের স্থান আছে। কিন্তু পরে তাঁর রাজনৈতিক যে কোনো রকম পরিবর্তনই হয়ে থাকুক না কেন, আসল কথাটা এই যে জাতীয়তাবাদ যাঁরা প্রতিষ্ঠা করেন তিনি ছিলেন তাঁদের মধ্যে সর্ব প্রধান। তিনি ছিলেন ভারতীয় ঐক্যের প্রধান স্থপতি, রাজনৈতিক চেতনার জন্মদাতা।

সমাজ সম্পর্কে সুরেন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গী এখানে কিছু বলা প্রয়োজন। প্রায় সমস্ত সময়েই রাজনীতি নিয়ে ব্যস্ত থাকায় সামাজিক প্রশ্ন নিয়ে আলোচনার সময় ছিল না। অবশ্য তিনি রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণের পর হিন্দু বিধবাদের অবস্থার উন্নতির জন্য আন্দোলন করবেন এমন ইচ্ছে প্রকাশ করেছিলেন—এই আন্দোলন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সুরু করেছিলেন এবং তাঁর যুব মানসে তা গভীরভাবে দাগ কেটেছিল। যখন

বিদ্যাসাগরের মহান বাণীতে কোনো ফল হয়নি তখন সুরেন্দ্রনাথ তাঁর যুবক বয়সে বলেছিলেন : "কখন তাঁর বাণী রূপ পাবে?" বিদ্যাসাগরের আরব্ধ কাজ তাঁর ইচ্ছে সত্ত্বেও করতে পারেননি, কেননা মৃত্যু তার আগেই তাঁকে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। "প্রাচীন হিন্দু ধর্ম" সুরেন্দ্রনাথের পছন্দসই ছিল না। তাঁর সামাজিক ধারণা ছিল "প্রগতিমূলক"। তিনি দৃঢ় বিশ্বাস করতেন যে সমাজ বদলাচ্ছে—কেননা তখন জাতিভেদ নরম হয়ে আসছিল, নানারকম বিধি-নিষেধ আস্তে আস্তে সরে যাচ্ছিল। যেমন রাজনীতির ক্ষেত্রে, তেমন সামাজিক ক্ষেত্রে তিনি ধীরে ধীরে প্রগতি পছন্দ করতেন, তিনি মনে করতেন বিপ্লবের ফলে হঠাৎ সমস্ত প্রচলিত জিনিস বিপর্যস্ত হয়ে যাবে এবং হয়ত তা জনসাধারণ পছন্দ করবে না।

সুরেন্দ্রনাথের চরিত্রে কোনো কলুষতা ছিলনা। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি দয়ালু এবং হৃদয়বান ছিলেন, নিজের ছিল গভীর ধর্মবিশ্বাস, আর অন্যের জন্য ছিল মানবিক সহানুভূতি। তিনি এমনকি তাঁর রাজনৈতিক বিরোধী লোকেদেরও সাহায্য করতে ইতস্ততঃ করতেন না। এমন সব ঘটনা জানা যায় যখন বিপ্লবীরা দুর্দশায় পড়েছে তখন যদিও বিপ্লবীদের কর্মপন্থায় তাঁর বিশ্বাস ছিল না তবু ব্যক্তিগত ক্ষমতা প্রয়োগ করে তিনি তাঁদের সাহায্য করেছেন। যদিও তিনি বিলিতি সংস্কৃতি এবং সভ্যতার দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন তবু তিনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আচারে ব্যবহারে পোশাকে ভারতীয় ছিলেন। তাঁর সহজ ভঙ্গী থাকায় তাঁর কাছে সহজে যাওয়া যেত, তিনি উঁচু বা নিচু ভেদাভেদ করতেন না। তিনি সময়নিষ্ঠ ছিলেন। বেশি বয়সেও তিনি নিয়মিত ব্যায়াম করেছেন। তিনি ধূম এবং মদ্যপান একেবারেই করতেন না, এমনকি সরকারী স্থানেও খাদ্য সম্পর্কে তাঁর নানারকম বাছবিচার ছিল। মৃত্যুর কিছু আগে তিনি শারীরিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন কিন্তু মন ছিল সজাগ। তিনি আশা করেছিলেন যে আরো দশ বছর বাঁচবেন এবং সমস্ত রাজনৈতিক

দলের মধ্যে মিলন ঘটিয়ে একটা বড় সংস্থা গড়ে তুলবেন।[১৩৩] গান্ধীজী তাঁকে বিনা কারণে "যোদ্ধা" নাম দেননি।

বীরত্বে, মহান চরিত্রে, আত্মদানে, প্রচণ্ড স্বদেশী আবেগে, ধর্ম প্রচারকের মত আত্মত্যাগে এবং গঠনমূলক ক্ষমতায় তাঁর চাইতে বড় কম লোকই ছিলেন।

১৩৩। "সুরেন্দ্রনাথ" রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মাসিক বসুমতী, ১৩৩২ ভাদ্র দ্রষ্টব্য

# পরিশিষ্ট-১

## ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে পুনা কংগ্রেস অধিবেশনে সুরেন্দ্রনাথের সভাপতির অভিভাষণ থেকে কিছু উদ্ধৃতি

### ১। আইনসভা

এ যাবৎ আমরা আমাদের আলোচনার মধ্যে আইনসভার সংস্কারকে সবচেয়ে প্রধান স্থান দিয়েছি। তারপর এল ১৮৯২ খৃষ্টাব্দের আইনসভার আইন যার দ্বারা আইনসভাকে ঢেলে সাজা হল আর এর কার্যপরিধিরও বিস্তার করা হল। এই আইন সম্পর্কে আমাদের কি বক্তব্য? এই আইনটি এবং যেভাবে এটিকে কাজে লাগানো হচ্ছে তাতে কি আমরা খুশি হয়েছি? আমি একথা বলতে বাধ্য হচ্ছি যে এর উত্তর হচ্ছে, না। আমরা মনে করি সরকার এইসব করছেন পরীক্ষামূলকভাবে এবং সাবধানে। রাষ্ট্র চালকের একটা গুণ হল সাবধানে চলা। কিন্তু যদি সাবধানতাকে চরম ভাবে গ্রহণ করা হয় - যার আর এক নাম হল দুর্বলতা—তাহলে সেটাকে ভুল বলেই ধরা যায়, এমনকি বলা চলে প্রচণ্ড ভুল। সরকার যদি "অজানার দিকে প্রচণ্ড লাফ" দেবার আগে ঠিকমত সাবধানতা অবলম্বন করেন তাহলে আমাদের কোনো আপত্তি নেই। এই বিরাট দায়িত্বভার ঘাড়ে নিয়ে সরকার পুরনো নীতি ত্যাগ করে বড় কিছু করতে গেলে সবদিকে বিচার করবেন নিশ্চয়। কিন্তু আমরা যেটা অভিযোগ করছি সেটা হল এই যে পরীক্ষা আরো ভাল ভাবে করা যেত, সাফল্যের সম্ভাবনা তাতে আরো বেশি থাকত, যদি এই সব কর্মনীতি গ্রহণ করবার আগে পার্লামেণ্টে সরকার এবং বিরোধীপক্ষের রাষ্ট্রনীতিবিদেরা যেসব ঘোষণা করেছিলেন সেই অনুযায়ী কাজ করা হত। মিঃ গ্ল্যাডস্টোন আশা করেছিলেন এখানে

ভারতীয় জনগণের প্রতিনিধিত্ব করবেন সত্যিকারের জনপ্রতিনিধিগণ। লর্ড সলস্‌বেরি চেয়েছিলেন আইন কানুন যেন এমনভাবে করা হয় যাতে ভারতবর্ষের সমগ্র জনগণের মধ্যে থেকে সদস্যরা নির্বাচিত হন, ছোটোখাটো দল থেকে নয়। কিন্তু যা হয়েছে তাতে কি এই সব আশা মিটেছে? বাংলাদেশের সাত কোটি লোকের প্রতিনিধিত্ব করছেন সাতজন নির্বাচিত সদস্য। আইনসভাগুলো বাড়ানো হয়েছে কিন্তু তাঁরা সামান্যতম ভাবেও জনসাধারণের প্রতিনিধিত্ব করছেন না। যুক্তরাজ্যে চার কোটি লোকের প্রতিনিধি হল ৬৭০ জন সদস্য। বাংলাদেশে সাত কোটি লোকের জন্য নির্বাচিত প্রতিনিধির সংখ্যা হলেন সাত জন, কিংবা ধরুন দশ জন—যদি বে-সরকারী মনোনীত প্রতিনিধিদেরও ধরা যায়, বা কুড়ি জন, যদি সমস্ত আইনসভাটি প্রদেশকে প্রতিনিধিত্ব দিচ্ছে বলে ধরে নেওয়া যায়। ফলে হচ্ছে কি, নির্বাচন এক সঙ্গে হচ্ছে না, হচ্ছে পর্যায়ক্রমে, তাতে সম্পূর্ণ বিভাগগুলি অনির্বাচিত থেকে যাচ্ছে। বাংলাদেশের ছটি বিভাগের মধ্যে বর্তমানে সবচেয়ে প্রধান যেটি সেই প্রেসিডেন্সি বিভাগ, ছোটোনাগপুর এবং উড়িষ্যা বিভাগ থেকে কেউই প্রতিনিধিত্ব করছেন না। আমি জানি এরকম ব্যবস্থাপনায় ত্রুটি আছে এবং অন্যত্র যেরকম ভাবে করা হয় সেরকম সমস্ত বিভাগগুলিকে যদি এক করে নির্বাচন করা যায়, তাহলে সমস্ত প্রদেশে একই সঙ্গে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে পারে। কিন্তু মিঃ গ্ল্যাডস্টোনের কথা, সত্যিকারের প্রতিনিধিত্ব, কিংবা লর্ড সলস্‌বেরি যা চেয়েছিলেন তা, অর্থাৎ সমগ্র জনগণের প্রতিনিধিত্ব, ছোটোখাটো দলের প্রতিনিধিত্ব নয়, এমন করা কি আইন সভাগুলির সদস্য সংখ্যা না বাড়িয়ে কোনো ক্রমেই সম্ভব?

## ২। অর্থ

যদি আপনারা আইনসভাগুলিকে গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করেন, তাহলে আপনাদের অর্থ প্রশাসনের মেরুদণ্ড স্বরূপ। জন ব্রাইট তাঁর এক বক্তৃতায় বলেছিলেন, আমাকে যদি কোনো দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা কি

বলতে পারেন তাহলে আমি সেই দেশের সরকার এবং জনসাধারণ সম্পর্কে সমস্ত কথাই বলে দিতে পারব। সবচেয়ে বড় পরীক্ষা হল অর্থের। এই মানদণ্ডে বিচার করলে দেখা যায় আমাদের অবস্থা অতি জঘন্য। একথাটা বললে বাড়িয়ে বলা হবে না যে ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক অবস্থা হল ক্রমাগত ঘাটতি এবং হাওলাত বৃদ্ধি। আমি একটা কথা বলার জন্য দুঃখিত, যে কথাটা বললে ভারত সরকারের অসুবিধেগুলো সম্পর্কে বিরাট বাড়িয়ে দেখানো হয়। ব্যাপারটাকে হালকাভাবে দেখার প্রয়োজন নেই, কিংবা কুৎসা করার মনোভাব নিয়েও বলবার প্রয়োজন নেই। কিন্তু আমার মনে হয় যদি বলি যে আমাদের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থা ধার এবং ঘাটতিতে ভরা তাহলে আমি সত্যের অপলাপ করছি না। আমি যখন ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এই ষাট বছরের অর্থনৈতিক ইতিহাস খুব তাড়াতাড়ি একবার দেখে যাব তখন আমি আপনাদের অনুরোধ করব সেগুলিকে ঠিকমত অনুধাবন করতে। এই সময়ের মধ্যে আপনাদের ৩৪ বছর ঘাটতি হয়েছে, যার পরিমাণ ৮৩ কোটি টাকা, আর ২৬ বছর উদ্বৃত্ত থেকেছে, যার পরিমাণ ৪২ কোটি টাকা—এগুলো সবই মোটামুটি হিসাব। এতে আসলে দাঁড়াল এই যে হরেগড়ে ৪১ কোটি টাকা ঘাটতি হল, অর্থাৎ বছরে ঘাটতির পরিমাণ পঁয়ষট্টি লক্ষ টাকা। আমাদের ঋণও আমাদের ঘাটতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলেছে। তারা হল দুই যমজ বোন একই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটেছে। এরকমই আসলে ঘটে। ক্রমাগত ঘাটতি বেড়ে গেলে ক্রমাগত ঋণ বেড়েই যায়। ঐ একই সময় জনসাধারণের ঋণ ২৬ কোটি থেকে ২১০ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। এরমধ্যে ৪২ কোটি টাকা ঋণ হয়েছে মাত্র গত দশ বছরে। আমরা যদি এখনো দেউলে না হয়ে গিয়ে থাকি তাহলে সেই দিকেই চলেছি। যদি একজন সাধারণ ব্যক্তি দেখত তার খরচ ক্রমাগত বেড়েই চলেছে, তার আয় সেই পরিমাণে বাড়ছে না, তার যা সম্পদ তা থেকে আর কিছু আয় বাড়ানো সম্ভব নয়, তার ঋণ দ্রুত বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে তাহলে তার মনে হবে দেউলিয়া হতে তার আর দেরি নেই। কিন্তু আমার মনে হয় সরকারগুলো ঠিক সাধারণ

মানুষের মত নয়, তাদের সাধারণ মানুষদের মত বোধ শক্তি নেই, ব্যর্থতা নেই, সে জন্যই আমাদের শাসকেরা এতখানি আশাবাদী।

কি কারণে আমাদের অর্থনীতির এই বিশ্রী অবস্থা ঘটেছে? উত্তর এই যে, সরকারের আগ্রাসী সমরনীতি এর প্রধান কারণ। টাকার ক্রয়শক্তি হ্রাসও একটা বড় কারণ। সরকারের আরো নানা দোষ আছে, যা করেছেন এবং করেননি, তবে বর্তমান অর্থনৈতিক বেসামাল অবস্থার জন্য সরকারকে এইসব কারণে প্রধানত বা পুরোভাবে দায়ী করা চলে না। নাইনটিনৃথ সেঞ্চুরী নামক কাগজে সার অকল্যাণ্ড কলভিন একটি সাম্প্রতিক প্রবন্ধে বলেছেন যে ১৮৮৩-৮৪ থেকে ১৮৯২-৯৩ সাল পর্যন্ত এই ক'বছরে ভারতের খরচ বেড়েছে এগারো কোটি টাকা—তার তিনটি কারণ, আর এর মধ্যে সামরিক খাতে খরচই সবচেয়ে বেশি ( দি নাইনটিনৃথ সেঞ্চুরীর নভেম্বরের সংখ্যা, ৮৭৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য )। ঐ একই প্রবন্ধে তিনি আরো বলেছেন : "ভারতীয় অর্থনীতির উন্নতি কিছুতেই হতে পারে না যতদিন না সীমান্ত বাড়ানোর দাবি কিংবা যুদ্ধের সম্ভাবনা এবং প্রয়োজন থাকবে।"

## ৩। যন্ত্রশিল্প

আমাদের দল হল রাজনৈতিক, কিন্তু আমরা আমাদের যন্ত্রশিল্প এবং উৎপাদন দ্রব্য সম্পর্কে অবহেলা করতে পারি না। একটি জাতির অর্থনৈতিক অবস্থার সঙ্গে তার রাজনৈতিক অগ্রগতির নিবিড় সম্পর্ক থাকে। ব্যাপারটা যদি আমরা এই ভাবে দেখি তাহলে যন্ত্রশিল্পকে রক্ষা করা আমাদের কর্তব্য। সেগুলিকে চালু রাখা জাতির পক্ষে একটা জরুরী বিষয়। বোম্বাইতে রয়েছে আমাদের বস্ত্রশিল্প, বাংলাদেশে রয়েছে পাট, আসামে চা, কয়লা এবং লোহা রয়েছে মধ্য এবং দক্ষিণ ভারতে। কারখানা আইন, যা কিনা এতদিন জানা ছিল যারা সেখানে কাজ করে তাদের সুবিধের জন্য করা হয়, কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে তার একমাত্র উদ্দেশ্য হল উৎপাদনের খরচ নিয়ন্ত্রণ এবং বৃদ্ধি। আমি এখন জানতে পেরেছি যে

"সেক্রেটারি অব ষ্টেটের উপর চাপ দেওয়া হবে যাতে আমাদের দেশীয় লোকের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি না দিয়ে এমন একটা কারখানা আইন চালু করার ব্যবস্থা হয় যাতে ইংল্যাণ্ডের কলের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় আমাদের কলগুলি হেরে যায়।" ল্যাঙ্কাশায়ারএর লোকেরা যারা বস্ত্রশিল্পে রয়েছে তারা ভারতবর্ষের বস্ত্রশিল্পকে আক্রমণ করেছে—দাবি করেছে কারখানা আইন আরো কড়া করা হক, কারখানায় কাজের সময় কমিয়ে দেওয়া হক, এরফলে যে ভারতীয়দের নির্ঘাৎ ক্ষতি হবে সে বিষয়ে তাদের কোনো চিন্তাই নেই। আরো একটা জিনিস তাঁরা দেখছেন যে এর মধ্যেই জাপান ভারতবর্ষ এবং ইংল্যাণ্ড উভয়েরই প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠেছে। এছাড়া আমাদের পাট শিল্পেরও ডাণ্ডীর পাটকলওয়ালাদের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, কেননা তারা বলেছে যে ভারতীয় পাটকলের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় তাদের ক্ষতি হচ্ছে। তারা একটা জিনিস ভুলে যায় যে ইউরোপ মহাদেশে বহু পাটকল আছে, কিন্তু ভারতীয় কলের দিকেই তারা ছুটে যায় কেননা সেগুলি বৃটিশ সরকারের অধীন।

## ৪। অর্থের অপচয়

আমার মনে হয় আমাদের দেশের লোককে সরকারী ক্ষেত্রে আরো বেশি চাকুরী দেওয়ার ব্যাপারটা মোটামুটি অর্থনৈতিক। জনসাধারণের দুর্দশার সঙ্গে এটি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। দাদাভাই নওরোজির তাই বক্তব্য, এবং অধুনা মৃত রবার্ট নাইট, যাঁর মত দক্ষ অর্থনীতিবিদ বা বড় ভারত-হিতৈষী দুর্লভ, তাঁরও এই মত ছিল। এই ব্যাপারে যেসব বিষয় নিয়ে বিবেচনা করা হয় তা অতি স্পষ্ট। সরকারী কাজে যতই বিদেশী থাকবে তাদের বিদেশে কাজ করবার জন্য নিশ্চয়ই বেশি মাইনে দিতে হবে, ফলে যে খাল দিয়ে অর্থ দেশ থেকে বেরিয়ে যায় সেই খালকে আরো বড় করা হয়, সেই খালে আরো অর্থ ঢালা হয়—যে খাল গত একশো বছরেরও বেশি ধরে চালু আছে। বর্তমান যা অবস্থা তাতে খালটিকে থাকতেই হবে। সরকারী অফিসাররা যে মাইনে পান তার একটি অংশ তাঁদের স্ত্রী

পুত্র কন্যাদের ভরণপোষণের জন্য দেশের বাইরে পাঠানো হবেই, আর যখন তাঁরা কর্ম থেকে অবসর গ্রহণ করবেন, তাঁদের সমস্ত পেনশন বাইরেই খরচ হবে, যা এদেশে খরচ হবে তার পরিমাণ অতি নগন্য। তার অর্থ হল এই পরিমাণ ঐশ্বর্য থেকে দেশ বঞ্চিত হবে, যেটাকে কিছুতেই সমর্থন করা যায় না, আমাদের দেশ থেকেই যদি চাকুরেদের অধিকাংশকে সংগ্রহ করা হত তাহলে আর এই ক্ষতি হত না। একটি দেশের সরকারী কাজে বিদেশীদের নিয়োগ, যাদের মাইনের টাকা বাইরে পাঠিয়ে দেবার সম্ভাবনা নীতির দিক থেকে ভুল, অর্থনীতির দিক থেকে চরম ক্ষতিকর, আর রাজনীতির দিক থেকে অসমর্থনীয়, যদি না দেখা যায় যে অন্য দিক থেকে এই ক্ষতিপূরণ হচ্ছে কিংবা বিদেশীদের নিয়োগ করায় যে ক্ষতি হচ্ছে পরে তার ফল ভাল হবে। তবেই বিদেশীদের নিয়োগ সমর্থন যোগ্য। ( হর্ষধ্বনি )

## ৫। সরকারী কাজে ভারতীয় নিয়োগ

সরকারী যে কোনো বিভাগেই হক না কেন সমস্ত প্রতিযোগিতা-মূলক পরীক্ষায় আমাদের গ্রহণ করবার দাবী জানাই। আমরা ভারতবর্ষে এবং ইংল্যাণ্ডে যে পুলিস বিভাগে কর্মচারী নিয়োগের পরীক্ষা হয় সেই পরীক্ষায় প্রবেশাধিকারের দাবি জানাই। বন বিভাগের উচ্চ পদে নিয়োগের জন্য যে পরীক্ষা হয় সেই পরীক্ষায় প্রবেশাধিকার চাই। এইসব পরীক্ষা দেওয়া থেকে আমাদের বঞ্চিত করে রাখা হয়েছে, কারণ আমরা হলাম গিয়ে ভারতবর্ষের লোক ( লজ্জার কথা )। আমাদের জাতই হল গিয়ে অযোগ্য। আমাদের বর্ণ হল আমাদের অপরাধ। দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা যে জাতে জন্মেছি সেই জাতের কোনো যোগ্যতা নেই বলেই ধরে নেওয়া হয়। কিন্তু ভারতবর্ষে প্রচুর জাতির বাস ( হাস্য ধ্বনি ), তারা সকলেই কি একই অযোগ্যতায় ভুগছে? সরকারী চাকুরীর জন্য যেসব মূল্যবান যোগ্যতার প্রয়োজন তাদের কারুরই কি সে যোগ্যতা নেই? কেননা নিষেধাজ্ঞা সকলের উপরেই জারি করা হয়েছে। এইভাবে

আমাদের উপর দোষারোপ করা হয়েছে। কিন্তু আমরা আমাদের জাতিত্বের জন্য লজ্জা বোধ করি না। আমরা ভারতবাসী বলে গর্ববোধ করি, আমাদের কেউ কেউ সেই সভ্যতার বাহক যা মানুষের সভ্যতার প্রথম আলো দেখিয়েছিল। (ঠিক! ঠিক!) এবং আমরা বৃটিশ প্রজাও বটে। প্রাচীনকালে রোমের প্রজা হয়ে লোকে গর্ববোধ করত। আমরাও নিজেদের বৃটিশ প্রজা হওয়ার সুযোগ পেয়ে গর্বিত বোধ করি এবং আমরা এর যে রাজনৈতিক অধিকার কেবল তার দাবি করছি (হাত তালি)। আমরা এ ব্যাপারে নিশ্চিত যে ইংরেজরা তাদের এই বিরাট সাম্রাজ্যে অপমানজনক জাতিভেদ প্রথা যা এতকাল চলে আসছে তা আর রাখবেন না। তাঁরা তো স্বাধীন, তাঁরা সকলে সমাজ অধিকার এবং সুবিধে ভোগ করেন, তাঁদের সহজাত প্রবৃত্তি হবে অন্যদেরও সেই আশীর্বাদ বণ্টন করা, যা তাঁদের এত মহান, সুখী এবং সমৃদ্ধশালী করেছে (হাত তালি)।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা উল্লেখ না করে পারা যাচ্ছে না, সেটা হল সৈন্য বিভাগের বড় পদে আমাদের দেশের লোককে বাদ দেওয়া হয়েছে। সবচেয়ে সাহসী দেশী সৈন্য, জন্ম থেকেই যে যোদ্ধা, তার হয়ত বিরাট ক্যাপ্টেন হবার মত সম্ভাবনা রয়েছে, সে আজ বৃটিশ বাহিনীতে সুবেদার মেজর বা রিসেলদার মেজর-এর বড় কিছু হতে পারে না। আজ শিবাজী, হায়দার আলি, রঞ্জিৎ সিং, মাধোজী সিন্দিয়া একটি রেজিমেণ্টের কর্ণেল কিংবা কম্পানীর ক্যাপ্টেন হতে পারবেন না (হাস্য ধ্বনি)। এইভাবে সমগ্র জাতিকে একঘরে করে রাখা, এইভাবে ভারতবর্ষের সামরিক জাতিকে সামরিক বিভাগের উচ্চ পদ থেকে বঞ্চিত করার ফলে সাম্রাজ্যের শক্তি বা স্থায়িত্ব এই দুইই দুর্বল করবে।

## ৬। কংগ্রেস ও কংগ্রেসী

আজ হচ্ছে কংগ্রেসের একাদশতম অধিবেশনের প্রথম দিন। কংগ্রেসের বহু অধিবেশন এখনো হবে তবে আমাদের সামান্য কর্মসূচী রূপায়িত হতে পারবে। মানুষের অগ্রগতির শকটের গতি অতি ধীর।

কিন্তু যে লাঙ্গল হাতে নিয়েছে তার পক্ষে পেছনে তাকানোর সময় থাকে না। সে শক্তি ক্ষয় করবে এবং এইভাবেই সে শেষ হয়ে যাবে। আমাদের কত সাহসী কমরেড এইভাবে তাঁদের জীবন দিয়েছেন। তাঁদের জন্য আমরা শোক প্রকাশ করি। এই বিপদসঙ্কুল মরু পথে আরো কত লোককে প্রাণ দিতে হবে যত দিন না আমরা আমাদের আকাঙ্খিত ভূমিতে পোঁছুতে পারি। বিশ্বাস এবং আশার দ্বারা উন্নীত, আমাদের মধ্যে কোনো কোনো লোক সেই আকাঙ্খিত ভূমিকে প্রত্যক্ষ করবেন, যেমন করেছিলেন পুরনো আমলে সিনাই পর্বতের উপর থেকে মোজেস্। ঠিক তেমনি ভাবে ভগবানের আশীর্বাদে ভবিষ্যতে আমাদের দেশের শাসন কেমন ভাবে চলবে তার একটা রূপ পাওয়া যাবে ইংরেজের শাসনে, যেখানে সামাজিক এবং রাজনৈতিক অধিকার স্বীকৃত। আর বাকি যাঁরা রইলেন তাঁদের আত্মাকে শান্ত রাখবেন, ফলাফলে রাখবেন অক্ষয় বিশ্বাস, সবচেয়ে বড় বিচারকে ভিত্তি করলে তা একদিন না একদিন জয়যুক্ত হবেই। জন ষ্টুয়ার্ট মিল তাঁর নির্বাচিত প্রতিনিধির সরকার নামক প্রবন্ধে লিখেছেন, "একজন যার সত্যিকারের বিশ্বাস আছে সে অবিশ্বাসী নিরানব্বই জনের সমান।" আন্তরিক বিশ্বাসসম্পন্ন ব্যক্তিকে দমন করা যায় না, সে সমস্তকেই জয় করতে পারে। আমরা কংগ্রেসীরা জানি আমাদের কি করতে হবে, আমরা জানি আমরা কি ভাবছি, আমরা জানি আমরা কি উপায়ে কাজ করব, আমরা উদ্দেশ্যের প্রচণ্ড দৃঢ়তায় সেই কাজ সম্পন্ন করব। এমন একটা বিশ্বাস আমাদের কারুর কারুর থাকবে যা আমি বলব এই পৃথিবীর নয়, স্বর্গীয়। আর কে বলবে ভবিষ্যৎ আমাদের নয়? (ঠিক, ঠিক!)

আমরা মনে করি আমরা এই যে বিরাট আন্দোলনে রত রয়েছি, তার জন্য সভ্য জগতের নীতিগত সমবেদনা আমাদের সঙ্গে রয়েছে। সমস্ত পৃথিবীর সৎ এবং সত্যের জন্য প্রার্থনা আমাদের পেছনে রয়েছে। পৃথিবীর জনগণ গঙ্গার তীরের লোকদের মুক্তির কথা শুনলে সেটাকে আনন্দজনক সংবাদ হিসাবে অভ্যর্থনা জানাবেন। কারণ, তাঁরা আমাদের প্রাচীন

সভ্যতার কথা পড়েছেন, তাঁরা পড়েছেন কেমন করে সাতটা পাহাড়ের ধারে অনন্ত নগরী ( রোম ) তৈরি হবার আগেই, আলেকজাণ্ডার টাইগ্রিস নদীর তীরে অভিযান সুরু করার আগেই, ব্যাবিলনের জ্যোতিবিদেরা তারকা-খচিত জগতের দিকে তাকানোর আগেই সভ্যতার প্রথম আলোর মধ্যে আমাদের পূর্ব পুরুষেরা একটা মহান সভ্যতার সৃষ্টি করে গিয়েছেন, এবং সেই সভ্যতা মানুষের সবচেয়ে বড় বড় ব্যাপারে, আধুনিক চিন্তাকে কেমন ভাবে প্রভাবিত করেছে। সবচেয়ে বড় কথা, আমরা বৃটিশ জনসাধারণের বিচার এবং দাক্ষিণ্যে সর্বতোভাবে বিশ্বাস করি, বিশ্বাস করি তাঁদের পার্লামেণ্টের প্রতিনিধিদের। ( প্রবল হর্ষধ্বনি )

# পরিশিষ্ট-২

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত পুনা কংগ্রেস অধিবেশনে প্রদত্ত শেষ ভাষণের অংশ বিশেষ

ভদ্রমহোদয়গণ, আমার মনে কেবল দুঃখ এই যে, আপনাদের সেবায় আমার কণ্ঠস্বর আজ ভগ্ন—আর এই সময়েই আপনাদের কাছে গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবার জন্য আমার মন বিশেষ ভাবে উদ্বেল হয়ে উঠছে। এই যে ঘটনা ঘটছে তার ফলে আমি আমার অনুভূতির কাছে হার মেনে যাচ্ছি। আমি বৃথাই ইংরিজী ভাষার অফুরন্ত ভাণ্ডারে খুঁজে বেড়াচ্ছি সেই কথা যে কথায় আমার গভীর ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা আপনাদের কাছে ঠিক ভাবে প্রকাশ করতে পারতাম। যদি আমি কেবল এই মুহূর্তের জন্য, মাত্র এই সময়ের জন্য বেঁচে থাকতাম, তারপর আমার মৃত্যু হত তাহলে আমি নিজেকে সবচেয়ে বেশি সুখী মনে করতাম। আমি জানি আপনারা আমার দীর্ঘজীবন কামনা করেন। ("হ্যাঁ, হ্যাঁ" ধ্বনি) আপনারা সেই অনুভূতিকে যথেষ্ট প্রকাশ করেছেন। আমার জীবন দীর্ঘ হবে কি ছোট হবে—সে যাই হক না কেন, আমি সর্বশক্তিমান ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন আমার এই ঘোষণা করার সময় সাক্ষী থাকেন যে আমি সমস্ত ভারতবর্ষের চোখের সামনে বলছি যে আমার জীবন আপনাদের সেবায় নিয়োজিত করলাম। (প্রচণ্ড প্রশংসা ধ্বনি) হ্যাঁ, এই জীবন সেই সব আশা আকাঙ্খার জন্য উৎসর্গীকৃত হবে যে সব আশা, মনোভাব আমার দেশ যুক্তভাবে, মহানভাবে পোষণ করেছে। সর্বশক্তিমানের পদতলে আমার শেষ প্রার্থনা এই যে আমাদের যেন রাজনৈতিক স্বাধীনতা হয়, আমার দেশ যেন ভোটাধিকার পায়, সেই দেশ

যেন স্বাধীন রাষ্ট্রগুলির অন্যতম একটি হয়, যে রাষ্ট্রগুলির পত্তন হয়েছে ইংল্যাণ্ডের সাহায্যে, যাদের চরিত্র ইংরেজদের মত, যারা ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িত। ভদ্রমহোদয়গণ, আমি জানিনা আমি এবং আমার প্রতিনিধিভ্রাতাগণ আপনাদের আশ্চর্য আতিথেয়তার জন্য কেমন করে ধন্যবাদ জানাব। কংগ্রেসের আতিথেয়তার ইতিহাসে এমনটি আর কখনো হয়নি। আমি আমার বাড়িতে, পৃথিবীর মধ্যে যাঁদের আমি সবচেয়ে বেশি ভালবাসি, সেই প্রিয়জন পরিবৃত হয়ে থাকলেও, এর চাইতে বেশি আরামে থাকতে পারতাম না। আমার চারপাশে সমস্ত দিন এবং সমস্ত রাত্রি ধরে যারা হাসি মুখে আমাকে পরিচর্যা করছে তাঁদের এই নিষ্ঠার ফলে আমার কোনোরকম অসুবিধে হয়নি। তরুণগণ, আমি কেমন করে সেই বশ্যতা, সেই আত্মীয়তা ভক্তি যা তোমরা স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছ তার বর্ণনা দেব, তা দেওয়া আমার সাধ্য নয় ( প্রচণ্ড প্রশংসা ধ্বনি )। তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ পুনার সবচেয়ে বড় পরিবার থেকে এসেছ, সেই পরিবার যাঁরা সেই পুরনো দিনের মারাঠা স্বাধীনতার স্মৃতির ধারক ("ঠিক, ঠিক!" এবং হাততালি)। তোমরা আমাদের যেন ভৃত্যের মত সেবা করেছ। আর সেই প্রেরণার উদ্দেশ্য কি? কি কারণে তোমরা এমন করেছ? হাততালি পাবার লোভে নয় নিশ্চয়, ( না, না! ) লোক দেখানোর জন্য নয়—এমনকি আতিথেয়তার ভাবপ্রবণতায় নয়, গুরুজন এবং বয়সে বড় এই কারণেও নয়। কারণ এই যে এই কাজকে তোমরা নিজেদের কাজ বলে মনে করেছ ( প্রশংসা ধ্বনি ), এই কারণে করেছ যে এই কাজ করলে তোমাদের নিজেদেরই উপকৃত হবার সম্ভাবনা। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ কংগ্রেসের কাজ করতে করতে চুল পাকিয়ে ফেলেছি। আমি যখন প্রথম কংগ্রেসে যোগ দিই তখন আমার বয়স ছিল কম। এখন বহু বছরের প্রান্তর পার হয়ে জীবনের সায়াহ্নে উপস্থিত হয়েছি। আমাদের কাজের বোঝা তোমাদের উপর ন্যস্ত হবে, আর সেই কাজ, যে কাজ আমরা সুরু করেছি, যা আমরা তেমন ভাল ভাবে করতে পারিনি, তোমাদের উপর তার ভার দেওয়া হবে। ( হর্ষধ্বনি )

আমরা পুরনো কালের যে ঐতিহ্য বহন করেছি তা তোমাদের উপর ছেড়ে দেওয়া হবে তাকে রক্ষা করার জন্য, তোমাদের এবং তোমাদের সন্ততিদের উপকারের জন্য, তোমাদের পরেও যাতে বহু পুরুষ ধরে তারা ভোগ করতে পারে সেই জন্য। ( হর্ষধ্বনি )

# পরিশিষ্ট-৩

## ১৯০২ খৃষ্টাব্দে প্রদত্ত আহমেদাবাদ কংগ্রেসে সভাপতির অভিভাষণের অংশ বিশেষ

### ১। ভারতীয় যন্ত্রশিল্প

যন্ত্রশিল্প আন্দোলন আজ জাতীয় আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে গভীর খাতে প্রবাহিত হচ্ছে। এই আন্দোলনটি বড় আন্দোলনের একটি অংশ। চারুশিল্প এবং যন্ত্রশিল্পকে গড়ে তোলা এবং বড় করার ব্যাপারে একটা ব্যাপক আগ্রহ দেখা দিয়েছে। গত বছরে কলকাতা কংগ্রেস অধিবেশনের সঙ্গে যে যন্ত্রশিল্প প্রদর্শনী হয়েছিল, সেই প্রদর্শনীর প্রধান প্রধান ব্যক্তিরা তাঁদের এই উচ্চ প্রচেষ্টাকে একটা ভারতীয় জিনিসপত্রের দোকান খুলে আরো এগিয়ে নিয়ে গেছেন। আমাদের শিশু যন্ত্রশিল্পের রক্ষণাবেক্ষণ প্রয়োজন। কিন্তু সরকার স্বাধীন বাণিজ্য নীতি থেকে কিছুতেই নড়বেন না, তাই তাঁদের সাহায্যও করবেন না। যদি আইনসঙ্গতভাবে রক্ষা করা সম্ভব না হয়, তাহলে আমরা কি দেশের ইচ্ছায় আমাদের সাধ্যমত যেখানে এবং যতখানি সম্ভব ততখানি বিদেশী জিনিস পরিত্যাগ করে দেশীয় জিনিস ব্যবহার করে দেশের শিল্পকে রক্ষা করব না? দেশের বিচ্ছিন্ন অনুভূতিগুলিকে এক সঙ্গে করে নিয়ে একটি সজীব এবং সুশৃঙ্খল উপায়ে আমাদের যন্ত্রশিল্পকে সাহায্য করার জন্য প্রচণ্ড চেষ্টা করার সময় কি আসে নি? আমরা কি যেসব প্রয়োজনীয় ভারতীয় জিনিস পাওয়া যায় সেগুলির সম্পূর্ণ তালিকা এবং বিবরণ সংগ্রহ করে সেগুলি আরো ব্যাপক ভাবে প্রচার করতে পারি না? আমি স্বীকার করি তা করতে গেলে যথেষ্ট খরচের দরকার। কিন্তু রক্ষা করতে গেলে বর্তমানে অর্থের মায়া কিছু

পরিত্যাগ করতেই হয়, তবেই ভবিষ্যতে লাভবান হওয়া যায়। আর যদি আমাদের দেশী শিল্প একবার দাঁড়িয়ে যায় আমাদের নৈতিক পাহারায়, আমাদের দেশপ্রেমের মহান আত্মশক্তিতে, তাহলে এক সময় আসবে যখন তা থেকে প্রচুর সোনার ফসল পাওয়া যাবে। দেশকে মহান করবার জন্য এবং দেশের আদর্শের জন্য যা কিছুই ত্যাগ করা হক না কেন তার পরিবর্তে সুদে আসলে সব ফেরৎ পাওয়া যায়। প্রকৃতির সেই ধর্ম, ভগবান সেভাবেই সমস্ত ব্যবস্থা করেন, আর আমরা এখন যে সমস্ত হারিয়ে যাওয়া শিল্পকে পুনরুদ্ধারের জন্য এবং নতুন শিল্পকে গড়ে তুলবার জন্য যে ত্যাগ করব তার বদলে আমরা ফিরে পাব একশো গুণ– আমরা নিজেদের অভাব নিজেরা মেটাব আর আমাদের দেশ থেকে যে অর্থ বেরিয়ে গিয়ে আমাদের দেশবাসীকে প্রচণ্ড দারিদ্র্যে ঠেলে দিয়েছে সেই অর্থকে যথাসম্ভব বাইরে যেতে না দিয়ে ধরে রাখবার চেষ্টা করব। আমাদের রাজনৈতিক অক্ষমতার চাইতেও বেশি অসহায় অবস্থা হল আমাদের যন্ত্রশিল্পের।

## ২। ভারতের দারিদ্র্য

আমাদের দেশ কি দিনকে দিন দরিদ্রতর হচ্ছে? এই প্রশ্নের উত্তর ঠিকমত পাওয়া যাবে যদি সরকারের তত্ত্বাবধানে একটা অনুসন্ধান কমিটী গঠিত হয়। এরকম অনুসন্ধান করা হয় না কেন? আমাদের সরকারের তো কমিটী আর কমিশন গঠন করা ছাড়া আর কোনো কাজ আছে বলে মনে হয় না। সব রকম কমিশন আমাদের হয়েছে। যদি দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা দেখবার জন্য আর একটা কমিশন বসানো যায় তাহলে অবস্থা এমন কিছু খারাপ হবে না যাতে শাসনযন্ত্র একেবারে বিকল হয়ে পড়বে। ইংল্যাণ্ডের দুর্ভিক্ষ ইউনিয়ন যেখানে সমস্ত দল থেকে লোক নেওয়া হয়, এর উদ্দেশ্য রাজনৈতিক নয়, অর্থনৈতিক। তাঁরা কতকগুলি বিশেষ গ্রাম বেছে নিয়ে অনুসন্ধান করার জন্য চাপ দিচ্ছেন। কোনো শত্রু মনোভাবাপন্ন হয়ে তাঁরা এই চাপ দিচ্ছেন তা নয়। তাঁদের উদ্দেশ্য ত্রুটি খুঁজে বার করা নয়, সত্য অনুসন্ধান করা। এই ইউনিয়ন এটা বার

করবার চেষ্টা করছেন যে কৃষকদের ঋণ কি বর্তমানে ক্রমাগত বেড়েই চলেছে ? কিন্তু সরকার তার উত্তরও দেবেন না, অনুসন্ধানও করবেন না। কিন্তু যাকে সবচেয়ে বড় সমস্যা বলা যায় সেই সমস্যার সমাধানের ব্যাপারে অনুসন্ধান করতে সরকার কেন অস্বীকার করছেন ? এই সরকার কি বিশ্বাস করেন যে এরকম একটা অনুসন্ধান চালানো হলে নিজেরা যে আশাকে ধর্ম করেছেন সেই আশার কি পরিসমাপ্তি ঘটবে ? এটা তো বলা যায় না যে এ ব্যাপারে সরকার কিছুই জানেন না, কিংবা এই সমস্যার গভীরতা সম্বন্ধে তাঁরা অবজ্ঞা করেন। দুবার এই নিয়ে তাঁরা গোপনে অনুসন্ধান চালিয়েছেন—লর্ড রিপন ১৮৮০-৮১ খৃষ্টাব্দে একটা অনুসন্ধান করান। সার ডেভিড বারবোরকে তার ভার দেওয়া হয়েছিল। তারপর লর্ড ডাফরিন যখন বড়লাট ছিলেন তখন আবার একবার অনুসন্ধান করা হয়। এই অনুসন্ধানগুলির ফলে বৃটিশ শাসনে দেশ দরিদ্রতর হচ্ছে কিনা তার স্বপক্ষে বা বিপক্ষে নিশ্চয়ই কিছু প্রমাণ পাওয়া গেছে। যদি অভিযোগ অপ্রমাণিত হয়ে থাকে তাহলে শাসকদের বিরুদ্ধে এত বড় অভিযোগের খণ্ডনের কথা তাড়াতাড়ি প্রকাশ করাই তো স্বাভাবিক, আর যদি এই অভিযোগ অপ্রমাণিত না হয় তাহলে তাদের দখলে যে প্রমাণগুলি রয়েছে সেগুলি যাতে প্রকাশিত না হয় সেই চেষ্টা করাই তো তাঁদের পক্ষে স্বাভাবিক। জনসাধারণের কাছ থেকে এইসব অনুসন্ধানের সাক্ষী এবং প্রমাণ, যার উপর ভিত্তি করে ফলাফল নির্ধারিত করা যায়, গোপন রাখার ফলে অর্থনৈতিক অবস্থা যে খুব মনোরম তা মনে হয় না। এই ধারণা আরো জোর পায় যখন দেখি খোলাখুলি অনুসন্ধানের ব্যাপারে তাঁরা ক্রমাগত অস্বীকার করে চলেছেন, আর ফলে এটা প্রায় প্রমাণ হয়েছে বলেই ধরে নিতে হয়, আর সেটাকে উড়িয়ে দেওয়া চলে না।

## ৩। নতুন সাম্রাজ্যবাদ

সাম্রাজ্যবাদ পথকে রুদ্ধ করে। সাম্রাজ্যবাদ এখন হল সর্বেসর্বা। সাম্রাজ্যবাদ সব সময়েই একনায়কত্বের অর্থে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে—হয়

কোনো ক্ষমতার অপব্যবহারকারী রাজা, কিংবা কোনো জয়ী সেনাধিনায়ক যিনি ক্ষমতা অধিকার করে নিয়েছেন। আজকের দিনের ফ্রান্সের মত প্রাচীন রোমে সাম্রাজ্যবাদ বলতে বোঝাতো জনপ্রিয় সরকারকে দাবিয়ে দিয়ে একনায়কত্ব সৃষ্টি। এর অর্থ হল বৃটেন এবং উপনিবেশের পক্ষে হবে স্বরাজ, কিন্তু সাম্রাজ্যের অন্যান্য জায়গায় হবে স্বৈরতন্ত্র। এরমধ্যে কি সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে তা বলা শক্ত। এরপরে যতদিন যাবে ততই গণতান্ত্রিক অধিকার হ্রাস পাবে কিনা তা জানার উপায় নেই, কেননা তা রয়েছে সময়ের অন্ধকারে—সে সম্পর্কে খুব বিশ্বাসের সঙ্গেও যদি ভবিষ্যদ্বাণী করা যায় তাও ব্যর্থ প্রমাণিত হতে পারে। কিন্তু ইতিহাসের সর্বক্ষেত্রেই দেখা যায় যে অধিকৃত জাতির কাছ থেকে দেশ এবং ক্ষমতা কেড়ে নিলে আর তা গণতান্ত্রিক সরকার থাকে না। যাক ভবিষ্যৎ নিয়ে দুশ্চিন্তা করে লাভ নেই। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের অর্থই হল সম্রাটের ইংরিজী ভাষা ভাষী প্রজাদের মধ্যে আরো নিবিড় যোগাযোগ। আমরা এই যোগাযোগের বাইরে। এর মধ্যেকার শান্ত স্বাধীনতার কাছে যাওয়ার পথ আমাদের পক্ষে বন্ধ। এইসব পবিত্রময় স্থানে আমাদের স্থান নেই। দূর থেকে দেখা এবং সেবা করার অনুমতি কেবল আমাদের মিলেছে মাত্র। সাম্রাজ্যের অংশ হিসেবে আমরা আমাদের সৈন্যদের দক্ষিণ আফ্রিকায় পাঠিয়েছি, আর আমাদের সৈন্য পিকিং-এর দেয়ালে সম্রাটের পতাকা উড়িয়েছে। আমাদের বশ্যতা এত খাঁটি, গভীর আর এমন তীব্রভাবে বাস্তব অথচ এমনকি সেক্রেটারি অব ষ্টেটেরও সে বিষয়ে কোনো ধারণা নেই। কিন্তু ঘটনা যাই হক না কেন সাম্রাজ্যের সন্তান আমরা অথচ এখানে আমাদের এই নিয়মতান্ত্রিক অধিকার নেই।······ভারতবর্ষে সাম্রাজ্যবাদ প্রতিক্রিয়াশীলতার কাছ থেকে শক্তি সংগ্রহ করেছে, বাহ্যিক আড়ম্বর দিয়ে নিজেদের গড়ে তুলেছে, ফলে খরচ যেমন বাড়ছে, সেই সঙ্গে ভেতরকার সংস্কার থেকে মনযোগ অন্যত্র বিক্ষিপ্ত হচ্ছে। অতএব আমরা এই নতুন সাম্রাজ্যের এই চেহারাকে যা আমাদের চোখে দেখতে পাচ্ছি সেটাকে অভ্যর্থনা জানাব না। সাম্রাজ্যবাদীদের মধ্যে যাঁরা ব্যয়বহুল প্রদর্শনী করেন

অথচ আসামের চা বাগানের কুলিদের ক্রন্দন যাঁদের হৃদয় স্পর্শ করে না, যাঁরা আমাদের স্বার্থের চাইতে তাঁদের অন্য স্বার্থকে বেশি প্রাধান্য দেন, যাঁরা সাম্রাজ্যবাদের আসল কাজকর্ম না করে কেবল বাহ্যিক আড়ম্বরকেই বেশি মূল্য দেন তাঁদের চাইতে গ্ল্যাডস্টোনের উদারপন্থা, আভ্যন্তরীণ সংস্কার সম্বন্ধে যাঁর বহু চেষ্টা, ভারতবর্ষ সম্পর্কে ইংল্যাণ্ডের গভীর এবং পুরোপুরি দায়িত্ববোধ ইত্যাদি আমাদের কাছে অধিকতর গ্রহণযোগ্য।

## ৪। স্বাধীনতা

স্বাধীনতা একদিনে লাভ করা যায় না। স্বাধীনতাদেবী একটু ঈর্ষাপরায়ণ, তিনি চান তাঁর সেবক ক্রমাগত এবং বেশি মাত্রায় তাঁকে পূজো করে চলে। ইতিহাস পড়ো : তা থেকে অসাধারণ ধৈর্য তেজ আর বিধানসঙ্গত অধিকারের জন্য বিধানসঙ্গত আন্দোলন করে নিজেকে বলি দেবার শিক্ষা গ্রহণ কর। যে দেশের জনসাধারণ এই সব মহান গুণাবলীর পরিচয় পৃথিবীকে দিয়েছে তাদের কি এই শিক্ষা দেওয়ার আর প্রয়োজন আছে ? ভারতবর্ষের ইতিহাসের প্রতিটি পাতায় ত্যাগের পরিচয় ছড়ানো রয়েছে……। বর্তমান সম্পর্কে দায়িত্ব, ভবিষ্যতের জন্য আশা, অতীতের গৌরব এই সমস্ত মহানতম গৌরব আমাদের দেশকে সেবা করার জন্য আমাদের প্রত্যেককে প্রেরণা যোগাক।

# পরিশিষ্ট-৪

## অন্যান্য বক্তৃতা থেকে অংশ বিশেষ

## দেশীয় সংবাদপত্র আইন বিষয়ে[১]

প্রশ্নটি ভারতীয় প্রশ্ন নয়। প্রশ্নটির অনেকখানিই ইংরেজদের। প্রশ্ন এই নয় যে কিছু ভারতীয়ের ব্যক্তি স্বাধীনতা থাকা উচিত কি, উচিত নয়। প্রশ্নটির পরিধি আরো বড়, বিশাল, গভীর এবং সুদূরপ্রসারী। প্রশ্ন এই যে বৃটিশ ডমিনিয়নের কোথাও মহারাণীর প্রজাদের বাক্ স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রণ করা উচিত কিনা। আমরা এই অধিকারটা দয়া হিসেবে চাই না। আমরা এখন আর ইংল্যাণ্ডের অধিকৃত প্রজা নই। আমরা একটি স্বাধীন সাম্রাজ্যের অঙ্গীভূত দেশবাসী……। এই আইনটি ইংরেজদের সহজাত বুদ্ধির বাইরে, ইংল্যাণ্ডের সংবিধানের আশ্চর্য প্রতিভার বিরোধী।…… ইংরেজদের প্রভাবে ভারতবর্ষ ঘুম থেকে জেগেছে। বৃটিশ তত্ত্বাবধানে ভারতবর্ষের রক্ত দ্রুত চলাচল করছে। কিন্তু বর্তমান আইন তাকে দুর্বল করেছে, পক্ষাঘাতগ্রস্ত করেছে এবং তাকে পরাজিত করেছে।

## স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসন বিষয়ে[২]

আমি মনে করি স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসন হচ্ছে জাতীয় ( কিংবা, আমি কি এটা আশা করতে পারি ) ( বৃটিশ ) সাম্রাজ্যের ভেতরের স্বরাজের অগ্রদূত। স্বাধীনতার বীজ মানব জমিতে রোপন করলে তা বিরাট গাছে

১। এপ্রিল, ১৮৭৮

২। ফেব্রুয়ারী, ১৮৮২

পরিণত হতে চায়। সমস্ত জিনিসেরই উন্নতি হয়; প্রগতি হচ্ছে প্রকৃতিরই নিয়ম। সকলের চাইতে বড় হল স্বাধীনতার আদর্শের মধ্যে ছড়িয়ে পড়বার শক্তি রয়েছে। সেই নীতি যেন ক্রমশঃ বড় হয়ে ভারতীয় শাসনের প্রতিটি ক্ষেত্রে গিয়ে প্রভাব বিস্তার করে। সেই গৌরব খুব তাড়াতাড়ি আমাদের হবে কিংবা তা অনির্দিষ্ট কালের জন্য তোলা থাকবে, তা আমাদের উপর নির্ভর করবে—আমাদের দেশের জন্য আমাদের উৎসাহ এবং ভক্তি অনুযায়ী। দেশীয় সংবাদপত্র আইন রদ হওয়ায় আপনারা বুঝতে পেরেছেন আন্দোলনের সাহায্যে কি পাওয়া যেতে পারে। আপনাদের কাছে আমার এই উপদেশ—আন্দোলন করুন, আন্দোলন করুন, আন্দোলন করুন। আপনাদের এখনো খুঁতে খুঁতে হবার কৌশল অনেক শিখতে হবে। যখন বিরাট কোনো ধ্বংস কিংবা পরাজয় আমাদের সামনে আসে তখন আমরা শান্ত হয়ে ভাগ্যের হাতে নিজেদের সমর্পণ করি এবং হঠাৎ কাশীতে গিয়ে বড় বড় দেবতাদের সঙ্গে ভাব করি। কিন্তু একজন ইংরেজ সে ক্ষেত্রে খুঁত খুঁত করবে, নালিশ করবে, ভাগ্য বিরূপ হলে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে যতক্ষণ পর্যন্ত না তার নালিশের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা বা তার যে সব দুঃখ ছিল সেগুলো দূর হচ্ছে। ইংরেজের এই যে মনের ভাব এরকম মনের ভাবকে অনুকরণ করাকে ভালই বলা চলে। সবচেয়ে বড় কথা, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এর ব্যবহারিক মূল্য রয়েছে। ভদ্রমহিলা এবং ভদ্রমহোদয়গণ, ইংরেজ জনসাধারণের বিচারবুদ্ধির উপর আমাদের যথেষ্ট আস্থা আছে। ইংল্যাণ্ড নিগ্রো ক্রীতদাসদের মুক্ত করতে কুড়ি কোটি টাকা খরচ করেছে। যখন ইটালি স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করছিল ইংল্যাণ্ড তখন তার দিকে তার দয়ার হাতটিকে বাড়িয়ে দিয়েছিল! সেই ইংল্যাণ্ড কি তার নিজের আশ্রিতকে স্ব-শাসনের মহান অধিকার দেবে না? প্রতিষ্ঠান নয়, মানুষই একটা জাতি গড়ে তোলে। জনগণের প্রতিষ্ঠানগুলি রূপ নেয় জাতীয় চরিত্র অনুযায়ী। একটা কথা ঠিকই বলা হয় যে একটি মহান জাতির সরকার কখনো খারাপ হতে পারেনা। নিজের দেশের লোকেদের নীতি এবং শিক্ষার মান উঁচু করার দায়িত্ব আপনাদের,

আর তাহলেই আপনাদের যেসব অসুবিধে সেগুলো দূর করা যাবে, আর স্ব-রাজ্যের দৃঢ় বুনিয়াদ গড়ে উঠবে জাতির অপরিবর্তনীয় চরিত্র অনুযায়ী, গভীর এবং প্রচণ্ড বিশ্বাসের উপর—আর কোনো জিনিসের সাহায্যে নয়, কেবল এই দিয়েই আমাদের ভাগ্যের ভাণ্ডারে যা জমা আছে তা আমরা পেতে পারি—সেটা হল ইংল্যাণ্ডের নিয়ন্ত্রণাধীন হওয়া এবং ভগবানের উপর শেষ ভরসা রাখা।

## ছাপাখানা আইন সংশোধন সম্পর্কে[৩]

মহাশয়, সকলেই স্বীকার করেন যে অবস্থার উন্নতি হয়েছে—রাজত্বের সবচেয়ে বড় কর্তা ব্যক্তিও তা স্বীকার করেছেন। এটাও মেনে নেওয়া হয়েছে যে খবরের কাগজের ভাষা এবং মেজাজও ভালর দিকে গেছে। আমাদের সমালোচকেরা যাঁদের সঙ্গে আমাদের স্বার্থের এবং আশার সম্পর্ক নেই তাঁরা সেটা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন। ঘটনাটা যদি তাই হয় তাহলে আমার মনে হয় যে ছাপাখানা আইন রদ করা, কিংবা অন্তত অনেকখানি বদলানোর দাবী করতে পারি, কিন্তু তা না করে আইনসভাকে কেবল অভিযোগের সত্যিকারের কারণটি দূর করতে, ঘোষিত ইচ্ছাগুলিকে রূপায়িত করতে আর সরকার যা কথা দিয়েছেন সেই কথা অনুযায়ী কাজ করতে। এই আবেদন করার সময় আমি কেবল এই আইনসভার সদস্য হিসেবে কাজ করছি না, সাংবাদিকতাকে আমি আমার জীবনের সবচেয়ে প্রিয় কাজ বলে মনে করি বলে আবেদন করছি। আমরা সংবাদিকেরা অনুভব করছি যেন আমাদের মাথার উপর আসন্ন বিপদ, যে কোনো মুহূর্তে আমরা ধ্বংস হয়ে যেতে পারি। হয়ত আমরা এটা ঠিকই বলছি, কিংবা হয়ত এটা ঠিক নয়, কিন্তু আমরা এই রকমই অনুভব করছি। আমাদের এই মহান কাজে সরকারের হৃদয়-খোলা সমর্থন এবং সহানুভূতি প্রাপ্য। খবরের কাগজের ছাপাখানা জনসাধারণের দুঃখ দুর্দশার কথাকে প্রকাশ করবার একটি যন্ত্র, এ হল রাষ্ট্রের নিরাপত্তার

৩। জানুয়ারী, ১৯১৪

সেফটি ভাল্ব। এটি হল জনপ্রিয় রাজনৈতিক শিক্ষার একটি যন্ত্র। বৃটিশ শাসনের এটি হল একটি উপহার আর এটিকে আমরা গভীর সন্দেহের সঙ্গে রক্ষা করি। এর স্বাধীনতার হয়ত অপব্যবহার হতে পারে, কিন্তু আমি এটা বলতে পারি যে আইনের হাত খবরের কাগজ আইন ছাড়াই এই অপব্যবহারকে ধরতে পারে এবং পরাজিত করতে পারে। সংবাদপত্র আইন সংশোধন—যার জন্য আমি প্রার্থনা করছি—তবে আসলে এর সংশোধনের চাইতেও বড় কথা হল আইন যাঁরা করেছেন তাঁদের আসল উদ্দেশ্য যা, তা যদি মেনে নেওয়া হয় তাহলে আইনের কঠোরতা অনেকখানি কমে, আর ভারতবর্ষের বিরাট সাংবাদিক বাহিনীর উদ্বেগ আর অস্বস্তির আসল ব্যাপারটি দূর হয়। আর মহাশয়, এরফলে সমগ্র জগতে ঘোষিত হবে সরকারের অনড় প্রতিজ্ঞা রক্ষার কথা, আর রাষ্ট্রের চরম প্রয়োজনে কিছু কঠোর হতে হলেও যাঁরা তার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন তাঁরাও এই নীতির মর্ম কথাকে মেনে নেবেন।

## মরলি-মিণ্টো সংস্কার সম্পর্কে

এশিয়াতে যে আশ্চর্য পরিবর্তন ঘটেছে তা আমরা কি না দেখে থাকতে পারি? রাশিয়াকে জাপান হারিয়ে দেওয়ার ফলে যে পরিবর্তন হয়েছে তা হল এই যে এখন এশিয়াবাসীদের নিজেদের প্রতি সুদৃঢ় আস্থা হচ্ছে। এখন সমস্ত এশিয়ার উপর দিয়ে একটা প্রচণ্ড ঢেউ চলেছে, এই ঢেউএ রয়েছে উচ্চ আদর্শ এবং আশা। প্রাচ্যের যে সমস্ত দেশ স্বাধীনতা এবং ন্যায় বিচারের জন্য সংগ্রাম করছে তাদের উদাহরণ দেখে ভারতবর্ষ যদি পুনর্জীবন লাভ না করে তাহলে তার প্রাচীন সংস্কৃতি যা থেকে সে গভীর ভাবে প্রেরণা পেয়েছে, তার শিক্ষা ইত্যাদি সমস্তই মিথ্যেয় পরিণত হবে। এই সমস্ত উত্তেজনার শেষে একটা প্রতিক্রিয়ার সময় এসেছে, যার ফলে জনসাধারণের ন্যায় সঙ্গত আশা আকাঙ্খাকে অবজ্ঞা করা হয়েছে, তুচ্ছ করা হয়েছে। জনসাধারণকে সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করা হয়েছে, আমাদের তুচ্ছ মনে করা হয়েছে, আমরা কোনো কাজেরই না, আমাদের কিছুই

করবার নেই, সমস্তই আমাদের জন্য অন্যে করবে। লর্ড রিপনের উদারনীতিকে উল্টে দেওয়া হল। স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসনকে সংশোধন করা হল, আর বিশ্ববিদ্যালয়গুলি, যেসব জায়গায় মনুষ্যত্ববোধ এবং অন্য উপকার হচ্ছিল সেগুলিকে, জনসাধারণের প্রতিবাদ সত্ত্বেও সরকারী ব্যাপার করে তোলা হল। তারপর নির্বুদ্ধিতার চরমরূপ দেখা দিল বঙ্গভঙ্গে। এটা ঠিক যে ঘটনাটা লর্ড মরলির সংস্কারের ফলে সহজ হয়েছে, কিন্তু এই সংস্কারের ব্যাপারে আমাদের মধ্যে নানারকম মতভেদ দেখা দিয়েছে। এই পরিকল্পনার মধ্যে যেসব সুবিধে চাওয়া হয়েছিল তা দেওয়া হয়নি। এই পরিকল্পনায় প্রাচুর্য তো নেই-ই, আমি এখনো আবার বলছি যে বহু ব্যাপারে ত্রুটি আমাদের আশা মেটায়নি কারণ টাকার থলিটির উপর কর্তৃত্ব-ভার আমাদের উপর দেওয়া হয়নি। রাষ্ট্রের বড় বড় কতকগুলি বিভাগ, যেমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, শিক্ষা এবং জনকর্ম বিভাগের উপর অন্তত আমাদের নিশ্চিত নিয়ন্ত্রণাধিকার চাই। আপনারা কি জানেন না যে আমাদের দেশে প্রতি বছর হাজারে হাজারে লোক এমন রোগে মারা যায় যেমন ম্যালেরিয়া এবং কলেরা, যে রোগগুলিকে ঠেকানো সম্ভব? এটা বড়ই লজ্জার কথা। আমরা বহু বছর যাবৎ সরকারকে এই ব্যাপারে অবহিত হবার জন্য চাপ দিচ্ছি। আমরা চিৎকার করে কেঁদেছি, কিন্তু আমাদের কথা কেউ শুনেছেন কি? যদি আমাদের অর্থের উপর সত্যি-কারের নিয়ন্ত্রণ থাকত, কিংবা অন্তত যদি জনস্বাস্থ্যের ব্যাপারে কি করা হবে তার উপর কর্তৃত্ব থাকত, আমার দৃঢ় বিশ্বাস তাহলে বাংলাদেশে যে মৃত্যু এসে ঘরের পর ঘর শূন্য করে দিয়ে যায় তা কিছু পরিমাণে দূর করা যেত। শিক্ষায় যা খরচ হয় তা অতি সামান্য। এর মধ্যের বেশির ভাগই শিক্ষার জন্য খরচ হয় না, খরচ হয় পরিদর্শনের জন্য। আর প্রাথমিক শিক্ষায় যা হচ্ছে তার কথা যত কম বলা যাবে ততই মঙ্গল। যদি শিক্ষার ব্যাপারে আমরা অর্থ নিয়ন্ত্রণ করতে পারতাম তাহলে সেই অর্থ আমরা প্রয়োজনীয় এবং লাভজনকভাবে খরচ করতে পারতাম। আমরা অর্থ শক্তি চাই, আর আত্ম-শাসনের ব্যাপারে চাই নিশ্চিত এবং ফলদায়ক

উপায়। আমরা তা পাইনি, পরিকল্পনায় যা হচ্ছে, সেটা স্পষ্ট করে বলছি, তা এমন করা হয়েছে, এমন ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে যে সরকারের উপর জন প্রতিনিধিদের সরাসরি কোনো ক্ষমতা নেই, যা আছে তা হল বাহ্যিক নীতিগত চাপ।

## পরিশিষ্ট-৫

“বেঙ্গলী”তে প্রকাশিত সম্পাদকীয় থেকে অংশ বিশেষ

### একটি সাধারণ রাজনৈতিক কর্মসূচী[৪]

স্টেটস্‌ম্যান সংবাদপত্রে প্রকাশিত ভারতবর্ষের সাধারণ রাজনৈতিক কর্মসূচী সম্পর্কে কর্ণেল অসবর্নের পত্র সম্বন্ধে সম্পাদকীয়তে বলা হয় :

মাননীয় প্রচারবিদ মহাশয়……এটা জেনে আনন্দিত হবেন যে ভারতীয় নেতা এবং জনমত তাঁর বলার আগেই সমস্ত দেশের মধ্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে সাধারণ রাজনৈতিক কর্মসূচী প্রণয়নের জন্য আন্তরিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। সাম্প্রতিক কয়েক বছরের মধ্যে এই দেশের সর্বত্র এমন জন জাগরণ হয়েছে যে নানারকম সংঘ এবং সমিতি গঠিত হয়েছে যেগুলি জনস্বার্থকে জাগিয়ে তোলার জন্য প্রচণ্ড উৎসাহের সঙ্গে চেষ্টা করে চলেছে।

### “মুসলমানদের প্রগতি”[৫]

আমরা আনন্দের সঙ্গে লক্ষ্য করছি যে ভারত সরকার আমাদের স্বদেশবাসী মুসলমানদের প্রগতির দিকে দৃষ্টি দিয়েছেন। আমরা সর্বদাই বলছি—এবং সেই মত এখনো বদলানোর কোনো কারণ উপস্থিত হয়নি—যে ভারতবর্ষের প্রগতি কেবল হিন্দুর প্রগতি বা মুসলমানদের প্রগতি নয়—প্রগতি এই উভয় সম্প্রদায়েরই, জ্ঞানে, সংস্কৃতিতে এবং আর যে সমস্ত বড়

---

৪। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ৭ই নভেম্বর

৫। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ২৫শে জুলাই

গুণ থাকলে জাতীয় গৌরব বৃদ্ধি পায় সেই সমস্ত গুণে। এখানে সেখানে কিছু ব্যতিক্রম ছিল যার ফলে মুসলমান শক্তির অবনতি ঘটেছে, কিন্তু তা বাদ দিলে এটা বলা যায় যে, মোটের উপর মোগলদের সাম্রাজ্যে হিত হয়েছিল, আর ন্যায় বিচার যে রকম ছিল তা সভ্য জগত অনুসরণ করতে পারেন। সমগ্রভাবে দেখতে গেলে এটা ছিল ন্যায়সঙ্গত এবং মঙ্গলজনক, আর যেসব তিক্ততা দুটি জাতের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছিল, যেভাবে মুসলমান শক্তির অধঃপতন ঘটেছিল, আজ সেসব ভুলে যাবার সময় এসেছে।

## "ব্রহ্মদেশের ভারতভুক্তি"[৬]

মিঃ ব্রাইট তাঁর এক সাম্প্রতিক বক্তৃতায় বলেছেন যে অন্য দেশকে একটি দেশের সঙ্গে সংযুক্ত করা সবচেয়ে বিপজ্জনক ভ্রান্তি এবং সবচেয়ে জঘন্য অপরাধ। ভাষাটা কড়া হয়ে পড়ছে, কিন্তু যেরকম অবস্থা দাঁড়িয়েছে তাতে এ ভাষাও যথেষ্ট নয়। ব্রহ্মদেশের ভারতভুক্তি নীতিগত ভাবে তো মেনে নেওয়াই যায় না, আমরা মনে করি যে শেষ পর্যন্ত দেখা যাবে এটা একটা প্রচণ্ড রাজনৈতিক ভুল হয়েছে। ভারতবর্ষের ব্যাপারে এই রকম নীতি প্রয়োগের চেষ্টা করা হয়েছে এবং তা পরিত্যাগও করা হয়েছে। সাম্প্রতিক কালে লর্ড লিটন এই রকম নীতির জন্য ওকালতি করেছেন এবং তা প্রয়োগও করেছেন। কিন্তু উদারপন্থী সরকার তাঁর কাজকে মুহূর্তের মধ্যে বানচাল করে দিয়ে কান্দাহারকে তার সত্যিকারের মালিক কাবুলের আমীরকে ফিরিয়ে দিয়েছেন। আমরা আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি এই ভেবে যে, যে নীতি সম্পূর্ণ অখ্যাতিকর বলে প্রমাণিত হয়েছে সেই নীতি লর্ড ডাফরিনের মত অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদ আবার জাগিয়ে তুলবেন। ব্রহ্মদেশের ভারতভুক্তি হওয়ায় অতীতের নজির ও চিরাচরিত নিয়ম এ দুইই পরিত্যক্ত হয়েছে। আমরা জানিনা সরকার এই কাজকে কি ভাবে ন্যায়সঙ্গত হয়েছে বলে প্রমাণ করবেন।

---

৬। জানুয়ারী ৯, ১৮৮৬

## "কংগ্রেস"[৭]

এই সপ্তাহে কলকাতাবাসী যা প্রত্যক্ষ করেছে সেরকমটি তারা, এই শহর, বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হবার পর আর দেখেনি। ভারতবর্ষের সমস্ত অংশ থেকে নানা জাতের সমাবেশ হয়েছিল এখানে। শহরের ইতিহাসে এমনটি আর কখনো ঘটেনি, ভারতবর্ষের ইতিহাসেও নয়। জাতির এই রকম সমাবেশ ভারতবর্ষ বোধহয় এর আগে দেখেনি। কংগ্রেসের সভা-গুলিতে আমরা আমাদের সামনে দেখেছিলাম জাতির মহত্ব ব্যক্তিরূপে অধিষ্ঠান করছেন। ভারতবর্ষের ঐক্যের জন্য প্রচেষ্টা—যা বহু দেশপ্রেমিক বহুদিন ধরে আমাদের দেশে কামনা করছেন এখন অনেকের মনে হচ্ছে তা আর দূরে নেই। ভারতবর্ষের বহু জাতি যারা ছড়িয়ে ছিল তাদের এখন ঐক্যবদ্ধ করা হয়েছে, আর তারা একটি দৃঢ় সম্বদ্ধ জাতিতে পরিণত হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। সমসাময়িক একটি কাগজ লিখেছেন যে এটি হল হিন্দু কংগ্রেস। এটা অদ্ভুত যে একটা হিন্দু কংগ্রেসের সভাপতি হলেন একজন পারসী ভদ্রলোক, আর আরো অদ্ভুত ব্যাপার এই যে হিন্দু কংগ্রেসের মধ্যে বহু মুসলমান রয়েছেন।

---

৭। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী

## সুরেন্দ্রনাথের জীবনের ঘটনাবলী

| | | |
|---|---|---|
| ১৮৪৮, নভেম্বর ১০ | … | কলকাতার তালতলা অঞ্চলে পূর্বপুরুষের বাসস্থানে জন্ম। |
| ১৮৫৩ | … | পাঠশালায় বিদ্যারম্ভ, পরে পেরেণ্টাল অ্যাকাডেমিক ইনস্টিটিউশন এবং ডোভটন কলেজে শিক্ষা গ্রহণ। |
| ১৮৬৪, মার্চ ৩ | … | বিলাত যাত্রা। |
| ১৮৬৯ | … | সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় সরাসরি প্রতি-যোগিতায় সাফল্যলাভ। |
| ১৮৭০, ফেব্রুয়ারী | … | পিতার মৃত্যু। |
| ১৮৭১ | … | সিভিল সার্ভিসের শেষ পরীক্ষায় সাফল্য-লাভ। শ্রীহট্টে সরকারী ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে যোগদান। |
| ১৮৭২-৭৪ | … | যুধিষ্ঠির মামলায় গোলমাল। অসাধুতা এবং মিথ্যা এজাহার দেওয়ার ব্যাপারে অভিযুক্ত। |
| | | অনুসন্ধান এবং বরখাস্তের জন্য পরামর্শ। |
| ১৮৭৪ এর এপ্রিল থেকে | | নিজের ব্যাপারে ওকালতি করবার জন্য |
| ১৮৭৫ | … | ইংল্যাণ্ডে গমন। |
| | | কর্ম থেকে পাকাপাকিভাবে বরখাস্ত। তাঁর আদালতে প্রবেশের বিরোধিতা। |
| ১৮৭৫ | … | ভারতে প্রত্যাবর্তন। শিক্ষকরূপে কার্য-গ্রহণ। ছাত্র সমিতি গঠন। |
| ১৮৭৬, জুলাই ২৬ | … | ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন গঠনে সাহায্য। |
| ১৮৭৭ | … | সিভিল সার্ভিসে প্রবেশের বয়সের উর্ধ-সীমা কমানোর প্রতিবাদে ২৪শে মাচ জনসভা। |

| | | |
|---|---|---|
| | | সুরেন্দ্রনাথের উত্তর, পশ্চিম এবং দক্ষিণ ভারত ভ্রমণ। |
| | | দিল্লী সম্মেলনে খবরের কাগজের প্রতিনিধি রূপে যোগদান। |
| ১৮৭৮ | ... | মার্চ মাসে দেশীয় ভাষা সংবাদপত্র আইন পাস। এর বিরুদ্ধে সুরেন্দ্রনাথের আন্দোলন। |
| ১৮৭৯, জানুয়ারী | ... | 'দি বেঙ্গলী' কাগজের মালিক এবং সম্পাদক। |
| ১৮৮০-৮২ | ... | লর্ড রিপন কর্তৃক দেশীয় ভাষার সংবাদপত্র আইন রদ। স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসনের প্রতিজ্ঞা। |
| ১৮৮২-৮৩ | ... | ইলবার্ট বিল আন্দোলন। প্রেসিডেন্সি ইনস্টিটিউশনের ভার গ্রহণ, পরে এটি রিপন কলেজে রূপান্তরিত। |
| | | মে ১৮৮৩ তে মানহানির মকর্দমা এবং কারাবাস। |
| | | ১৮৮৩ এর জুলাই-এ জাতীয় তহবিল সৃষ্টির ব্যাপারে নেতৃত্ব। |
| | | ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে প্রথম জাতীয় সভা গঠন। |
| ১৮৮৪ | ... | আবার উত্তর ভারত ভ্রমণ। |
| ১৮৮৫ | ... | ২৫শে ডিসেম্বর, কলকাতায় দ্বিতীয় জাতীয় সভার ব্যবস্থাদি করা। ২৮শে ডিসেম্বর বোম্বাইতে জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন। |
| ১৮৮৬ | ... | কলকাতায় দ্বিতীয় কংগ্রেস অধিবেশন। কাউন্সিল সংস্কার সম্পর্কে সুরেন্দ্রনাথের প্রস্তাব উত্থাপন। |

| | | |
|---|---|---|
| ১৮৯০ | ... | এপ্রিলে কংগ্রেসের মনোনীত সদস্য হিসাবে ইংল্যাণ্ড গমন। অক্সফোর্ড ইউনিয়ন বির্তকে স্মরণীয় বক্তৃতা। |
| ১৮৯৩-৯৪ | ... | বেঙ্গল লেজিস্‌লেটিভ কাউন্সিলে মনোনীত। ১৮৯৩ সালের জুলাইতে নতুন বেঙ্গল কাউন্সিলের দ্বারোদ্‌ঘাটন। |
| | | ১৮৯৪ সালে মাদ্রাজ কংগ্রেসে একই সঙ্গে পরীক্ষা নেবার ব্যাপারে প্রস্তাব গ্রহণ। ছাত্র এবং রাজনীতি সম্পর্কে মাদ্রাজে বিতর্কে অংশ গ্রহণ। |
| ১৮৯৫ | ... | পুনা কংগ্রেস অধিবেশনে সভাপতিরূপে আশ্চর্য সুন্দর অভিভাষণ প্রদান। |
| ১৮৯৬ | ... | দুর্ভিক্ষ সম্পর্কে কলকাতা কংগ্রেস অধিশনে প্রস্তাব উত্থাপন। সরকারের বিদেশে বাজে খরচের সমালোচনা। কংগ্রেসের অংশ হিসাবে যন্ত্রশিল্প প্রদর্শনীর জন্য সুরেন্দ্রনাথের প্রেরণাদান। |
| ১৮৯৭ | ... | ইংল্যাণ্ডে ওয়েল্‌বি কমিশনের সামনে সাক্ষ্যদান। অমরাবতী কংগ্রেস। আন্দোলন দমনে মাত্রাধিক শক্তি প্রয়োগের সম্পর্কে সুরেন্দ্রনাথ কর্তৃক প্রস্তাব উত্থাপন। নাটু ভ্রাতাগণ এবং টিলক সম্পর্কে সমবেদনা। |
| ১৮৯৮ | ... | ভারতে কার্জনের আগমন। |
| | | স্বাস্থ্যকেন্দ্র শিমুলতলায় সুরেন্দ্রনাথ কর্তৃক গৃহ নির্মাণ। ডক্টর সরকারের হত্যাকারী ইউরোপীয়ান সৈন্যদের শাস্তি দানের ব্যাপারে নিজেকে যুক্ত করেন। |

| | | |
|---|---|---|
| ১৮৯৯ | ... | সেপ্টেম্বরে, দু বছর বিতর্কের পর বেঙ্গল কাউন্সিলে মেকেঞ্জি বিল পাস। কলকাতা করপোরেশন থেকে ২৭ জন কমিশনার সহ প্রতিবাদ প্রদর্শনের জন্য পদত্যাগ। |
| ১৯০০ | ... | লাহোর কংগ্রেসে যোগদানের আগে সুরেন্দ্রনাথের পাঞ্জাব ভ্রমণ। |
| ১৯০০-০১ | ... | 'দি বেঙ্গলী' দৈনিক সংবাদপত্রে রূপান্তরিত। ইম্পিরিয়াল লেজিস্লেটিভ অ্যাসেম্বলিতে যোগ দেওয়ার চেষ্টা করেন কিন্তু সরকারী অপকৌশলে অসমর্থ হন। |
| ১৯০২ | ... | ১৯০২ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেসের আহমেদাবাদ সম্মেলনে সভাপতিরূপে যোগদান। লর্ড কার্জনের শাসনের তীব্র নিন্দা, বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপারে। |
| ১৯০৪ | ... | রিপন কলেজের মালিকানা একটা অছির হাতে অর্পণ। |
| ১৯০৫ | ... | বঙ্গভঙ্গ। সুরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে প্রতিবাদের ঝড়। |
| | | ২০শে জুলাই বঙ্গভঙ্গ ঘোষণা, ১৬ই অক্টোবর থেকে তা চালু। ৭ই আগষ্টে কলকাতায় স্মরণীয় জনসভা। স্বদেশী আন্দোলনের সূত্রপাত। সুরেন্দ্রনাথ মুকুটহীন সম্রাট। ১৬ই অক্টোবর শোক দিবসরূপে পালন। সুরেন্দ্রনাথের পরামর্শে ফেডারেশন হলের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত এবং জাতীয় তহবিল সৃষ্টি। |

১৯০৫ সালের কংগ্রেস অধিবেশনে সুরেন্দ্রনাথ কর্তৃক বঙ্গভঙ্গ সম্পর্কে প্রস্তাব উত্থাপন।

১৯০৬ ... এপ্রিলে বরিশালে বেঙ্গল প্রাদেশিক সম্মেলন ছত্রভঙ্গ। পুলিস কর্তৃক শান্তিপূর্ণ শোভাযাত্রার উপর অত্যাচার। সুরেন্দ্রনাথকে গ্রেপ্তার এবং তাঁর অর্থদণ্ড। বৈপ্লবিক আন্দোলনের সুরু। কলকাতা কংগ্রেস অধিবেশনে ঝড়।

১৯০৭ .. সুরাটে কংগ্রেস বিভক্ত, সুরেন্দ্রনাথের নরমপন্থীদের দলে যোগদান।

১৯০৮ ... সুরেন্দ্রনাথ কর্তৃক মাদ্রাজ কংগ্রেস অধিবেশনে প্রস্তাবিত সংস্কার সম্পর্কে বক্তৃতা।

১৯০৯ ... জুন মাসে লণ্ডন থেকে ইম্পিরিয়াল প্রেস কনফারেন্সে আমন্ত্রিত। লর্ড ক্রোমারের বক্তব্যের উত্তরে ভারতীয় সংবাদপত্রকে তেজের সঙ্গে সমর্থন। তাঁর নানা বক্তৃতায় দুটি বিষয় সম্পর্কে গুরুত্ব প্রকাশ—বঙ্গভঙ্গকে সংশোধন এবং ভারতবর্ষকে স্বরাজদান। উইলিয়াম কার্জন ওয়াইলি হত্যা।

১৯০৯ খৃষ্টাব্দে মরলি-মিন্টো সংস্কারের পরিপ্রেক্ষিতে থমথমে আবহাওয়ায় কংগ্রেস অধিবেশন। মুসলমানদের পৃথক হবার সূচনা। সুরেন্দ্রনাথের বক্তৃতায় প্রবল হতাশা প্রকাশ।

১৯০৯-১০ ... গভর্নর কর্তৃক সুরেন্দ্রনাথের কাউন্সিল প্রবেশের বাধা অপসারিত হবার পরও

সুরেন্দ্রনাথ যতক্ষণ না পর্যন্ত বঙ্গভঙ্গ রোধ হয় ততক্ষণ সংস্কৃত কাউন্সিলে প্রবেশে অসম্মত।

১৯১১ ... বঙ্গভঙ্গ বিরোধী একটি স্মারকলিপির উদ্যোক্তা, এটি বাংলার প্রতিনিধি কর্তৃক স্বাক্ষরিত হয় এবং বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জের কাছে পেশ করা হয়।

১৯১১ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বরে দিল্লীর দরবার।

বঙ্গভঙ্গ রোধ। বাংলাদেশে প্রচণ্ড উচ্ছ্বাস। সুরেন্দ্রনাথই সর্বেসর্বা বীর।

২৩শে ডিসেম্বর স্ত্রীর মৃত্যু।

১৯১৩ ... সরকারী বাধা সত্ত্বেও ইণ্ডিয়ান লেজিস্লেটিভ কাউন্সিলে প্রবেশ। সেখানে জনসাধারণের নানাবিধ বক্তব্য পেশ এবং অযথা সরকারী ক্ষমতা প্রয়োগের বিরোধিতা।

১৯১৫-১৮ ... রাজনৈতিক আবহাওয়ার পরিবর্তন। নতুন নেতৃত্বের উত্থান। হোমরুল লীগ। সুরেন্দ্রনাথ যোগদান থেকে বিরত। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের জুলাইতে বোম্বাইয়ে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর অধিবেশনে শান্তিপূর্ণ প্রতিরোধ প্রশ্ন উত্থাপন।

সুরেন্দ্রনাথের অসম্মতি।

অ্যানি বেসাণ্টকে কংগ্রেসের সভাপতি করা নিয়ে সুরেন্দ্রনাথ এবং চিত্তরঞ্জন দাশের মধ্যে মতান্তর।

১৯১৭ সালের আগষ্টে মণ্টেগুর ঘোষণা, তারপর সমগ্র দেশ পরিক্রমণ। সুরেন্দ্রনাথকে জেরা। ১৯১৮ সালের জুলাইতে মণ্টেগু ·চেমস্‌ফোর্ড রিপোর্ট প্রকাশিত। নরম এবং চরমপন্থীর মধ্যে মতপার্থক্য। বাংলাদেশে ১৯১৮ সালের জুলাইতে সুরেন্দ্রনাথ এবং চিত্তরঞ্জন দাশের মধ্যে সংস্কার গ্রহণ করা নিয়ে মতভেদ। ১৯১৮ সালের বোম্বাই এর বিশেষ কংগ্রেস অধিবেশনে সুরেন্দ্রনাথ এবং তাঁর প্রধান সহকর্মীদের অনুপস্থিতি। ১৯১৮ সালের নভেম্বরে সুরেন্দ্রনাথ কর্তৃক নরমপন্থীদের সম্মেলনে সভাপতিত্ব। কাউন্সিলে সংস্কার প্রবলভাবে সমর্থন।

১৯১৯ ... নরমপন্থীদের নেতা হিসাবে যুক্ত পার্লামেণ্টারি কমিটীর সামনে ইংল্যাণ্ডে সাক্ষ্যদান। সরকারী কমিটীর সভ্য হিসেবে ইংল্যাণ্ডের স্থানীয় শাসন সম্পর্কে অনুসন্ধান।

১৯২০-২১ ... মন্ত্রী হিসাবে নানারকম দেশগঠনমূলক কাজকর্ম। ১৯২১ সালের জুলাইতে প্রেস কনফারেন্স করে জনসাধারণকে সমস্ত কিছু জানাবার নীতি প্রথম চালু করেন। ১৯২৩ সালের মার্চ মাসে কলকাতা মিউনিসিপ্যাল আইন পাস করানোর ফলে ম্যাকেঞ্জি আইন বানচাল। কলকাতা করপোরেশনকে আরো গণতান্ত্রিক করে তোলা হয়। তার আগে

| | | |
|---|---|---|
| | | করপোরেশন এবং মেডিক্যাল কলেজের চাকুরীর ক্ষেত্রে ভারতীয়করণ সুরু করেন। চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষাকে প্রসার করবার জন্য উৎসাহ প্রদান। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারীতে কাউন্সিলে প্রবেশের কার্য-সূচী গ্রহণ করে স্বরাজ পার্টি সৃষ্টি হয়। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের শরৎকালে দ্বৈত শাসনের দ্বিতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। বিধান চন্দ্র রায়ের কাছে সুরেন্দ্রনাথের পরাজয়। |
| ১৯২৩-২৫ | ... | রাজনীতি এবং জনজীবন থেকে অবসর গ্রহণ। জীবনের শেষ দিনগুলি তিনি সাংবাদিকতা এবং 'এ নেশন ইন মেকিং' বইটি লিখে কাটান। |
| ১৯২৩-২৫ | ... | ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের ৬ই আগষ্ট মৃত্যু। |

# নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী


| লেখক | | পুস্তক |
|---|---|---|
| পি. সি. রামস্বামী আইয়ার | — | অ্যানি বেসাণ্ট (বিল্ডার্স অব মর্ডান ইণ্ডিয়া সিরিজ), দিল্লী, ১৯৬৩ |
| যোগেশ চন্দ্র বাগল | — | হিস্টরি অব দি ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন কলকাতা, ১৯৫৩ |
| মণি বাগচী | — | রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ ( বাংলা ) কলকাতা, ১৯৬৩ |
| কামিনী কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় | — | রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ ও পরবর্তী রাষ্ট্রীয় আন্দোলন (বাংলা) |
| সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি | — | এ নেশন ইন মেকিং, কলকাতা, ১৯৬৩ (পুনর্মুদ্রণ) |
| এম. বার্নস্ | — | স্পীচেস, ইণ্ডিয়ান প্রেস, লণ্ডন, ১৯৪০ |
| ডবলিউ এস. ব্লাণ্ট | — | ইণ্ডিয়া আণ্ডার রিপন |
| জে. সি. বসু | — | সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, ঢাকা, ১৯৩৯ |
| অ্যানি বেসাণ্ট | — | হাউ ইণ্ডিয়া রট ফর ফ্রীডম |
| এম. এ. বুচ | — | রাইজ অ্যাণ্ড গ্রোথ অব ইণ্ডিয়ান লিবারেলিজম |
| | | ইণ্ডিয়ান মিলিটাণ্ট ন্যাশনালিজম |
| সি. ওয়াই. চিন্তামণি | — | ইণ্ডিয়ান পলিটিক্স সিন্স মিউটিনি, ওয়ালটেয়ার, ১৯৩৭ |
| সার ভি. চিরল | — | ইণ্ডিয়ান আনরেস্ট, লণ্ডন, ১৯১০ |
| সার এইচ. কটন | — | নিউ ইণ্ডিয়া, লণ্ডন, ১৯০৫ |

| | | |
|---|---|---|
| এম. এন. দাস | — | ইণ্ডিয়া আণ্ডার মরলি অ্যাণ্ড মিণ্টো, লণ্ডন, ১৯৬৪ |
| এইচ. এন. দাসগুপ্ত | — | দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ (বিল্ডার্স অব মর্ডান ইণ্ডিয়া সিরিজ), দিল্লী, ১৯৪৮ |
| কমলা দেবী | — | ভারত গৌরব বঙ্কিমচন্দ্র, সুরেন্দ্রনাথ (বাংলা), কলকাতা, ১৯৩৯ |
| এ. আর. দেশাই | — | সোশ্যাল ব্যাকগ্রাউণ্ড অব ইণ্ডিয়ান ন্যাশানালিজম, ১৯৪৮ (অক্সফোর্ড ইউনিভারসিটি প্রেস) |
| আর. সি দত্ত | — | ইণ্ডিয়া অ্যাণ্ড ইংল্যাণ্ড, লণ্ডন, ১৮৯৭ |
| এল ফ্রেজার | — | ইণ্ডিয়া আণ্ডার কার্জন অ্যাণ্ড আফটার, লণ্ডন, ১৯১২ |
| মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী | — | অটোবায়োগ্রাফি, আহমেদাবাদ, ১৯৪০, ( দ্বিতীয় সংস্করণ ) |
| এস. কে. ঘোষাল | — | কর্মবীর সুরেন্দ্রনাথ |
| এ. বি. কীথ | — | এ কনস্টিটিউশন্যাল হিস্টরি অব ইণ্ডিয়া, ইণ্ডিয়ান রিপ্রিণ্ট এলাহাবাদ, ১৯৬১ |
| এইচ. এন. কুঞ্জরু | — | গোখলে, ম্যান অ্যাণ্ড হিজ মিশন, নিউ দিল্লী, ১৯৬৬ |
| ভি. ডি. মহাজন | — | বৃটিশ রুল ইন ইণ্ডিয়া অ্যাণ্ড আফটার, দিল্লী, ১৯৬১ |
| মজুমদার, রায়চৌধুরী অ্যাণ্ড দত্ত | — | অ্যাডভান্সড হিস্টরি অব ইণ্ডিয়া, লণ্ডন, ১৯৪৮ |

| | | |
|---|---|---|
| আর. পি. মাসানি | — | দাদাভাই নওরোজি ( বিল্ডার্স অব মর্ডান ইণ্ডিয়া সিরিজ ), দিল্লী, ১৯৬০ |
| এ. সি. মজুমদার | — | ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল এভোলিউশন, মাদ্রাজ, ১৯১৭ |
| ই. মণ্টেগু | — | অ্যান ইণ্ডিয়ান ডায়েরি |
| এস. নটরাজন | — | এ হিস্টরি অব দি প্রেস অব ইণ্ডিয়া |
| জবাহর লাল নেহরু | — | অটোবায়োগ্রাফি, লণ্ডন, ১৯৩৬ |
| বিপিন চন্দ্র পাল | — | মেমোরিজ অব মাই লাইফ অ্যাণ্ড টাইমস্ |
| মিঃ পালান্দে | — | ইণ্ডিয়ান অ্যাডমিনস্ট্রেশন, ১৯২৬ ( অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস ) |
| প্রসাদ অ্যাণ্ড সুবেদার | — | হিস্টরি অব মর্ডান ইণ্ডিয়া |
| পি. সি. রায় | — | লাইফ অ্যাণ্ড টাইমস্ অব সি. আর. দাশ, ১৯২৭ ( অক্স-ফোর্ড ইউনিভাসিটি প্রেস ) |
| পি. কে. রায় | — | দেশ নায়ক সুরেন্দ্রনাথ ( বাংলা ) |
| এন. সি. রায় | — | সিভিল সার্ভিস ইন ইণ্ডিয়া, কলকাতা, ১৯৬০ |
| সরকার অ্যাণ্ড দত্ত | — | মর্ডান ইণ্ডিয়ান হিস্টরি, এলা-হাবাদ ১৯৫৯ |
| বি. ডি. শুক্লা | — | হিস্টরি অব দি ইণ্ডিয়ান লিবারাল পার্টি |
| পি. সীতারামাইয়া | — | হিস্টরি অব দি কংগ্রেস, ১৯৩৬ |
| টমসন অ্যাণ্ড গ্যারেট | — | রাইজ অ্যাণ্ড ফুল্‌ফিল্‌মেণ্ট অব বৃটিশ রুল ইন ইণ্ডিয়া |
| এইচ. সি. ই. জ্যাকেরিয়াস্ | — | রিনাসেণ্ট ইণ্ডিয়া, লণ্ডন, ১৯৩৩ |

## রিপোর্ট, পত্রিকা ইত্যাদি

প্রসিডিংস অব দি ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস

প্রসিডিংস অব দি ইণ্ডিয়ান লেজিস্লেটিভ কাউন্সিল অ্যাণ্ড বেঙ্গল লেজিস্লেটিভ কাউন্সিল

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন সিলভার জুবিলী সুভেনীর

দি বেঙ্গলী ( সংবাদপত্র )

মাসিক বসুমতী (বাংলা), শ্রাবণ-ভাদ্র, ১৩৩২ ( আগষ্ট-সেপ্টেম্বর, ১৯২৫ )

বার, প্লাটফরম্ অ্যাণ্ড পালপিট

মর্ডান রিভিউ (মাসিক পত্রিকা), সেপ্টেম্বর, ১৯২৫

প্রসিডিংস অব দি ন্যাশনাল লিবারাল ফেডারেশন অব ইণ্ডিয়া

প্রকাশন বিভাগ
তথ্য ও বেতার মন্ত্রক
ভারত সরকার